পরিবার ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস

পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি
ফ্রেডরিক এঙ্গেলস

হাওলাদার সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রকাশক
মোহাম্মদ মাকসুদ
হাওলাদার প্রকাশনী
৩৮/৪, বাংলাবাজার
(৩য় তলা), ঢাকা ১১০০
ফোন: ০১৭২৬ ৯৫ ৬১ ০৪

প্রচ্ছদ
এম.এ আরিফ

বর্ণবিন্যাস
সবুজপাতা কম্পিউটার্স

মূল্য
১৭৫.০০ টাকা

মুদ্রণ
জি.জি অফসেট প্রেস
নয়াবাজার, ঢাকা ১১০০

ISBN: 978 984 89648 28

একমাত্র পরিবেশক
হাসি প্রকাশন
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।

PERSONAL COLLECTION OF ISCKRA

GRONTHO.COM

সূচি

১৮৮৪ সালের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ৫
১৮৯১ সালের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা ৭
সংস্কৃতির প্রাগৈতিহাসিক স্তর ১৭
ক। বন্যাবস্থা ১৭
খ। বর্বরতা ১৮
পরিবার ২২
ইরকোয়াস গোত্র-সংগঠন ৬৬
গ্রীক গোত্রসংগঠন ৭৯
এথেনীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ৮৭
রোমের গোত্র ও রাষ্ট্র ৯৬
কেল্টিক ও জার্মানদের মধ্যে গোত্র ১০৫
জার্মানদের মধ্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ১১৭
বর্বরতা ও সভ্যতা ১২৭

GRONTHO.COM

মর্গানের গবেষণা প্রসঙ্গে
১৮৮৪ সালের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

একদিক থেকে বলা যায় যে নিচের পরিচ্ছেদগুলিতে একটি উত্তরদায়িত্ব পূরণ করা হয়েছে। স্বয়ং কার্ল মার্কস পরিকল্পনা করেন যে, তিনি ইতিহাস নিয়ে তাঁর নিজের– সীমাবদ্ধভাবে বলা যায় যে আমাদের দুজনের– বস্তুবাদী অনুসন্ধান থেকে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে মর্গানের গবেষণার ফলগুলিও উপস্থিত করবেন এবং শুধু এইভাবে তাদের সমগ্র তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলবেন। কারণ মর্গান তাঁর নিজের ধরনে আমেরিকায় ইতিহাসের সেই একই বস্তুবাদী ধারণা পুনরাবিষ্কার করেন যা মার্কস ৪০ বছর আগেই আবিষ্কার করেছিলেন, এবং বর্বরতা ও সভ্যতার তুলনামূলক বিচারে ঐ ধারণা থেকে তিনি প্রধান প্রধান বিষয়ে মার্কসের মতো একই সিদ্ধান্তে পৌঁছান। এবং ঠিক যেমন জার্মানির সরকারী অর্থনীতিজ্ঞরা বহু বছর ধরে 'পুঁজি' গ্রন্থ থেকে সাগ্রহে চুরি করেছে অথচ কেবলই তা চেপে গিয়েছে, ইংল্যান্ডের প্রাগৈতিহাসিক বিজ্ঞানের প্রবক্তরা মর্গানের রচিত 'প্রাচীন সমাজ'[১] সম্পর্কেও তাই করেছেন। আমার পরলোকগত বন্ধু যে কাজ সম্পন্ন করে যেতে পারেন নি, আমার রচনায় তাঁর স্থানপূরণ নগণ্যই হবে। তবে মর্গান থেকে মার্কসের বিস্তৃত উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে[২] তাঁর সমালোচনামূলক মন্তব্যগুলি আমার হাতে আছে এবং যেখানেই সম্ভব সেখানে আমি এগুলো পুনরুদ্ধৃত করেছি।

বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী শেষ বিচারে ইতিহাসের নির্ধারক করণিকা হচ্ছে প্রত্যক্ষ জীবনের উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদন। কিন্তু এই ব্যাপারটি দ্বিবিধ প্রকৃতি। একদিকে জীবনযাত্রার উপকরণ– খাদ্য, পরিধেয় ও আশ্রয় এবং সেইজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির উৎপাদন; অপরদিকে মানবজাতির জৈবিক উৎপাদন, বংশবৃদ্ধি। একটি বিশেষ ঐতিহাসিক যুগে একটি বিশেষ দেশে মানুষ যে সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাস করে, সেগুলি এই দ্বিবিধ উৎপাদনের দ্বারা নির্ধারিত হয়: একদিকে শ্রমের বিকাশের, অপরদিকে পরিবারের বিকাশের স্তর দিয়ে। শ্রমের বিকাশ যত কম হয় এবং উৎপন্নের পরিমাণ এবং সেইহেতু সমাজের সম্পদ যত সীমাবদ্ধ হয়, তত বেশি সমাজব্যবস্থা কৌলিক সম্পর্ক দিয়ে পরিচালিত মনে হয়। কিন্তু কৌলিক বন্ধনের ভিত্তিতে গঠিত এই

১. 'প্রাচীন সমাজ', অথবা Ancient Soceity, or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization. BY Lewis H. Morgan. London, Macmillan and co., 1877 বইটি আমেরিকায় মুদ্রিত হয় এবং লন্ডনে পাওয়া আশ্চর্য দুষ্কর। লেখক কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। (এঙ্গেলসের টীকা)।

২. এখানে কার্ল মার্কস কৃত মর্গানের 'প্রাচীন সমাজ' বইয়ের সারসংকলন সম্পর্কে বলা হয়েছে। - সম্পাঃ

সমাজকাঠামোর মধ্যে শ্রমের উৎপাদিকা ক্রমশ বাড়তে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ পায় ব্যক্তিগত মালিকানা ও বিনিময়, ধনের অসাম্য, অপরের শ্রমশক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং তার ফলে শ্রেণী-বিরোধের ভিত্তিঃ নবজাত সামাজিক উৎপাদনগুলি কয়েক পুরুষ ধরে পুরাতন সামাজিক সংগঠনকে নতুন অবস্থাগুলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করে, অবশেষে উভয়ের এই গরমিল থেকে আসে পরিপূর্ণ বিপ্লব। কৌলিক বন্ধনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পুরাতন সমাজ নবজাত সামাজিক শ্রেণীগুলির সংঘাতে চুরমার হয়ে যায়; তার জায়গায় দেখা দেয় রাষ্ট্র হিসেবে গঠিত নতুন সমাজ - এখানে নিম্নতন ইউনিটগুলি আর কৌলিক গোষ্ঠী নয়– আঞ্চলিক গোষ্ঠী; এরূপ সমাজে পারিবারিক প্রথা পুরোপুরি মালিকানা প্রথার অধীন এবং যে শ্রেণীবিরোধ ও শ্রেণীসংগ্রাম এযাবৎকার সমগ্র লিখিত ইতিহাসের মর্মবস্তু, সেটা তার মধ্যে অবাধে বিকাশ পেতে থাকে।

মর্গানের মহৎ কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তিনি আমাদের লিখিত ইতিহাসের এই প্রাগৈতিহাসিক ভিত্তির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কার ও পুনরুদ্ধার করেন, এবং উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের কৌলিক গোষ্ঠীর মধ্যে গ্রীক, রোমক ও জার্মান ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এতদিন পর্যন্ত দুর্বোধ্য ধাঁধার চাবিকাঠি খুঁজে পান। তাঁর বই একদিনের রচনা নয়। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তিনি তাঁর মালমশলার সঙ্গে যুঝে শেষপর্যন্ত সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেন। এইজন্যই তাঁর রচনা হচ্ছে আমাদের কালের যুগান্তকারী অল্প কয়েকটি রচনার অন্যতম।

বর্তমান রচনায় পাঠক মোটের উপর সহজেই ধরতে পারবেন কোন জিনিসগুলি মর্গান থেকে নেওয়া এবং আমি কি যোগ করেছি। গ্রীস ও রোম সম্পর্কীয় ঐতিহাসিক অংশে আমি মর্গানের তথ্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকি নি, পরন্তু আমার জানা তথ্যও যোগ করেছি। কেল্টিক ও জার্মানদের সম্পর্কিত অংশগুলি বহুলত আমার নিজের; এই ক্ষেত্রে মর্গানের অবলম্বন ছিল প্রায় একান্তই পরের হাত ফেরতা উৎস এবং জার্মানির অবস্থা সম্পর্কে ট্যাসিটাসের রচনা বাদ দিলে তিনি শুধুমাত্র মিঃ ফ্রিম্যানের অপদার্থ উদারনৈতিক অপব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেছিলেন। অর্থনৈতিক যেসব যুক্তি মর্গানের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট ছিল কিন্তু আমার পক্ষে যা একেবারে অনুপোযোগী, সে সমস্ত আমি নতুন করে হাজির করেছি। এবং সর্বশেষে বলা বাহুল্য যেখানে মর্গানকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ধৃত করা হয়নি সেইসব সিদ্ধান্তের জন্য আমিই দায়ী।

১৮৯১ সালের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

এই রচনার পূর্ববর্তী বৃহৎ সংস্করণগুলি প্রায় ছ-মাস হলো নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এবং কিছুকাল ধরে প্রকাশক আমাকে একটি নতুন সংস্করণ তৈরি করবার ইচ্ছা জানিয়েছেন। অধিকতর জরুরী কাজের জন্য এযাবৎকাল আমি এ কাজ করতে পারিনি। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর সাত বছর কেটে গিয়েছে এবং এই সময়ের মধ্যে পরিবারের আদি রূপগুলি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। অতএব খুব পরিশ্রমের সঙ্গে রচনার সংশোধন ও পরিবর্ধন দরকার ছিল। বিশেষত এইজন্য যে বর্তমান রচনাটি স্টিরিও করার যে প্রস্তাব হয়েছে তাতে আরো কিছু পরিবর্তন করা আমার পক্ষে বেশ কিছুকালের মতো সম্ভব হবে না।

এইজন্য আমি সমস্ত রচনাটি সযত্নে পরীক্ষা করেছি এবং কতকগুলি সংযোজন করেছি, এবং তাতে বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থার দিকে যোগ্য মনোযোগ দেওয়া হয়েছে বলেই আমার ধারণা। উপরন্তু বর্তমান ভূমিকায় আমি বাখোফেন থেকে মর্গান পর্যন্ত পরিবারের ইতিহাসের ক্রম পরিণতির এক সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা দিয়েছি, মূলতঃ এই জন্য যে ইংরেজী প্রাগৈতিহাসিক পণ্ডিতসমাজ হচ্ছেন উগ্রজাতিবাদে আক্রান্ত এবং তাঁরা নীরব থেকে মর্গানের আবিষ্কারগুলির আদিম সমাজে ইতিহাস সম্পর্কে ধারণায় যে বিপ্লব এনেছে তাকে বধ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছেন, যদিও তাঁরা এই আবিষ্কারের ফলগুলি আত্মসাৎ করতে একটুও দ্বিধা করেন না। অপরাপর দেশেও এই ইংরেজী দৃষ্টান্ত প্রায়ই খুব অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুসৃত হচ্ছে।

আমার রচনাটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। প্রথমত ইতালীয় ভাষায়: *L'origine della famiglia, della proprieta privata a dello stato, versione riveduta dall'autore, di Pasquale Martignetti, Benevento, 1885*। তারপর রুমানীয় ভাষায়: *Origina familei, proprietatei private si a statului, traducere de Joan Nadejde*, ইয়াসির *Contemporanul* পত্রিকায়, সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ থেকে মে, ১৮৮৬। অতঃপর ডেনিশ ভাষায়: *Familjens, Privatejendommens og Statens Oprindelse, Dansk, of Forfatteren gennemgaaet Udgave, besorget of Gerson Trier, Ko benhavn, 1888*। বর্তমান জার্মান সংস্করণ থেকে আঁরি রাভে কর্তৃক একটি ফরাসি অনুবাদও যন্ত্রস্থ আছে।

সপ্তম দশকের আগে পর্যন্ত পরিবারের ইতিহাস বলে কোনো জিনিস ছিল না। এই ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিজ্ঞান তখনও সম্পূর্ণভাবে মোজেসের পঞ্চ পুস্তকের প্রভাবাধীন ছিল। পরিবারের পিতৃপ্রধান রূপ যা এখানে সবচেয়ে বিশদভাবে বিবৃত হয়েছিল, তাকেই শুধু যে

বিনা বাক্যব্যয়ে পরিবারের প্রাচীনতম রূপ বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল তাই নয়, বহুপত্নীত্বটুকু বাদ দিয়ে একেই বর্তমানকালের বুর্জোয়া পরিবারের সমার্থবাচক ধরা হয়েছিল– যেন পরিবারের ক্ষেত্রে আদৌ কোনো ঐতিহাসিক বিকাশ ঘটেনি। বড়জোর এইটুকু স্বীকার করা হতো যে, আদিকালে নির্বিচার যৌন সম্পর্কের একটি যুগ থেকেও থাকতে পারে। একথা নিশ্চয়ই যে, এক বিবাহ ছাড়াও প্রাচ্যের বহুপত্নী প্রথা এবং ইন্দো-তিব্বতীয় বহুস্বামী প্রথাও জানা ছিল, কিন্তু এই তিনটি রূপকে কোনো ঐতিহাসিক পরম্পরা অনুযায়ী সাজান যায়নি এবং তারা পাশাপাশি পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবেই দেখা দিল। প্রাচীনকালের কোনো কোনো জনসমষ্টির মধ্যে এবং এখনও বর্তমান কোনো কোনো বন্য জাতির মধ্যে বংশের হিসাব ধরা হয় পিতা থেকে নয় মাতা থেকে এবং সেইজন্য মায়ের ধারাই একমাত্র বৈধ বলে মনে করা হয়, বর্তমানের অনেক জাতির অভ্যন্তরস্থ কয়েকটি বৃহৎ বিভাগের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ (এই ঘটনাটি তখনও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা হয়নি) এবং এই প্রথা পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায় - এইসব ঘটনাগুলি অবশ্য জানা ছিল এবং প্রতিদিন নতুন নতুন দৃষ্টান্ত প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু ঐগুলিকে নিয়ে কি যে করতে হবে তা কেউ জানত না এবং এমনকি এডওয়ার্ড টাইলর 'মানবসমাজের আদি ইতিহাস এবং সভ্যতার বিকাশ বিষয়ে গবেষণা' (১৮৬৫)[৩] রচনায় কোনো কোনো বন্য জাতির মধ্যে জ্বলন্ত কাঠকে লোহার হাতিয়ার দিয়ে ছোঁয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এবং অনুরূপ সব ধর্মীয় ছাইপাঁশের সঙ্গে একত্রে নিতান্ত এক 'অদ্ভুত প্রথা' হিসাবে বিবেচিত হয়েছে এগুলি।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে বাখোফেনের 'মাতৃ-অধিকার' প্রকাশিত হবার পর থেকে পরিবারের ইতিহাস সম্পর্কে চর্চার শুরু। গ্রন্থকার এই রচনায় নিম্নলিখিত প্রতিপাদ্য হাজির করেছেন: (১) শুরুতে মানবসমাজ নির্বিচার যৌন সম্পর্কের অবস্থায় বাস করত, গ্রন্থকর্তা তার অসন্তোষজনক নামকরণ করেছেন 'হেটায়ারিজম'; (২) এই নির্বিচার যৌন সম্পর্কের জন্য পিতৃত্বের সম্পর্কে কোনো নিশ্চয়তা ছিল না, কাজে কাজেই বংশধারা স্থির করা যেত কেবল নারীর দিক থেকে– মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী এবং আদিতে প্রাচীনকালের সমস্ত জাতির মধ্যেই এই ছিল অবস্থা; (৩) সুতরাং মাতা রূপে পরবর্তী পুরুষের একমাত্র স্থির ধার্যা জন্মদাত্রী নারীদের প্রতি উচ্চমাত্রার বিবেচনা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হতো এবং বাখোফেনের ধারণা অনুযায়ী এটি বেড়ে ওঠে নারীদের পূর্ণ আধিপত্যে (গাইনোওক্রেসী); (৪) নারী যখন নিছক একটি পুরুষেরই উপভোগ্যা সেই একবিবাহ প্রথায় উত্তরণের অর্থ একটি আদিম ধর্মীয় নির্দেশ লঙ্ঘন করা (অর্থাৎ বাস্তবক্ষেত্রে ঐ একই স্ত্রীলোকের উপর অন্যান্য পুরুষের চিরাচরিত প্রাচীন অধিকার লঙ্ঘন), এই লঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো অথবা এই লঙ্ঘনের স্বীকৃতি আদায় করা হতো সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য নারীটিকে অপরের কাছে সমপর্ণের মূল্যে।

বাখোফেনের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থন পেয়েছেন প্রাচীন চিরায়ত সাহিত্য থেকে অপরিসীম পরিশ্রম করে আহৃত অসংখ্য অনুচ্ছেদ থেকে। তাঁর মতে 'হেটায়ারিজম' থেকে একপতিপত্নী প্রথায় পরিণতি এবং মাতৃ অধিকার থেকে পিতৃ অধিকারে পরিণতি ঘটেছে, বিশেষতঃ গ্রীকদের মধ্যে, ধর্মীয় ধারণাগুলির বিবর্তনের ফলে, যথা পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধি প্রাচীন দেবতামণ্ডলীর মধ্যে নতুন ধারনার প্রতিনিধি নতুন দেবতাদের প্রবেশ, যার ফলে প্রাচীনরা নবীনদের দ্বারা ক্রমে পিছনে হটে গিয়েছে। অর্থাৎ বাখোফেনের মতে মানুষ

৩. *E.B. Tylor, Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilization, London, 1865.*– সম্পাঃ

যে বাস্তব অবস্থার মধ্যে বসবাস করে তার বিকাশ নয়, পরন্তু মানুষের মনে জীবনের এই পরিস্থিতির ধর্মীয় প্রতিফলন স্ত্রী ও পুরুষের পারস্পরিক সামাজিক অবস্থানের ঐতিহাসিক পরিবর্তনগুলি ঘটিয়েছে। এইজন্যই বাখোফেন এস্কাইলাস্ রচিত 'আরস্টেইয়ার' উল্লেখ করে বলেছেন যে, এটি হচ্ছে বীর যুগের ক্ষয়িষ্ণু মাতৃ অধিকার এবং উদীয়মান ও বিজয়ী পিতৃ অধিকারের মধ্যে সংগ্রামের নাট্যরূপ। ক্লাইটেমনেস্ত্রা তাঁর প্রেমিক এগিস্থাসের জন্য ট্রয় যুদ্ধ থেকে সদ্য প্রত্যাগত স্বামী আগামেম্নসকে হত্যা করলেন; কিন্তু আগামেম্নসের ঔরসে তাঁর পুত্র অরেস্টেস মাকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিল। এইজন্য মাতৃ অধিকারের রক্ষক এরিনিয়েরা[৪] তার পশ্চাদ্ধাবন করল, কারণ মাতৃ অধিকার অনুযায়ী মাতৃহত্যাই হচ্ছে সবচেয়ে ঘৃণ্য পাপ যার কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। কিন্তু অ্যাপোলো যিনি দৈববাণী মারফত অরেস্টেসকে এই কাজে প্রবৃত্ত করেছিলেন এবং এথেনা, যাকে মধ্যস্থ মানা হলো, এ দুজন দেবতা এখানে পিতৃ অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন ব্যবস্থার প্রতিনিধি - এঁরাই অরেস্টেসকে রক্ষা করলেন। এথেনা উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনলেন। অরেস্টেস ও এরিনিয়েদের মধ্যে তখন যে বিতর্ক হয়, তার মধ্যেই সংক্ষেপে সংহত হয়েছে সমস্ত তর্কবিষয়। অরেস্টেস ঘোষণা করে যে, ক্লাইটেমনেস্ত্রা দ্বিবিধ পাপে পাপী; কারণ তিনি একদিকে নিজের স্বামীকে হত্যা করেছেন এবং সেই সঙ্গেই তার পিতাকে হত্যা করেছেন। অতএব কেন এরিনিয়েরা অধিকতর অপরাধী ক্লাইটেমনেস্ত্রার বদলে তাকে নিপীড়িত করছে? এর উত্তরটি চমকপ্রদ:

'যারে সে করেছে হত্যা তার সাথে ছিল নাক রক্তের সম্পর্ক'।

রক্ত সম্পর্ক নেই এমন কোন পুরুষ যদি হত্যাকারিণীর স্বামীও হয় তাহলেও সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আছে এবং সেটি এরিনিয়েদের দেখবার বিষয় নয়। তাদের কাজ হচ্ছে শুধু রক্ত সম্পর্কের মধ্যে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া এবং এই ধরনের হত্যার মধ্যে, মাতৃ অধিকার অনুযায়ী সবচেয়ে ঘৃণ্য হচ্ছে মাতৃহত্যা তার কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। অ্যাপোলো অরেস্টেদের পক্ষ নিয়ে হস্তক্ষেপ করলেন। এথেনা এরিওপেগোইটিসদের অথবা এথেনীয় জুরীদের এই প্রশ্নে ভোট দিতে বললেন। মুক্তি ও শাস্তির পক্ষে ভোট সমান হলো। তখন এথেনা বিচারের সভানেত্রী হিসেবে অরেস্টেসের পক্ষে তাঁর ভোট দিয়ে তাকে মুক্ত করলেন। মাতৃ অধিকারকে হারিয়ে পিতৃ অধিকার জিতল। এরিনিয়েরা যাদের অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন ছোট তরফের 'দেবতা' – তাঁরাই এরিনিয়িদের হারিয়ে দিলেন এবং শেষোক্তরা শেষ পর্যন্ত নববিধানের অধীনে নতুনতর পদ গ্রহণে রাজী হলেন।

'আরস্টেইয়ার' এই নতুন কিন্তু একেবারে নির্ভুল ব্যাখ্যাটি হচ্ছে সমগ্র রচনার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ এবং অত্যন্ত সুন্দর অংশ, কিন্তু সেই সঙ্গে তা থেকে দেখা যায় যে, এস্কাইলাস্ অন্তত তাঁর যুগে এরিনিয়ে, অ্যাপোলে ও এথেনাকে যতটা বিশ্বাস করতেন, বাখোফেন নিজেও অন্তত তার চেয়ে কম করেন না; বস্তুত তিনি বিশ্বাস করেন যে, গ্রীসের বীর যুগে এঁরাই মাতৃ-অধিকারকে অপসারিত করে পিতৃ-অধিকার প্রতিষ্ঠার আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন। স্পষ্টত এরূপ একটি যে ধারণায় ধর্মকেই বিশ্ব ইতিহাসে পরিবর্তনের চূড়ান্তকারিকা মনে করা হয়, তা নিছক রহস্যবাদে পরিণত হতে বাধ্য। এইজন্যই বাখোফেনের স্থূলকায় গ্রন্থটি পড়ে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং সবক্ষেত্রেই লাভজনক নয়।

৪. এরিনিয়ে–গ্রীক পুরাকথার প্রতিহিংসার প্রেতিনী, নারী রূপে কল্পিত, চুলের বদলে মাথায় তাদের সাপের জটা। – সম্পাঃ

কিন্তু এতে অগ্রগামী হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব একটুও কমে না, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম নির্বিচার যৌন সম্পর্কের একটা অজানা আদিম অবস্থা সম্বন্ধে ফাঁকা বুলির জায়গায় প্রমাণ দেন যে, প্রাচীন চিরায়ত সাহিত্যে অনেক চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে যে, গ্রীক ও এশিয়াবাসীদের মধ্যে একবিবাহের আগে সত্য সত্যই সেরূপ একটি অবস্থা ছিল, যখন প্রতিষ্ঠিত কোন প্রথা লঙ্ঘন না করেও শুধু যে একটি পুরুষ বহু স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখত তাই নয়, পরন্তু একজন স্ত্রীলোকও বহু পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখতে পারত; একবিবাহের অধিকার নারীরা যে সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য আত্মসমর্পণ মারফত ক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল তার মধ্যে নিজের চিহ্ন না রেখে এ প্রথা লুপ্ত হয় নি; তাই প্রথমে শুধু মাত্র স্ত্রীলোক থেকে মাতা অনুযায়ী বংশপরম্পরায় হিসাব করা হতো; এবং এইভাবে নারীবংশ পরম্পরার বৈধতা একবিবাহের যুগেও বেশ কিছুকাল বজায় ছিল যখন পিতৃত্ব সুনিশ্চিত অথবা অন্তত সর্ববাদীসম্মত; এবং সন্তানসন্ততিদের একমাত্র সুনিশ্চিত জন্মদাতা হিসাবে মায়ের এই আদি প্রতিষ্ঠার ফলে মা এবং সাধারণভাবে স্ত্রীলোকদের জন্য এমন একটা উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত ছিল যা পরবর্তীযুগে তাঁরা আর পাননি। বাখোফেন অবশ্য এই প্রতিপাদ্যগুলি এতটা পরিষ্কার করে ব্যক্ত করেননি– তাঁর রহস্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে ব্যাহত করেছে; কিন্তু তিনি প্রমাণ করলেন যে, এই প্রতিপাদ্যগুলি নির্ভুল এবং ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে এর তাৎপর্য সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক।

বাখোফেনের বিরাট গ্রন্থ জার্মান ভাষায় লিখিত হয়েছিল, অর্থাৎ এমন একটি জাতির ভাষায় যারা বর্তমান পরিবারের প্রাগৈতিহাসিক বৃত্তান্ত সম্বন্ধে সে সময় অন্যান্য জাতির চেয়ে অনেক কম আগ্রহসম্পন্ন ছিল। তাই তিনি অজ্ঞাতেই থেকে গেলেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর আশু উত্তরসূরী ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করলেন, তিনি কখনও বাখোফেনের নাম পর্যন্ত শোনেননি।

এই উত্তরসূরী হলেন জন ফেরগুসন ম্যাক-লেনান। তিনি তাঁর পূর্বগামীর সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রতিভাশালী রহস্যবাদীর জায়গায় আমরা দেখি একটি কাটখোট্টা উকিল; উচ্ছল কাব্য কল্পনার জায়গায় আমরা দেখি যে, একজন আইনজীবী তাঁর মামলার পক্ষে গ্রহণযোগ্য যুক্তি সাজাচ্ছেন। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের বহু বন্য, বর্বর এমনকি সভ্য জাতির মধ্যে ম্যাক-লেনান বিবাহের একটি প্রথার সন্ধান পান যাতে পাত্র, একাকী অথবা বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে পাত্রীকে তার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার ভান করে। এই প্রথাটি নিশ্চয়ই কোন পূর্ববর্তী একটি প্রথার লুপ্তাবশেষ যাতে এক উপজাতির লোকেরা অন্য উপজাতি থেকে সত্যসত্যই বলপূর্বক হরণ করে স্ত্রী সংগ্রহ করত। কেমন করে এই 'হরণ করে বিবাহের' প্রথা এল? যতদিন পুরুষেরা নিজেদের উপজাতির মধ্যে যথেষ্ট স্ত্রীলোক পেত, ততদিন এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু প্রায়ই আমরা দেখতে পাই যে, অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে কিছু কিছু গ্রুপ আছে (১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে এই গোষ্ঠীগুলিকে প্রায়ই উপজাতির সঙ্গে এক করে দেখা হত) যাদের নিজেদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ, তার ফলে পুরুষেরা তাদের স্ত্রী এবং স্ত্রীলোকেরা তাদের স্বামী এই গ্রুপের বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে বাধ্য হতো; আবার কোথাও কোথাও এমন প্রথা প্রচলিত যাতে একটি বিশেষ গ্রুপের পুরুষেরা কেবল নিজেদের মধ্যে থেকেই স্ত্রী সংগ্রহ করতে বাধ্য ছিল। ম্যাক-লেনান প্রথম ধরনের গ্রুপকে বহির্বিবাহিক (exogamous) এবং দ্বিতীয়টিকে অন্তর্বিবাহিক (endogamous) আখ্যা দেন এবং কোনো দ্বিধা না করে তিনি বহির্বিবাহিক ও অন্তর্বিবাহিক 'উপজাতিদের' মধ্যে একটা অনড় বৈপরীত্য কায়েম করে দেন। এবং যদিও বহির্বিবাহ নিয়ে

তাঁর নিজের গবেষণার ফলে এই সত্যটি তাঁর চোখের সামনেই ফুটে ওঠে যে, সর্বক্ষেত্রে যদি নাও হয় তাহলেও অনেক ক্ষেত্রে, এই বৈপরীত্যের অস্তিত্ব শুধু তার কল্পনাতে, তবুও তিনি একেই ভিত্তি করে তাঁর সমগ্র মতবাদ গড়ে তোলেন। সেই হিসাবে বহির্বিবাহিক উপজাতিরা কেবলমাত্র অন্যান্য উপজাতি থেকেই তাদের স্ত্রী সংগ্রহ করতে পারে; এবং উপজাতিগুলির মধ্যে চিরস্থায়ী যুদ্ধের যে যুগ ছিল বন্য অবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য, তখন এই কাজ কেবল বলপূর্বক হরণ করেই সম্ভব বলে তাঁর ধারণা।

ম্যাক-লেনান তারপর প্রশ্ন করেছেন : কোথা থেকে এই বহির্বিবাহ প্রথা এল? রক্ত সম্পর্ক এবং অগম্যাগমনের ধারণাগুলির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ এইগুলি অনেক পরেই দেখা দিয়েছে। কিন্তু যে প্রথাটি বন্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদের মেরে ফেলা– তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে। এই প্রথার ফলে প্রত্যেকটি উপজাতিতে পুরুষের সংখ্যাধিক্য ঘটল, যার অবশ্যাম্ভাবী ও অব্যবহিত ফল হচ্ছে এক নারীর উপর একাধিক পুরুষের দখল– বহুস্বামী প্রথা। এর ফলে আবার একটি শিশুর মা কে তা জানা যেত, কিন্তু বাবা নয়, তাই কূলের হিসাব হতো পুরুষ বাদ দিয়ে স্ত্রীলোক অনুযায়ী। এই হলো মাতৃ-অধিকার। এবং একটি উপজাতির মধ্যে স্ত্রীলোক কম হওয়ার অন্য একটি ফলই হচ্ছে (বহুস্বামী প্রথা দিয়ে এই অভাব উপশম হয়, দূর হয় না) অন্যান্য উপজাতির থেকে নিয়মিতভাবে বলপূর্বক স্ত্রীলোক অপহরণের ঠিক এই প্রথাটি। 'যেহেতু বহির্বিবাহ প্রথা ও বহুস্বামী প্রথা উভয়েরই কারণ একটি– স্ত্রী পুরুষের সংখ্যায় অসামঞ্জস্য– তাই **সমস্ত বহির্বিবাহিক জাতিগুলিকে আদিতে বহুপতিক** বলে গণ্য করতে আমরা বাধ্য ..... অতএব কোনো তর্কের অবকাশ না রেখেই আমরা বলতে পারি যে, বহির্বিবাহিক জাতিগুলির মধ্যে প্রথম কুল ব্যবস্থা ছিল সেইটে, যাতে শুধুমাত্র মায়ের মারফত রক্ত সম্পর্ককে স্বীকার করত।' (ম্যাক লেনান, 'প্রাচীন ইতিহাসের গবেষণা', ১৮৮৬। আদিম বিবাহ[৫], পৃঃ ১২৪।)

ম্যাক-লেনানের কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তিনি যাকে বহির্বিবাহ বলছেন, সেই প্রথার ব্যাপক প্রচলন ও প্রভূত গুরুত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বহির্বিবাহ গ্রুপের অস্তিত্বটা মোটেই তাঁর আবিষ্কার নয়, আর তাকে বুঝেছেন আরো কম। অনেক পরিদর্শকের পূর্বতন বিচ্ছিন্ন যেসব মন্তব্য থেকে ম্যাক-লেনান তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাদের কথা বাদ দিলেও লেথাম ('বিবরণমূলক নরকূলতত্ত্ব',) ১৮৫৯[৬]) যথাযথ ও নির্ভুলভাবে ভারতবর্ষের মাগরদের মধ্যে এই প্রথার বিবরণ দেন এবং ঘোষণা করেন যে, এটি সাধারণভাবে প্রচলিত ও পৃথিবীর সব মহাদেশে দেখা যায়– এই অংশটুকু ম্যাক-লেনান নিজেও উদ্ধৃত করেছেন। এমনকি আমাদের মর্গানও ১৮৪৭ সালেই (American Review পত্রিকায় প্রকাশিত) ইরকোয়াসদের সম্পর্কিত পত্রাবলীতে এবং ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'ইরকোয়াসদের লীগে[৭] প্রমাণ করেন যে, এই উপজাতির মধ্যেও এই প্রথা ছিল এবং নির্ভুলভাবে এর বিবরণ দেন, অথচ পরে দেখতে পাব, ম্যাক-লেনানের উকিলসুলভ মনোবৃত্তি এই বিষয়টিকে যতটা তালগোল পাকিয়েছিল মাতৃ-অধিকারের ক্ষেত্রে বাখোফেনের রহস্যবাদী কল্পনাও ততটা পারেনি। এটিও ম্যাক-লেনানের কৃতিত্ব যে, তিনি মায়ের অধিকার অনুযায়ী বংশগণনাকেই

৫. *J.F.Mac-Lennan, Studies in Ancient History, comprising a reprint of Primitive Marriae, London, 1886.* -সম্পাঃ

৬. *R.G.Latham, Descriptive Ethnology Vol. 1-11, London, 1859.* -সম্পাঃ

৭. *R.G.Morgan, League of the Ho-de-no-sau-neeor Iroquois, Rochester, 1851.*- সম্পাঃ

আদি বলে মেনেছিলেন যদিও তিনি পরে নিজেই স্বীকার করেন যে, এই ব্যাপারটি বাখোফেন তাঁর আগেই ধরেছিলেন। কিন্তু এখানেও তিনি মোটেই স্পষ্ট নন; তিনি বারবার বলেছেন, 'শুধু স্ত্রীলোক ধারা অনুযায়ী আত্মীয়তা' (kinship through females only). এবং আগের পর্যায়ে নির্ভুল এই আখ্যাটিকে বিকাশের পরবর্তী স্তরেও বরাবর প্রয়োগ করেছেন যখন বংশপরম্পরা ও উত্তরাধিকার পূর্ণমাত্রায় নারী ধারা দিয়ে হিসাব হলেও পুরুষ ধারা থেকেও আত্মীয়তা স্বীকৃত ও ব্যক্ত হতো। এই হচ্ছে আইনজীবীর গন্ডীবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি, যিনি নিজের মনে একটি অনড় আইনী সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছেন এবং যে পরিস্থিতিতে তা ইতিমধ্যে অচল হয়ে গেছে সেই পরিস্থিতিতেও তার বদল না করে ক্রমাগত প্রয়োগ করে চলেছেন।

যুক্তিযুক্ত বলে শোনালেও স্পষ্টতই ম্যাক-লেনানের তত্ত্ব তাঁর নিজের কাছেও খুব যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হয়নি। অন্ততপক্ষে তিনি নিজে এই ঘটনায় আশ্চর্য হয়েছেন যে 'লক্ষ্য করা গেছে যে, (নকল) হরণের রীতি এখন সর্বাধিক লক্ষিত ও জমকালো শুধু সেইসব জাতির মধ্যে যাদের আত্মীয়তা পুরুষ দিয়ে স্থির হয় (অর্থাৎ পুরুষ মারফৎ বংশপরম্পরা)' (পৃঃ ১৪০)। পুনরপিঃ 'এটি খুব বিচিত্র ঘটনা যে, যতদূর জানা গিয়েছে যেখানে বহির্বিবাহ প্রথা এবং আত্মীয়তার আদি রূপ পাশাপাশি বর্তমান সেরকম কোথাও আর শিশু হত্যার রীতি নেই' (পৃঃ ১৪৬)। এই দুটি ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ব্যাখ্যাকে ভুল প্রমাণ করে এবং তা কাটাবার জন্যে নতুন নতুন আরও বেশি জটিল সব প্রকল্প দাঁড় করাতে হয় তাঁকে।

তাহলেও ইংল্যান্ডে তাঁর তত্ত্ব খুব প্রশংসা পায় ও সাড়া জাগায়; সাধারণভাবে ম্যাক-লেনানকেই ও দেশে পরিবারের ইতিহাসের প্রতিষ্ঠাতা এবং ঐক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রামাণ্য বলে মেনে নেওয়া হলো। বহির্বিবাহিক ও অন্তর্বিবাহিক 'উপজাতির' বৈপরীত্য সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কিছু কিছু ব্যতিক্রম ও অদলবদল সত্ত্বেও প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির সাধারণতঃ স্বীকৃত ভিত্তি রয়ে গেল এবং এইটাই চোখে ঠুলির মতো অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে স্বাধীন পর্যালোচনা ও তার ফলে সুস্পষ্ট অগ্রগতি অসম্ভব করে তুলল। ম্যাক-লেনানকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যা ইংল্যান্ডে ও ইংরেজী ফ্যাশানের অনুকরণে অন্যত্রও রেওয়াজ হয়ে উঠেছিল, তার প্রতিতুলনায় উল্লেখ করা কর্তব্য যে, পুরোপুরি ভ্রান্ত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত বহির্বিবাহিক ও অন্তর্বিবাহিক 'উপজাতিগুলির' বৈপরীত্যের মতবাদ দ্বারা তিনি যে ক্ষতি করেছেন তা তাঁর গবেষণার সমগ্র সুফল ছাড়িয়ে গিয়েছে।

ইতিমধ্যে অচিরেই আরও অনেক তথ্য জানা গেল যাকে এই মতবাদের পরিপাটী কাঠামোর মধ্যে আর মোটেই খাপ খাওয়ান যায় না। ম্যাক-লেনান বিবাহের তিনটি মাত্র রূপ জানতেন – বহুপত্নী প্রথা, বহুস্বামী প্রথা ও একপতিপত্নী প্রথা। কিন্তু একবার এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হবার পর এই তথ্যের সমর্থনে ক্রমেই বেশি করে প্রমাণ আবিষ্কৃত হতে থাকল যে, অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে বিবাহের এমন পদ্ধতি ছিল যাতে একদল পুরুষ সমষ্টিগতভাবে একদল স্ত্রীলোকের স্বামিত্ব করত, এবং লাবক (তাঁর রচিত 'সভ্যতার উৎপত্তি', ১৮৭০[৮]) এই সমষ্টিগত বিবাহকে (communal marriage) একটি ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকার করলেন।

এর অব্যবহিত পরেই ১৯৭১ সালে মর্গান তাঁর নতুন এবং অনেক বিষয়ে প্রামাণ্য তথ্য নিয়ে হাজির হলেন। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে, ইরকোয়াসদের মধ্যে প্রচলিত বিশেষ ধরনের

৮. *J.Lubbock, The Origin of Civilization and the Primitive Condition of Man. Mental and Social Condition of Savages. London, 1870.* - সম্পাঃ

আত্মীয়তাবিধি যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য এবং সুতরাং তা একটি গোটা মহাদেশে পরিব্যাপ্ত, যদিও তাদের প্রচলিত দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন স্তরের আত্মীয়তার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ বিরোধ আছে। তিনি তারপর আমেরিকার ফেডারেল সরকারকে তাঁর রচিত প্রশ্নাবলী ও কয়েকটি ছকের সাহায্যে অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে প্রচলিত আত্মীয়তাবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে রাজী করান, এবং জবাবগুলির থেকে তিনি আবিষ্কার করেন যে, : (১) আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের আত্মীয়তাবিধি এশিয়ার বহু উপজাতির মধ্যে এবং কিছুটা পরিবর্তিত রূপে আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াতেও প্রচলিত; (২) এর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় হাওয়াই এবং অন্যান্য অস্ট্রেলিয়ান দ্বীপগুলিতে বর্তমানে যা বিলোপের পথে চলেছে সেই ধরনের এক সমষ্টিবিবাহ থেকে; (৩) এই বিবাহের পাশাপাশি এইসব দ্বীপে যে আত্মীয়তাবিধি প্রচলিত রয়েছে তার কিন্তু ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেবল আরও প্রাচীন কিন্তু অধুনা বিলুপ্ত এক ধরনের সমষ্টি-বিবাহ দিয়ে। সংগৃহীত তথ্য ও তাঁর সিদ্ধান্তগুলি একত্র করে তিনি ১৮৭১ সালে 'রক্ত সম্পর্ক ও আত্মীয়তার বিভিন্ন প্রথা'[৯] বইটা প্রকাশ করেন এবং তাতে করে আলোচনাকে নিয়ে আসেন এক অসীম ব্যাপক ক্ষেত্রে। আত্মীয়তার প্রথাগুলি থেকে শুরু করে তিনি প্রত্যেকটির সহযোগ্য পরিবারের রূপ খাড়া করেন এবং এইভাবে অনুসন্ধানের এক নতুন ধারা ও মানবজাতির প্রাক-ইতিহাসে অনেক দূরপ্রসারী এক পশ্চাৎ-প্রেক্ষিত উন্মুক্ত করেন। এই পদ্ধতিকে সঠিক বলে মেনে নিলে ম্যাক-লেনানের পরিপাটি ছকটি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

ম্যাক-লেনান তাঁর 'আদি বিবাহ' (প্রাচীন ইতিহাসের গবেষণা', ১৮৭৬) নামক রচনার একটি নতুন সংস্করণে নিজের মতবাদের সমর্থন করেন। তিনি নিজেই নিছক প্রকল্পের উপরই কৃত্রিমভাবে পরিবারের ইতিহাস গড়ে তুললেও লাবক ও মর্গানের কাছ থেকে তিনি তাঁদের প্রত্যেকটি বক্তব্যের প্রমাণ চাইলেন শুধু নয়, এমন অবিসংবাদী প্রমাণ যা কেবল স্কটল্যান্ডের আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে। এবং তা চাইলেন এমন একটি ব্যক্তি যিনি জার্মানদের মধ্যে প্রচলিত মায়ের ভাই এবং বোনের ছেলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে (ট্যাসিটাস রচিত 'জার্মানিয়া', ২০ পরিচ্ছেদ), সিজারের যে রিপোর্টে বলা হয়েছে দশবার জন বৃটন দল বেঁধে সাধারণ একদল স্ত্রী রাখত, তা থেকে এবং বর্বর জাতিগুলির মধ্যে মেয়েদের যৌথস্বামী প্রথা সম্পর্কে প্রাচীন লেখকদের অন্যান্য বক্তব্য থেকে একটুও দ্বিধা না করে সিদ্ধান্ত করে বসলেন যে, বহুস্বামী প্রথা এই সমস্ত জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল! এ যেন মনে হয় আমরা একটি অভিশংসকের সওয়াল শুনছি নিজের মামলার পক্ষে সবরকম স্বাধীনতা নিতে যাঁর বাধে না, অথচ আসামী পক্ষের উকিলের প্রতিটি কথার পিছনে যিনি অতি আনুষ্ঠানিক ও আইনত বৈধ প্রমাণই কেবল দাবী করেন।

তিনি বলে বসলেন যে, সমষ্টি-বিবাহ হচ্ছে একটি নিছক কল্পনা এবং এইভাবে বাখোফেন থেকেও অনেক পিছিয়ে গেলেন। মর্গানের আত্মীয়তাবিধি সম্পর্কে তিনি বললেন যে, ঐগুলি সামাজিক ভদ্রতা ছাড়া আর কিছু বেশি নয় এবং তা এই ঘটনায় প্রমাণিত যে, ইন্ডিয়ানরা ভিন্ন জাতি, এমনকি শ্বেতজাতি লোকদেরও 'ভ্রাতা' ও 'পিতা' বলে সম্ভাষণ করে। একথা বলার অর্থ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী – এগুলি মাত্র সম্ভাষণের ফাঁকা রূপ, কারণ ক্যাথলিক ধর্মের পুরোহিত এবং প্রধান সন্ন্যাসিনীদেরও পিতা এবং মাতা বলে সম্ভাষণ করা

৯. *L.H.Morgan, Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family, Washington. 1871.* - সম্পাঃ

হয় এবং সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী এমনকি ফ্রিম্যাসন্ ও ইংল্যান্ডের কারুজীবী ইউনিয়নের সভ্যরাও নিজেদের সভার সুগম্ভীর অধিবেশনে ভ্রাতা এবং ভগিনী বলে সম্ভাষিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে ম্যাক-লেনানের আত্মপক্ষ সমর্থন শোচনীয় রকমের দুর্বল।

একটি বিষয় কিন্তু বাকি ছিল যেখানে ম্যাক-লেনান সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠেনি। তাঁর সমস্ত পদ্ধতিটি বহির্বিবাহিক ও অন্তর্বিবাহিক উপজাতিদের যে বৈপরীত্যের উপর দাঁড়িয়েছিল সেটি এখনও অক্ষুন্ন ছিল তাই নয়, এমনকি এটিকে সাধারণভাবে পরিবারের সমগ্র ইতিহাসের খুঁটি বলেই গ্রহণ করা হয়েছিল। এ কথা স্বীকার করা হতো যে, এই বৈপরীত্যকে ব্যাখ্যা করার জন্যে ম্যাক-লেনানের প্রচেষ্টা যথোপযুক্ত নয় এবং তাঁর নিজের বর্ণিত তথ্যেরই তা বিরোধী; কিন্তু এই বৈপরীত্যের ব্যাপারটা, পরস্পরের একবারে বিপরীত দুই ধরনের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র উপজাতির এই অস্তিত্ব, যাদের একটি পত্নী সংগ্রহ করত নিজেদের মধ্যে থেকে অথচ অপরটির কাছে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল,– এটা একেবারে তর্কাতীত বেদবাক্য বলে চলত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জিরো-তেলোঁর 'পরিবারের উৎপত্তি' (১৮৭৪)[১০] এবং এমনকি লাবকের 'সভ্যতার উৎপত্তি' (৪র্থ সংস্করণ ১৮৮২) মিলিয়ে দেখতে পারেন।

এইখানেই আসে মর্গানের মূল রচনা, 'প্রাচীন সমাজের' (১৮৭৭) কথা, যার ওপর ভিত্তি করে বর্তমান পুস্তকটি লেখা হয়েছে। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে মর্গান যে জিনিসটি অস্পষ্টভাবে অনুমান করেছিলেন এখানে তা পরিপূর্ণ স্পষ্টতায় বিকশিত করা হয়েছে। বহির্বিবাহ আর অন্তর্বিবাহের মধ্যে আর কোনো বৈপরীত্য নেই; আজ পর্যন্ত কোথাও কোনো বহির্বিবাহিক 'উপজাতি' আবিষ্কার হয়নি। কিন্তু যে সময়ে সমষ্টি-বিবাহ প্রচলিত ছিল– এবং খুব সম্ভবত সর্বত্রই কোনো না কোনো সময় এটি ছিল, – তখন উপজাতি গড়ে উঠত মায়ের দিক দিয়ে রক্ত সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রুপ বা গোত্র (gentes) নিয়ে যাদের অভ্যন্তরে বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল, ফলে যদিও গোত্রের লোকেরা নিজেদের উপজাতিদের মধ্যে থেকেই পত্নী সংগ্রহ করতে পারত ও সাধারণত তাই করত, কিন্তু তা করতে হতো নিজেদের গোত্রের বাইরে থেকে। তাই গোত্রগুলি কঠোরভাবে বহির্বিবাহিক হলেও সমস্ত গোত্র একত্রে নিয়ে যে উপজাতি সেটি ছিল কঠোরভাবেই অন্তর্বিবাহিক। এইবার ম্যাক-লেনানের কৃত্রিম কাঠামোর শেষ অবশেষ ভেঙে পড়ল।

মর্গান অবশ্য এতেই তৃপ্ত থাকেননি। আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের গোত্র থেকে শুরু করে তিনি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আরও এক পা এগিয়ে যেতে পারলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন যে, মাতৃ-অধিকারের ভিত্তিতে সংগঠিত এই গোত্র হচ্ছে আদিরূপ যার থেকে পিতৃ-অধিকার অনুযায়ী সংগঠিত পরবর্তী গোত্রের উৎপত্তি হয়েছে, যা আমরা প্রাচীনকালের সভ্য জাতিগুলির মধ্যে দেখতে পাই। গ্রীক ও রোমান গোত্র যা সমস্ত পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের কাছে ছিল ধাঁধা, এখন তার ব্যাখ্যা হলো ইন্ডিয়ান গোত্র দিয়ে এবং এইভাবে আদি সমাজের সমগ্র ইতিহাসের একটি নতুন ভিত্তি পাওয়া গেল।

সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে পিতৃ-অধিকার নিয়ে যে গোত্র দেখা যায় তার পূর্ববর্তী স্তরে আদি মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রের আবিষ্কারটি হচ্ছে আদিম সমাজের ইতিহাস সম্পর্কে ঠিত ততখানি অর্থপূর্ণ যতখানি জৈব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডারউইনের বিবর্তনবাদ অথবা অর্থনীতির ক্ষেত্রে মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। এর সাহায্যে মর্গান এই প্রথম পরিবারের ইতিহাসের একটি রূপরেখা দিতে পারলেন যাতে বিবর্তনের অন্তত চিরায়ত পর্যায়গুলি,

[১০] A Giraud-Teulon, Les origines de la famile, Geneve, Paris, 1874. –সম্পাঃ

বর্তমানে লভ্য তথ্যের ভিত্তিতে যতটা সম্ভব, খসড়াকারে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলো। স্পষ্টতই এতে আদিম সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনার নতুন যুগ শুরু হলো। মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রই হয়ে দাঁড়াল সেই খুঁটি যার ওপর এ বিজ্ঞানের ভর; এই আবিষ্কারের পর আমরা বুঝতে পারি কোন পথে গবেষণা চালাতে হবে, কোন কোন অনুসন্ধান করতে হবে এবং কেমন করে অনুসন্ধানের ফলগুলি সাজাতে হবে। ফলে মর্গানের রচনা প্রকাশিত হবার পর এইক্ষেত্রে অগ্রগতি আগেকার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত ও ভিন্নরূপ।

বর্তমানে মর্গানের আবিষ্কারগুলি ইংল্যান্ডের প্রাক-ইতিহাসবিদরাও সাধারণভাবে মেনে নিয়েছেন অথবা সঠিক বলতে গেলে আত্মসাৎ করেছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রায় কেউই প্রকাশ্যে স্বীকার করেন না যে, দৃষ্টিভঙ্গির এই বিপ্লবের জন্য আমরা মর্গানের কাছে ঋণী। ইংল্যান্ডে যতদূর সম্ভব তাঁর পুস্তকের সম্বন্ধে নীরব থাকা হয় এবং মর্গানের পূর্ববর্তী রচনাকে মুরব্বিয়ানা চালে প্রশংসা করেই তাঁকে বিদায় করা হয়; তাঁর পরিসংখ্যানের খুঁটিনাটি সাগ্রহে চেপে ধরা হয় সমালোচনার জন্য অথচ তাঁর সত্যসত্যই মহৎ আবিষ্কারগুলি সম্পর্কে একগুঁয়ে নীরবতা বজায় রাখা হয়। 'প্রাচীন সমাজের' আদি সংস্করণটি বাজারে নেই; আমেরিকায় এই ধরনের পুস্তকের লাভজনক বাজার নেই; ইংল্যান্ডে মনে হয় যে বইখানিকে নিয়মিতভাবে চেপে রাখা হয়েছে এবং এই যুগান্তকারী রচনার যে সংস্করণটি এখনও বাজারে পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে একটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ।

কেন এই কুণ্ঠা, যাকে নীরবতা চক্রান্ত বলে না ভাবা দুষ্কর, বিশেষত আমাদের মান্যগণ্য প্রাগৈতিহাসিক পন্ডিতদের রচনাগুলি যখন নিছক ভদ্রতার জন্য উদ্ধৃতি অথবা দোস্তির অন্যান্য সাক্ষ্যে ভরপুর। সে কি এইজন্য যে মর্গান আমেরিকান এবং ইংরেজ প্রাগৈতিহাসিক পন্ডিতদের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রশংসনীয় পরিশ্রম সত্ত্বেও, যে তথ্যের বিন্যাস ও বর্গভেদে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, সংক্ষেপে ধারণার জন্য দু'জন প্রতিভাশালী বিদেশী – বাখোফেন ও মর্গানের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হওয়া তাঁদের পক্ষে ভারি কষ্টকর? একজন জার্মানকে বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু একজন আমেরিকান? প্রত্যেক ইংরেজ আমেরিকানকে দেখলে কীরকম দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠেন তার অনেক হাস্যকর দৃষ্টান্ত আমি যুক্তরাষ্ট্রে থাকবার সময় দেখেছি। এর সঙ্গে যোগ করা যায় যে, ম্যাক-লেনান ছিলেন ইংল্যান্ডের প্রাগৈতিহাসিক বিদ্যার বলা যেতে পারে সরকারিভাবে বিঘোষিত প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা; শিশু হত্যা থেকে শুরু করে বহুস্বামী প্রথা ও হরণ করে বিবাহ করার মারফৎ মাতৃ-অধিকারসমন্বিত পরিবার প্রথা পর্যন্ত তাঁর এই কৃত্রিম ঐতিহাসিক মতবাদের অতি সশ্রদ্ধ উল্লেখই ছিল প্রাগৈতিহাসিক পন্ডিতদের কাছে একধরনের শালীনতাস্বরূপ; পরস্পরের একেবারে বিরোধী বহির্বিবাহিক ও অন্তর্বিবাহিক উপজাতির অস্তিত্ব সম্পর্কে একটুও সন্দেহ প্রকাশ ছিল চরম ধৃষ্টোক্তি; অতএব মর্গান এই সমস্ত পবিত্র গুরুবাক্য উড়িয়ে দেওয়ায় এক ধরনের মহাপাপী হয়ে উঠলেন। উপরন্তু মর্গান এগুলি উড়িয়ে দিলেন এমন যুক্তি ব্যবহার করে যে বক্তব্য উপস্থিত করা মাত্রই সেটি সঙ্গে সঙ্গে সকলের কাছেই প্রতীয়মান হয়ে উঠল এবং ম্যাক-লেনানের ভক্তরা, যাঁরা এতকাল বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহের মধ্যে হোঁচট খেয়ে ঘুরছিলেন তাঁদের প্রায় কপাল চাপড়ে বলতে হতো: কী বোকামি যে, এসু জিনিস আমরা নিজেরাই অনেক আগেই বার করতে পারিনি!

তাছাড়া সরকারী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে একমাত্র শীতল উপেক্ষা পাবার মতো অপরাধ যেন এতেও হয়নি, তাই সে অপরাধের পাত্র তিনি পূর্ণ করে তুললেন সভ্যতাকে, পণ্যোৎপাদনের সমাজকে, আমাদের আধুনিক সমাজের বনিয়াদী রূপটাকে এমন

সমালোচনা করে যা মনে পড়িয়ে দেয় ফুরিয়ের কথা এবং শুধু তাই নয়, এই সমাজের ভবিষ্যৎ রূপান্তরের কথাও তিনি বললেন এমন ভাষায় যা কার্ল মার্কসও ব্যবহার করতে পারতেন। তাই এর প্রতিফলন তিনি পেলেন যখন ম্যাক-লেনান ক্রুদ্ধভাবে অভিযোগ আনলেন যে, তাঁর মধ্যে ঐতিহাসিক পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর বিরাগ রয়েছে' এবং যখন এমনকি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দেও জেনেভার অধ্যাপক জিরো-তেলোঁ সে অভিমত সমর্থন করলেন। অথচ ইনি সেই একই জিরো-তেলোঁ যিনি ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ('পরিবারের উৎপত্তি') ম্যাক-লেনানের বহির্বিবাহিক গোলকধাঁধায় অসহায় হয়ে ঘুরে মরছিলেন এবং সে অবস্থা থেকে কেবল মর্গানই তাঁকে উদ্ধার করেন!

আদিম সমাজের ইতিহাস আর কোন কোন অগ্রগতির জন্য মর্গানের কাছে ঋণী তা এক্ষেত্রে আর আলোচনা করা দরকার করে না; যা দরকার তার উল্লেখ পাওয়া যাবে বর্তমান পুস্তকের মধ্যে। মর্গানের মূল রচনা প্রকাশের পরে যে চোদ্দ বছর কেটে গিয়েছে তার মধ্যে আদিম মানবসমাজের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের তথ্যের ভাণ্ডার অনেক বেশি পুষ্ট হয়েছে। নৃতত্ত্ববিদ, পর্যটক এবং পেশাদার প্রাগৈতিহাসিক পন্ডিত ছাড়াও তুলনামূলক আইনবিধির প্রতিনিধিরা এইক্ষেত্রে এসেছেন এবং নতুন নতুন তথ্য ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছেন। ফলে মর্গানের কোনো কোনো প্রকল্প বিচলিত এমনকি খন্ডিতও হয়ে গেছে। কিন্তু কোথাও নতুন সংগৃহীত তথ্য তাঁর মূল প্রভূতগুরুত্বসম্পন্ন ধারণাগুলিকে হঠিয়ে দেয়নি। আদিম সমাজের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তিনি যে ধরনের শৃঙ্খলার প্রবর্তন করেছিলেন তার মূলকথা আজও প্রতিষ্ঠিত। এমনকি এই কথাই বলতে পারি, যে হারে এই বিরাট অগ্রগতির উদ্ভাবকের নাম গোপন করা হচ্ছে সেই হারেই তা ক্রমবর্ধমান সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করছে।[১১]

লন্ডন, ১৬ই জুন, ১৮৯১ ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

১১. ১৮৮৮ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে আমার ফেরার পথে রচেস্টারের একজন ভূতপূর্ব কংগ্রেসের সঙ্গে আমার দেখা হয়, তিনি লুইস মর্গানকে চিনতেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর সম্বন্ধে খুব অল্পই তিনি আমায় বলতে পারেন। তিনি বলেন, রচেস্টারে মর্গান একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে বাস করতেন, নিজের অধ্যয়ন নিয়েই থাকতেন। তাঁর ভাই ছিল সৈন্যবাহিনীর একজন কর্ণেল, ওয়াশিংটন সমর বিভাগের এক পদাধিকারী; এই ভাইয়ের মুরব্বিতে তিনি তাঁর গবেষণায় সরকারকে আগ্রহী করতে ও সরকারী খরচে তাঁর কতকগুলি রচনা প্রকাশিত করতে সক্ষম হন। ভূতপূর্ব কংগ্রেসীটি বলেন যে, কংগ্রেসে থাকার সময় তিনি নিজেও এ ব্যাপারে বার কয়েক তাঁকে সাহায্য করেন। (এঙ্গেলসের টীকা)।

১
সংস্কৃতির প্রাগৈতিহাসিক স্তর

বিশেষজ্ঞের জ্ঞান নিয়েই মর্গানই প্রথম ব্যক্তি যিনি মানুষের প্রাগৈতিহাসিক অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনায় একটি সুস্পষ্ট শৃঙ্খলা আনতে চেয়েছিলেন; যতদিন পর্যন্ত না নতুনতর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ফলে কোনো অদলবদল জরুরী হয়ে উঠছে,ততদিন পর্যন্ত তাঁর যুগবিভাগই প্রচলিত থাকবে বলে আশা করা যায়।

বন্যাবস্থা, বর্বরতা এবং সভ্যতা এই তিনটি মূল যুগের মধ্যে তিনি স্বভাবতই প্রথম দুটি যুগ এবং তৃতীয় যুগে উৎক্রমণ নিয়েই ভাবিত। প্রথম দুটি যুগকে তিনি জীবনোপকরণ উৎপাদনের অগ্রগতি অনুযায়ী নিম্নতন, মধ্যবর্তী এবং উচ্চতন এই তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন, কারণ তাঁর কথামতো, 'এই বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের ওপরই পৃথিবীতে মানুষের আধিপত্যের সমগ্র প্রশ্নটি নির্ভর করে। জীবজগতে একমাত্র মানুষই খাদ্য উৎপাদনের ওপর প্রায় অপরিসীম আধিপত্য লাভ করেছে। মানবিক অগ্রগতির সমস্ত মহাযুগগুলির কমবেশি পরিমাণে সরাসরিভাবে জীবনযাত্রার উপকরণের উৎসের পরিবর্ধনের সঙ্গেই মিলে যায়।' পরিবার প্রথার ক্রমপরিবর্তন একই সঙ্গে চলেছে, কিন্তু তাতে যুগবিভাগের এমন সুস্পষ্ট মাপকাঠি পাওয়া যায় না।

ক। বন্যাবস্থা

১। নিম্নতন স্তর। মানবজাতির শৈশব। মানুষ তখনও তার আদি বাসভূমি গ্রীষ্ম অথবা উপগ্রীষ্মমন্ডলী অঞ্চলের বনভূমিতে থাকত। অন্তত আংশিকভাবে গাছের ওপর বাস করত, এছাড়া বৃহদাকার হিংস্র জন্তুদের মুখে তার টিকে থাকার ব্যাখ্যা করা যায় না। ফল-মূলই ছিল তার খাদ্য; এই পর্বের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে পৃথকোচ্চারিত ভাষার উৎপত্তি। ঐতিহাসিক যুগে যে সমস্ত জনসমাজের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে কোথাও এই আদিম স্তরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। যদিও এই সব পর্ব সম্ভবত হাজার হাজার বছর ধরে চলেছে, তবু এর অস্তিত্বের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই; কিন্তু যখনই আমরা পশুজগৎ থেকে মানুষের উৎপত্তি মেনে নিই তখনই এমন একটি উৎক্রমণ স্তর মেনে নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

২। মধ্যবর্তী স্তর। খাদ্য হিসাবে মাছের ব্যবহার (মাছের মধ্যে কাঁকড়া, শামুক ও অন্যান্য জলজ জীবকে ধরা হচ্ছে) এবং আগুনের প্রয়োগ থেকে এই স্তরের শুরু। মাছ ও আগুন এই দুটি হচ্ছে পরস্পর পরিপূরক, কারণ কেবলমাত্র আগুনের সাহায্যেই মাছ পূর্ণমাত্রায় খাদ্য হিসেবে ব্যবহারযোগ্য হয়। এই নতুন খাদ্য কিন্তু মানুষকে জলবায়ু ও

স্থানীয় গন্ডী থেকে মুক্ত করল। নদীর গতিপথ এবং সমুদ্রের উপকূল ধরে মানুষ বন্য যুগেই ভূপৃষ্ঠের বেশির ভাগ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আদি প্রস্তরযুগের, তথাকথিত পুরাপ্রস্তর যুগের যে স্থূল, অমার্জিত পাথরের হাতিয়ারগুলি সম্পূর্ণভাবে অথবা প্রধানত এই সময়েরই বৈশিষ্ট্য তা সমস্ত মহাদেশেই ছড়িয়ে আছে ও এই পদযাত্রার সাক্ষ্য। বসবাসের নতুন অঞ্চলগুলির কারণে এবং পাথর ঘষে আগুন তৈরির বিদ্যা আয়ত্ত করার সঙ্গে জড়িত নতুন নতুন আবিষ্কারের অবিরাম সক্রিয় তাগিদে নতুন সব খাদ্যসামগ্রী পাওয়া গেল, যেমন তপ্ত ভস্মে ঝলসান অথবা গর্ত করে (ভূমি চুল্লি) সেঁকা শর্করাপ্রধান মূল ও কন্দ এবং শিকারলব্ধ জন্তু, যেগুলিকে লগুড় ও বর্শা এই দুটি আদিম অস্ত্র আবিষ্কারের পরে খাদ্যের তালিকাভুক্ত করা গিয়েছিল। কেতাবে যা লেখা হয় তেমন নিছক শিকারী জাতি অর্থাৎ শুধু শিকার করেই যারা খাদ্য সংগ্রহ করে, এমন জাতি কোনোদিনই ছিল না, কারণ শিকার করে কিছু পাওয়া এত অনিশ্চিত যে সেটা সম্ভবপর নয়। খাদ্যসামগ্রী উৎসের ক্রমাগত অনিশ্চিয়তার জন্য এইসময়ে নরমাংস ভোজনের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে হয় এবং বহুদিন ধরে চলতে থাকে। অস্ট্রেলীয় ও অনেক পলিনেশীয় আজ পর্যন্ত বন্যাবস্থার এই মধ্যবর্তী স্তরে রয়েছে।

৩। **উচ্চতন স্তর**। এই স্তর শুরু হয় তীর-ধনুক আবিষ্কার দিয়ে যার ফলে বন্য জীবজন্তু নিয়মিত খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং শিকার করা একটা স্বাভাবিক পেশা হয়ে ওঠে। ধনুক, ছিলা ও তীর তিনটি মিলিয়ে একটি জটিল হাতিয়ার, এর আবিষ্কারের পেছনে অনেক দিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং মানসিক শক্তির উৎকর্ষ ধরে নিতে হয়, সুতরাং যুগপৎ আরও বহু আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচয়ও ধরতে হয়। তীর ধনুকের সহিত পরিচিত হলেও তখনো পর্যন্ত মৃৎশিল্পের সহিত পরিচিত নয় (মর্গান মৃৎশিল্প থেকেই বর্বরতায় উৎক্রমণের যুগ ধরেছেন) এমন বিভিন্ন উপজাতির যদি তুলনা করি তাহলে দেখতে পাব এই আদি পর্যায়েও গ্রামে বসবাসের সূচনা হচ্ছে, জীবনোপকরণ উৎপাদনের ওপর কতকটা আধিপত্য জন্মেছে, দেখতে পাব কাঠের পাত্র ও বাসনকোসন, (তাঁত ছাড়াই) হাতে করে গাছের বাকল থেকে বস্ত্র বয়ন, গাছের ছাল বা শরজাতীয় জিনিস দিয়ে বোনা ঝুড়ি-চুপড়ি এবং মার্জিত পাথরের হাতিয়ার (নিওলিথিক যুগ)। বহুক্ষেত্রে দেখা যায় আগুন ও পাথরের কুঠার দিয়ে ইতিমধ্যেই গাছের গুঁড়ি থেকে কুঁদে তোলা ডোঙ্গা পাওয়া গেছে এবং কোথাও কোথাও কাঠ ও তক্তা দিয়ে গৃহনির্মাণ হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে এইসব অগ্রগতি দেখা যায়, তারা তীর-ধনুকের সঙ্গে পরিচিত হলেও মৃৎশিল্প সম্পর্কে কিছুই জানে না। বর্বরতার যুগে যেমন লোহার তরোয়াল এবং সভ্যতার যুগে আগ্নেয়াস্ত্র তেমনই বন্যাব্যবস্থায় তীর-ধনুকই ছিল নির্ধারক অস্ত্র।

খ। বর্বরতা।

১। **নিম্নতন স্তর**। মৃৎশিল্প থেকেই এর সূচনা। বহুক্ষেত্রেই একথা প্রমাণিত এবং সম্ভবত সর্বক্ষেত্রেই, আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য প্রথমে কাঠের পাত্র অথবা ঝুড়ি-চুপড়িগুলিতে মাটির প্রলেপ থেকে এর উদ্ভব; এ থেকেই শীগগির আবিষ্কার হলো যে,

কাদাকে ছাঁচে ঢাললে ভেতরের আধার ছাড়াই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

এই পর্যন্ত বিবর্তনের ধারা অঞ্চল নির্বিশেষে একটি বিশেষ যুগের সকল জাতির সম্পর্কে সাধারণভাবে সত্য বলে ধরতে পারি। বর্বরতার সূচনার সঙ্গে কিন্তু আমরা এমন একটা স্তরে এসে পড়ি যখন দুটি মহাদেশের মধ্যে প্রাকৃতিক অবস্থার পার্থক্য প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। বর্বরতার যুগের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পশুপালন ও প্রজনন এবং চাষবাস। পূর্ব মহাদেশ, তথাকথিত প্রাচীন গোলার্ধে গৃহপালনের উপযোগী প্রায় সব জন্তু এবং একটি ছাড়া প্রায় সমস্ত চাষযোগ্য খাদ্যশস্য ছিল; কিন্তু পশ্চিম গোলার্ধে বা আমেরিকায় ছিল একটিমাত্র পালনযোগ্য স্তন্যপায়ী জন্তু –ল্লামা–এবং তাও কেবল দক্ষিণের একটি অংশে, এবং চাষের উপযোগী একটিমাত্র খাদ্যশস্য – সমস্ত খাদ্যশস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ– ভুট্টা পাওয়া যেত। প্রাকৃতিক অবস্থার এই বিভিন্নতার ফলে এখন থেকে প্রতিটি গোলার্ধের জনগণ নিজের নিজের বিশিষ্ট পথে এগুতে লাগল এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সীমান্ত চিহ্নগুলি উভয়ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়েছে।

২। মধ্যবর্তী স্তর। পূর্ব মহাদেশে পশুপালনের সঙ্গেই এই স্তরের সূচনা হয়; পশ্চিমে সেচের সাহায্যে খাদ্য চাষ করে এবং গৃহনির্মাণের জন্য আডব (রৌদ্রে শুকানো মাটির ইট) এবং পাথর ব্যবহারের সঙ্গে এই স্তর আরম্ভ হয়েছে।

আমরা প্রথমে পশ্চিম অঞ্চল নিয়ে আলোচনা শুরু করব কারণ ইউরোপীয়দের কর্তৃক বিজিত হবার আগে পর্যন্ত এখানে কোথাও এই মধ্যবর্তী স্তর অতিক্রান্ত হয় নি।

বর্বরতার নিম্নতন স্তরে অবস্থিত ইন্ডিয়ানদের যখন সন্ধান মেলে (মিসিসিপির পূর্ব দিকে যারা বাস করত তারা সবই এই স্তরের লোক) তখন তারা কতকাংশে ভুট্টার ঘরোয়া চাষ করত এবং হয়তো কিছু কিছু লাউ, ফুটি প্রভৃতি অন্যান্য সব্জী চাষও করত এবং এর থেকেই তাদের খাদ্যের একটা মোটা অংশ আসত। তারা কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা গ্রামে কাঠের তৈরি বাড়িতে বাস করত। উত্তর পশ্চিমের জাতিগুলি বিশেষত যারা কলম্বিয়া নদীর এলাকায় বসবাস করত, তারা তখনও বন্যাবস্থার উচ্চতন স্তরে ছিল এবং মৃৎশিল্প ব্যবহার অথবা চাষবাস সম্পর্কে কিছুই জানত না। অপরদিকে নিউ মেক্সিকোর পুয়েব্লো[১২] ইন্ডিয়ানরা, মেক্সিকানরা, মধ্য আমেরিকার বাসিন্দারা এবং পেরুর অধিবাসীরা বিজিত হবার সময় বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তরে ছিল। তারা পাথর অথবা আডব দিয়ে তৈরি দুর্গের মতো বাড়িতে বসবাস করত; তারা জলবায়ু ও আঞ্চলিক অবস্থা বিচার করে কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থায় বাগানে ভুট্টা ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের চাষ করত– এইটাই ছিল তাদের খাদ্যসংগ্রহের প্রধান উপায়, এবং তারা কয়েকটি পশুপাখিও পুষত, যেমন মেক্সিকানরা টার্কি ও অন্যান্য পাখি এবং পেরুর অধিবাসীরা ল্লামা পুষত। তাছাড়া, তারা ধাতুর ব্যবহারও জানত, অবশ্য লোহা ছাড়া, সেজন্য তারা এখনও পাথরের হাতিয়ার ও পাথরের অস্ত্রের ব্যবহার কাটিয়ে উঠতে পারেনি। স্পেন কর্তৃক বিজিত হবার পর এদের স্বাধীন বিকাশ একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল।

---

১২. পুয়েব্লো – উত্তর আমেরিকার এক ইন্ডিয়ান উপজাতি গোষ্ঠীর নাম: বসবাস করত নিউ মেক্সিকো'র এলাকায় (বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম ও মেক্সিকোর উত্তরাংশ) এবং একই ইতিহাস ও সংস্কৃতির বন্ধনে মিলিত ছিল। তাদের গ্রামগুলির বিশেষ চরিত্র দেখে, স্পেনীয় শব্দ Pueblo (জন, বসত, গোষ্ঠী) থেকে আসা এই নামটা তাদের দেয় বিজয় স্পেনীয়রা। এইসব গ্রামগুলি ছিল পাঁচ ছয় তলার বড়ো বড়ো সাধারণ গৃহকেল্লার মতো, তাতে বাস করত হাজার খানেক লোক; এইসব উপজাতিদের বসত সম্বন্ধেও কথাটা প্রযুক্ত হতো।–সম্পাঃ

পূর্ব গোলার্ধে দুধ ও মাংসদায়ী পশুপালনের সঙ্গেই বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তর শুরু হয় এবং এই পর্বের অনেক কাল পর্যন্ত চাষবাস অজ্ঞাত ছিল বলে মনে হয়। গবাদি পশুর পালন ও প্রজনন এবং বড় বড় পশুযূথের সৃষ্টি, এইটাই মনে হয় বাকি বর্বর জাতিগুলি থেকে আর্য ও সেমিট্রিক জাতিগুলির পার্থক্যের কারণ। ইউরোপ ও এশিয়ার আর্যদের মধ্যে গবাদি-পশুর নাম এখনো একইরকমের, কিন্তু আবাদযোগ্য উদ্ভিদের নাম প্রায় মেলে না।

উপযুক্তস্থানে পশুযূথের সৃষ্টি থেকে এল রাখালিয়া জীবনধারা, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর ধারে ঘাসে ভরা সমতলভূমিতে সেমিটিক জাতিগুলির মধ্যে এবং ভারতের, অক্সাস ও জাক্সার্তেসের[১৩] এবং দন ও নীপারের তৃণভূমিতে আর্য জাতিগুলির মধ্যে। এইরকম পশুচারণ ক্ষেত্রের সীমান্তে কোথাও সম্ভবত আগেই বন্য পশুকে পোষ মানানো হয়েছিল। এইজন্যই উত্তরপুরুষদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, পশুপালক জাতিগুলির উৎপত্তি এমন সব অঞ্চলেই হয়েছে, যা মানবজাতির উৎপত্তি দূরের কথা, পরন্তু তাদের বন্যযুগের পূর্বপুরুষদের পক্ষে, এমনকি বর্বরতার নিম্নতন স্তরের লোকেদের পক্ষেও বসবাসের প্রায় অযোগ্য। অপরপক্ষে মধ্যবর্তী স্তরের বর্বর জাতিগুলি একবার পশুপালকের জীবনযাত্রা গ্রহণের পর আর কখনোই স্বেচ্ছায় এইসব ঘাসে ভরা জলধৌত সমতলভূমি ছেড়ে পূর্বপুরুষদের বাসভূমি বনাঞ্চলে ফিরে যাবার কথা ভাববে না। এমনকি যখন আর্য ও সেমিটিক জাতিগুলি উত্তর ও পশ্চিমে যেতে বাধ্য হয় তখনও তারা পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের বনাঞ্চালে ততদিন পর্যন্ত বসবাস করতেই পারেনি যতদিন পর্যন্ত খাদ্যশস্যের চাষাবাদ করে অপেক্ষাকৃত কম অনুকূল এই অঞ্চলেও তারা পশুদের খাদ্য যোগাতে পেরেছে এবং বিশেষ করে শীতকালও কাটাতে সমর্থ হয়েছে। এইকথা খুবই সম্ভবপর যে, প্রধানত গবাদিপশুর খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবার জন্য খাদ্যশস্যের চাষাবাদ শুরু হয় এবং পরবর্তীকালেই ঐগুলি মানুষের পুষ্টির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আর্য ও সেমিটিক জাতিগুলির খাদ্যের তালিকায় মাংস ও দুধের প্রাচুর্য এবং বিশেষত শিশুদের গঠনে এইসব খাদ্যের উপকারিতা দিয়েই এই দুটি জাতির উন্নত বিকাশের ব্যাখ্যা করা যায়। বস্তুত, নিউ মেক্সিকোর পুয়েব্লো ইন্ডিয়ানরা, যাদের প্রায় নিছক নিরামিষভোজী হতে হয়েছিল, তাদের মস্তিষ্ক বর্বরতার নিম্নতন স্তরে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত মাংস ও মৎস্যভোজী ইন্ডিয়ানদের থেকে ছোট ছিল। যাইহোক এই স্তরে নরমাংসভোজন আস্তে আস্তে উঠে যেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মাত্র ধর্মীয় আচার হিসেরব অথবা এক্ষেত্রে যা একই, যাদুবিদ্যার অঙ্গ হিসেবে এটি টিকে থাকে।

৩। **উচ্চতন স্তর**। লৌহআকরিক গলিয়ে লোহা তৈরি থেকে এর সূচনা হয় এবং সভ্যতার যুগে উৎক্রান্ত হয় বর্ণমালা লিপির আবিষ্কার এবং লিখিত বিবরণের জন্য তা ব্যবহারের মারফত। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, এই স্তর শুধুমাত্র পূর্ব গোলার্ধের জাতিগুলি স্বাধীনভাবে অতিক্রম করে সে স্তরে উৎপাদনে যে প্রগতি হয় তা আগের সব স্তরগুলি একত্র করেও ছাড়িয়ে যায়। এই স্তরের মধ্যে পড়ে বীর (হিরোয়িক) যুগের গ্রীকরা, রোম প্রতিষ্ঠার ঠিক আগে ইতালির উপজাতিগুলি, ট্যাসিটাসের সময়ের জার্মানরা

১৩. অক্সাস–বর্তমান আমু-দরিয়া, জাক্সার্তেস–বর্তমান শির-দরিয়া।–সম্পাঃ

এবং ভাইকিংদের সময়ের নর্মানগণ।

সর্বোপরি এইসময়েই সর্বপ্রথম আমরা গবাদিপশু চালিত লোহার ফলাওয়ালা লাঙ্গল দেখতে পাই যাতে ব্যাপকভাবে ভূমিচাষ বা কর্ষণ সম্ভবপর করে এবং তখনকার অবস্থায় জীবনোপকরণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় কার্যত অফুরন্ত করে; এইসঙ্গেই আমরা দেখতে পাই যে, বনজঙ্গল সাফ করে কৃষি ও গোচারণের জমিতে পরিণত করা হচ্ছে এবং এই কাজও লোহার কুঠার ও কোদাল না হলে ব্যাপকভাবে করা অসম্ভব হতো। কিন্তু এইসবের সঙ্গেই জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং ছোট ছোট এলাকায় ঘনবসতি দেখা দেয়। ভূমিকর্ষণের আগে নিতান্ত ব্যতিক্রম হিসাবেই কেবল লাখ পাঁচেক লোক একটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব একত্র হতে পেরেছে, খুব সম্ভব কখনই এ ব্যাপার ঘটেনি।

হোমারের কাব্যে, বিশেষ করে 'ইলিয়ড্' এ আমরা বর্বরতার উচ্চতন স্তরের শীর্ষাবস্থা দেখতে পাই। উন্নত লোহার যন্ত্রপাতি, হাপর, যাঁতা, কুমারের চাক, তেল ও মদের নিষ্কাশন, বিকশিত ধাতুর কাজের শিল্পকলায় পরিণতি, মালের গাড়ি ও যুদ্ধের রথ, তক্তা ও কড়ির সাহায্যে জাহাজ নির্মাণ, শিল্প হিসাবে স্থাপত্যের সূচনা, মিনার ও দেওয়াল সমন্বিত প্রাচীরবেষ্টিত নগর, হোমারের মহাকাব্য এবং সমগ্র পুরাণ–বর্বরতা থেকে সভ্যতায় পৌঁছাবার সময় গ্রীকরা এইসব মূল উত্তরাধিকার পেয়েছিল। যদি আমরা এর সঙ্গে সিজার বর্ণিত, এমনকি ট্যাসিটাস বর্ণিত জার্মানদের[১৪] তুলনা করি যারা তখন সংস্কৃতির সেই স্তরের চৌকাটে পা বাড়িয়েছে যে স্তর থেকে হোমারের যুগের গ্রীকরা উচ্চতন স্তরে উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছিল, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, বর্বরতার উচ্চতন স্তরে উৎপাদনের বিকাশ তত সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল।

বন্যাবস্থা ও বর্বরতার মধ্যে দিয়ে সভ্যতার সূচনা পর্যন্ত মানবসমাজের বিবর্তনের এই যে ছবিটি মর্গানের রচনা থেকে এখানে দিয়েছি তা ইতিমধ্যেই বহু নতুন বৈশিষ্ট্য এবং আরো বড়ো কথা তর্কাতীত বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধি, তর্কাতীত এজন্য যে, এগুলি সরাসরি উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে আহরণ করা হয়েছে। তবু আমাদের যাত্রা শেষে যে পূর্ণ ছবিটি প্রকাশ পাবে তার তুলনায় এ ছবিটি অস্পষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর মনে হবে। তখনই কেবল বর্বরতা থেকে সভ্যতায় উৎক্রমণের পূর্ণ আলেখ্য দেওয়া সম্ভব হবে এবং এ দুটির মধ্যে জাজ্বল্যমান পার্থক্য ফুটে উঠবে। আপাতত আমরা মর্গানের পর্ববিভাগকে সাধারণভাবে এরূপে ব্যক্ত করতে পারি: বন্যাবস্থা– এ পর্বে অবিলম্বেই ব্যবহার্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলির আহরণই প্রাধান্য ছিল, মানুষের তৈরি জিনিস বলতে মূলতঃ ছিল সে আহরণের সাহায্য করার মতো হাতিয়ার। বর্বরতা– এ পর্বে গোপালন ও কৃষির প্রচলন হয় এবং মানুষের ক্রিয়া দ্বারা প্রকৃতির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার পদ্ধতিগুলি আয়ত্তে আসে। সভ্যতা– এই পর্বে প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে আরো উন্নততর প্রক্রিয়া এবং যথার্থ শ্রমশিল্প ও কলার জ্ঞান অর্জিত হয়েছে।

১৪. এঙ্গেলস এখানে গাই জুলিয়াস সিজারের 'গল যুদ্ধের বিবরণ' এবং পুবলিয়স কর্নেলিয়স ট্যাসিটাসের 'জার্মানিয়া' নামক রচনার কথা বলছেন– সম্পাঃ

GRONTHO.COM

২
পরিবার

মর্গান তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় ইরকোয়াসদের মধ্যে কাটিয়েছেন যারা আজ পর্যন্ত নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রে বসবাস করে এবং তাদের একটি উপজাতি (সেনেকা) তাঁকে স্বজাতিভুক্ত করে নেয়। তিনি এদের মধ্যে এমন একটি আত্মীয়তাবিধি দেখলেন যেটি এদের বাস্তব পারিবারিক সম্পর্কের বিরোধী। এদের মধ্যে নিয়ম হিসেবে প্রচলিত ছিল এক জোড়ার মধ্যে বিবাহ, উভয় দিক থেকেই বিবাহবিচ্ছেদও খুব সহজ ছিল এবং এই প্রথাকে মর্গান নাম দিয়েছিলেন 'জোড়বাঁধা পরিবার'। এই বিবাহিত দম্পতির সন্তানকে সকলেই জানত ও মানত এবং পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী কে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এইসব কথাগুলি বিপরীত অর্থে ব্যবহার হতো। ইরকোয়াস শুধু নিজের সন্তানদেরই পুত্র কন্যা বলে সম্ভাষণ করত না। উপরন্তু ভাইয়েদের সন্তানদেরও তাই বলত এবং শেষোক্তরা তাকে পিতা সম্ভাষণ করত এবং তারাও তাকে মা বলত। অথচ সে তার ভাইয়েদের সন্তানদের ভাইপো-ভাইঝি বলত অপরপক্ষে সে তার বোনের সন্তানদের ভাগনে-ভাগনী ডাকত এবং তারা তাকে মামা বলত। বিপরীতভাবে ইরকোয়াস নারীরা নিজের সন্তান ছাড়াও বোনেদের সন্তানদেরও পুত্র, কন্যা বলে সম্ভাষণ করত এবং তারাও তাকে মা বলত। অথচ সে তার ভাইয়েদের সন্তানদের ভাইপো ভাইঝি বলত এবং তারা তাকে পিসী বলে ডাকত। একইভাবে ভাইয়েদের সন্তানেরা পরস্পরকে ভাইবোন সম্ভাষণ করত। বোনেদের সন্তানেরাও পরস্পরকে ভাইবোন বলত। উল্টোদিকে একজন স্ত্রীলোকের সন্তান এবং তার ভাইয়ের সন্তানেরা পরস্পরকে মামাতো পিসতুতো ভাইবোন (cousin) বলে ডাকত। এবং এগুলি শুধুমাত্র ফাঁকা কথা ছিল না; পরন্তু এগুলি রক্ত সম্পর্কের সন্নিকটতা ও সমান্তরতা, সমতা ও অসমতা সম্বন্ধে বাস্তবক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণারই অভিব্যক্তি; এবং এই ধারণাগুলিই ছিল আত্মীয়তার একটা পূর্ণ বিকশিত বিধির ভিত্তি যার মধ্যে দিয়ে একটি ব্যক্তির একশ' রকমের পৃথক সম্পর্ক প্রকাশ করা সম্ভব হতো। অধিকন্তু এই প্রথা আমেরিকার সমস্ত ইন্ডিয়ানদের মধ্যে পুরাদমে বলবৎ (এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যতিক্রম আবিষ্কৃত হয়নি) শুধু তাই নয়, এমনকি ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় উপজাতিগুলি এবং হিন্দুস্থানের গৌরা উপজাতিগুলির মধ্যে এই রীতির প্রায় অবিকৃত প্রচলন রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের তামিলদের মধ্যে এবং নিউইয়র্ক

রাষ্ট্রের সেনেকা ইরকোয়াসদের মধ্যে দুই শতাধিক বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচলিত আত্মীয়তার অভিব্যক্তিগুলি আজো পর্যন্ত অভিন্ন। এবং যেমন আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে তেমনি ভারতের এই উপজাতিগুলির মধ্যেও পরিবারের প্রচলিত রূপ থেকে উদ্ভূত সম্পর্কগুলি আত্মীয়তাবিধির বিরোধী।

এর ব্যাখ্যা কী? বন্যাবস্থা ও বর্বরতার যুগে সমস্ত জাতির সমাজ-বিধিতে আত্মীয়তার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তা খেয়াল রাখলে এইরকম একটি ব্যাপক প্রচলিত ব্যবস্থার তাৎপর্য শুধু কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমন একটি প্রথা যা আমেরিকার সর্বত্র সাধারণভাবে প্রচলিত, যা এশিয়ার সম্পূর্ণ বিভিন্ন জনধারার (race) জাতিগুলির মধ্যে একইভাবে প্রচলিত এবং রূপের কিছু রদবদল করে যে প্রথাটি আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সর্বত্র প্রচলিত তার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিতে হবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ম্যাক-লেনান যেভাবে চেষ্টা করেছিলেন সেভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পিতা, পুত্র, ভাই ও বোন এগুলি মাত্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপক উপাধি নয়, পরন্তু এগুলির সঙ্গে একেবারে নির্দিষ্ট এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পারস্পরিক দায়দায়িত্ব জড়িয়ে আছে, যে দায়দায়িত্বগুলি সমগ্রভাবে এইসব জাতিগুলির সমাজ-পদ্ধতির একটা মূল অঙ্গ। আর সে ব্যাখ্যাও পাওয়া গেল। স্যান্ডউইচ্ (হাওয়াই) দ্বীপপুঞ্জে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধেও পরিবারের এমন একটি রূপ ছিল যাতে আমেরিকা ও প্রাচীন ভারতীয় আত্মীয়তাবিধি অনুযায়ী যা হওয়া উচিত ঠিক তেমনই ধরনের পিতা ও মাতা, ভাই ও বোন, পুত্র ও কন্যা, মামা ও পিসী, ভাগনে ও ভাগনী পাওয়া যেত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, তখনকার দিনে হাওয়াইয়ে প্রচলিত আত্মীয়তাবিধির সঙ্গে আবার আসলে বর্তমান পরিবারের বিরোধিতা ছিল। সেখানে ভাইবোনদের সমস্ত সন্তানদের বিনা ব্যতিক্রমে ভাই এবং বোন মনে করা হতো এবং শুধুমাত্র মা ও মায়ের বোনেদের নয় অথবা শুধুমাত্র বাপ ও বাপের ভাইয়েদের নয়, পরন্তু বিনা ব্যতিক্রমে বাপমায়ের সমস্ত ভাইবোনদেরই সাধারণ সন্তান বলে তাদের গণ্য করা হতো। অতএব আমেরিকার আত্মীয়তাবিধি থেকে যদি পরিবারের আরও আদি এমন একটা রূপের পূর্বানুমান করতে হয় যা খাস আমেরিকাতে আর নেই, কিন্তু এখনও পর্যন্ত যা হাওয়াইয়ে দেখা যায়, তাহলে অপরদিকে হাওয়াইয়ের আত্মীয়তাবিধি আরও আদিম এমন একটি পারিবারিক রূপের সন্ধান দেয় যা অদ্যাপি কোথাও প্রচলিত থাকা সম্ভবপর না হলেও একদিন নিশ্চয়ই ছিল, কারণ তাছাড়া তার উপযোগী আত্মীয়তাবিধি জন্মাতে পারত না। মর্গান লিখেছেন, 'পরিবার হলো একটি সক্রিয় ব্যাপার। এটি কখনও অচল নয়, সমাজ যেমন নিম্নতর থেকে উচ্চতর অবস্থায় যায় তেমনই পরিবারও নিম্নতর থেকে উচ্চতর রূপে পৌঁছায়। অপরদিকে আত্মীয়তাবিধি হচ্ছে নিষ্ক্রিয়, পরিবারের অগ্রগতি তাতে লিপিবদ্ধ হয়। বহুদীর্ঘ ব্যবধান পরপর এবং তার আমূল পরিবর্তন ঘটে শুধুমাত্র পরিবারের আমূল পরিবর্তন হবার পরে।' মার্কস এর সঙ্গে যোগ করেছেন, 'এই একই কথা রাজনীতি, আইন, ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক পদ্ধতির সম্পর্কেও সাধারণভাবে প্রযোজ্য।' পরিবার যখন সজীব হয়ে চলছে আত্মীয়তাবিধি কিন্তু তখন

শিলীভূত হয়ে পড়ছে এবং যখন আত্মীয়তাবিধি অভ্যস্ত রূপে রয়ে যাচ্ছে তখন পরিবার তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ক্যুভিয়ে যেমন প্যারিসের কাছে একটি জন্তুর কঙ্কালের কিছু হাড় থেকে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পেরেছেন যে, এটি একটি ক্যাঙ্গারু জাতীয় জন্তুর অস্থি এবং অধুনা বিলুপ্ত হলেও একদিন ওখানে এরা বসবাস করত, তেমনই ঐতিহাসিকভাবে পরিবাহিত একটি আত্মীয়তাবিধি থেকে ততখানি নিশ্চয়তার সঙ্গেই আমরা বলতে পারি যে, সেই বিধির উপযোগী একটি বিলুপ্ত পরিবার রূপ কোনো এক সময়ে বর্তমান ছিল।

উল্লেখিত আত্মীয়তাবিধি এবং পারিবারিক রূপগুলি বর্তমানে প্রচলিত অবস্থা থেকে এইদিক দিয়ে পৃথক যে, তখন প্রতি শিশুর কয়েকটি পিতা ও মাতা ছিল। আমেরিকায় প্রচলিত আত্মীয়তাবিধির সঙ্গে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পারিবারিক রূপ খাপ খায় তাতে ভ্রাতা ও ভগিনী একই শিশুর পিতা ও মাতা হতে পারে না, অপরপক্ষে হাওয়াইয়ের আত্মীয়তাবিধি এমন একটি পারিবারিক রূপের কথা বলে যাতে এইটাই ছিল নিয়ম। এইভাবে আমরা এমন একসারি পারিবারিক রূপের সম্মুখীন হই যাতে আমাদের মধ্যে এতদিন যে রূপগুলিকে একমাত্র প্রচলিত রূপ বলে মেনে নেওয়া হতো তার খন্ডন হয়। প্রচলিত ধারণা কেবল একপতিপত্নী সম্পর্কই জানে, তার সঙ্গে কিছু কিছু পুরুষের বহুপত্নীত্ব এবং হয়তো বা কিছু কিছু স্ত্রীলোকের বহুস্বামীত্বও মেনে নেওয়া হয় এবং নীতিবাগীশ কূপমণ্ডুকেরা যা করেন সেভাবে চেপে যাওয়া হয় যে, কার্যত আনুষ্ঠানিক সমাজের এই সীমাগুলি চুপি চুপি হলেও অসংকোচে লঙ্ঘন করা হয়। অপরপক্ষে আদিম ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন পরিস্থিতির দেখা পাই যেখানে পুরুষের বহুপত্নীত্ব এবং সেই সঙ্গে তাঁদের স্ত্রীদের বহুস্বামিত্ব রয়েছে এবং তাঁদের সাধারণ সন্তানসন্ততিরা সেজন্য সকলেরই সন্তানসন্ততি বলে পরিগণিত হচ্ছে; এই অবস্থারও আবার ধারাবাহিক রূপান্তর ঘটতে ঘটতে পরিণামে একপতিপত্নী সম্পর্কে এসে পৌঁছায়। এই পরিবর্তনগুলির চরিত্র এরূপ যে, সমষ্টি-বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ জনসমষ্টি প্রথমে ব্যাপক থাকলেও ক্রমশ তাদের সংখ্যা কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত একটি যুগলে এসে দাঁড়ায়, যা বর্তমানের প্রধান রূপ।

এইভাবে পশ্চাৎপ্রেক্ষিতে পরিবারের ইতিহাস সংরচন করতে গিয়ে মর্গান তাঁর অধিকাংশ সহযোগীদের সঙ্গে একমত হয়ে এমন একটি আদিম অবস্থায় উপনীত হন যখন একটি উপজাতির মধ্যে নির্বিচার যৌন সম্পর্কের প্রাধান্য ছিল, ফলে প্রত্যেকটি স্ত্রীলোক সমানভাবে প্রত্যেকটি পুরুষের এবং তেমনই প্রত্যেকটি পুরুষ প্রত্যেকটি স্ত্রীলোকের পতিপত্নী ছিল। এরূপ একটি আদিম অবস্থার কথা অবশ্য গত কয়েক শতক থেকেই উঠেছে, কিন্তু অত্যন্ত সাধারণভাবে; বাখোফেনই হচ্ছেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি এই অবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কিংবদন্তির মধ্যে এর চিহ্ন খোঁজেন এবং এইটিই তাঁর অন্যতম মহৎ অবদান। বর্তমানে আমরা জেনেছি, তিনি যে চিহ্নগুলি আবিষ্কার করেন তাতে নির্বিচার যৌন সম্পর্কের একটা সামাজিক

অবস্থা পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় আরও পরবর্তী একটি রূপ, সমষ্টি-বিবাহ। সেই আদিম সামাজিক অবস্থা যদি সত্যই থেকেও থাকে তাহলেও তা হচ্ছে এত সুদূর অতীতের ব্যাপার যে বর্তমানে জীবিত অনুন্নত বন্যদের মধ্যে কোনো শিলীভূত সমাজে তার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আশা করা যায় না। বাখোফেনের কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তিনি এই প্রশ্নটিকে গবেষণার পুরোভাগে এনেছিলেন।[১৫]

মনুষ্যজাতির যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এরূপ একটি প্রাথমিক অবস্থার অস্তিত্ব অস্বীকার করাই সম্প্রতি রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মনুষ্যজাতিকে এই 'লজ্জা' থেকে বাঁচান। প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবের কথা ছাড়াও বিশেষ করে বাকি জীবজগতের উল্লেখ করা হয়; সেখান থেকে লেতুর্নো ('বিবাহ ও পরিবারের বিবর্তন', ১৮৮৮ খ্রিঃ[১৬]) অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করে দেখিয়ে দেন যে, এক্ষেত্রেও নিম্নতন স্তরে একেবারে নির্বিচার যৌন সম্পর্ক বর্তমান। এইসব তথ্যগুলি থেকে আমি কিন্তু একমাত্র এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, এগুলি মানুষ এবং তার আদিম জীবনাবস্থার দিক থেকে কিছুই প্রমাণ করে না। মেরুদন্ডবিশিষ্ট জীবজন্তুর মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী সঙ্গমপর্বের যথেষ্টই ব্যাখ্যা করা যায় শারীরবৃত্তিক কারণ দিয়ে; যেমন পাখিদের ক্ষেত্রে, ডিম ফোটাবার সময় মাদিটার সাহায্যের প্রয়োজন; পাখিদের মধ্যে বিশ্বস্ত একপতিপত্নী সম্পর্কের দৃষ্টান্ত মানুষ সম্পর্কে কোনো কিছুই প্রমাণ করে না, কারণ মানুষ পাখি থেকে জন্মায়নি। আর যদি কঠোর একপতিপত্নী বিধিই সর্বপ্রধান পুণ্য বলে মনে করা হয় তাহলে টেপওয়ার্মকেই শ্রেষ্ঠ মানতে হয়, কারণ তার পঞ্চাশ থেকে দু'শ খন্ডে বিভক্ত শরীরের প্রত্যেকটি খণ্ডে একজোড়া পুরুষ ও স্ত্রী যৌন অঙ্গ আছে এবং সারাজীবন ধরে এই কৃমিকীট শরীরের প্রত্যেকটি খন্ডে আত্মসঙ্গম করে কাটায়। যদি অবশ্য আমরা শুধুমাত্র স্তন্যপায়ী জীবের কথা ধরি তাহলে আমরা তাদের মধ্যে যৌন জীবনের সব রূপই দেখতে পাই– নির্বিচার যৌন সম্পর্ক, সমষ্টি-বিবাহের মতো কিছু বহুপত্নীত্ব এবং একপতিপত্নী সম্পর্ক। কেবলমাত্র বহুস্বামীপ্রথা পাওয়া যায় না। এটি শুধুমাত্র মানুষেরই পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এমনকি আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী আত্মীয় কোয়াড্রমানাদের মধ্যেও মাদীমর্দার জোট বন্ধনে যথাসম্ভব বৈচিত্র্যের প্রকাশ দেখা যায়; এবং যদি আমরা আমাদের গন্ডি আরও সংকীর্ণ করে শুধুমাত্র চারটে এনথ্রপয়েড বানরজাতির কথা ধরি তাহলে লেতুর্নো তাদের সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলছেন যে, তারা কখনো একপতিপত্নিক এবং কখনো বহুপত্নিক, কিন্তু জিরোতেলোঁ সস্যুরের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে তিনি জোর করে বলছেন যে, এরা একপতিপত্নিক। ভেস্তেমার্ক তাঁর রচিত 'মানুষের বিবাহের ইতিহাস'এ

১৫. বাখোফেন যেটা আবিষ্কার অথবা বলা ভালো অনুমান করলেন সেটাকে তিনি কত অল্প হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন তার প্রমাণ হয় এই আদি অবস্থাটাকে হেটায়ারিজম বলে তাঁর বর্ণনায়। কথাটা গ্রীকেরা যখন চালু করে দেয় তখন এতে করে বোঝান হতো অবিবাহিত পুরুষ অথবা একবিবাহে আবদ্ধ পুরুষের সঙ্গে অবিবাহিত নারীদের যৌন সঙ্গম। এতে সর্বক্ষেত্রেই একটা নির্দিষ্ট ধরনের বিবাহের অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হতো যার বাইরে এ সঙ্গম ঘটছে এবং গণিকাবৃত্তি তার অন্তর্গত, অন্তত ইতিমধ্যেই উদ্ভূত একটা সম্ভাবনা রূপে। কথাটা আর কোনো অর্থে কখনো ব্যবহৃত হয়নি এবং মর্গানের সঙ্গে আমিও তা এই অর্থেই ব্যবহার করছি। বাখোফেনের অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলি সর্বত্রই অসম্ভব রহস্যাচ্ছন্ন হয়েছে তাঁর এই অপ্রাকৃত বিশ্বাসে যে, ঐতিহাসিকভাবে উদ্ভূত নরনারী সম্পর্কগুলি উঠেছে তাদের জীবনের বাস্তব অবস্থা থেকে নয়, সেই পর্বের মানুষের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা থেকে। (এঙ্গেলসের টীকা)।

১৬. *Ch.Letourneau, L'evolution du mariage et de la famille, Paris. 1888* –সম্পাঃ

(লন্ডন ১৮৯১)[১৭] এনথ্রপয়েড বানরদের মধ্যে একপতিপত্নী সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্প্রতি যেসব কথা বলেছেন তাতেও বিশেষ কিছু প্রমাণ হয় না। বস্তুত, এইসব তথ্যের প্রকৃতি দেখে সৎ লেতুর্নো স্বীকার করছেন : 'স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে মানসিক উন্নতির স্তরের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের রূপের আদৌ কোন নির্দিষ্ট সম্বন্ধ দেখা যায় না।' এবং এস্পিনাস ('প্রাণী সমাজ', ১৮৭৭)[১৮] খোলাখুলি বলছেন, 'পশুদের সর্বোচ্চ যে সামাজিক সংগঠন দেখা যায় সেটা যূথ। এই যূথ বহু পরিবার নিয়ে গঠিত মনে হয়, কিন্তু গোড়া থেকেই পরিবার ও যূথ পরস্পর বিরোধী এবং তাদের বিকাশ ঘটে পরস্পর বিপরীত অনুপাতে।'

উপরের পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায় যে, এনথ্রপয়েড বানরদের পরিবার ও অন্যান্য সামাজিক জোট সম্পর্কে আমরা সুনির্ধারিত কিছুই জানি না। বহু বিবরণ পরস্পর বিরোধী। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এমনকি বন্য মানব উপজাতিগুলি সম্পর্কেও আমাদের হাতের বিভিন্ন বিবরণগুলি কত পরস্পর বিরোধী এবং কত সমালোচনামূলক বিচার ও ঝাড়াই-বাছাই তাদের প্রয়োজন! আর মানুষের সমাজ থেকে বানরের সমাজ পর্যবেক্ষণ করা তো অনেক বেশি শক্ত। সেইজন্য এই ধরনের সম্পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য বিবরণ থেকে কোনো সিদ্ধান্তই আমাদের করা চলবে না।

কিন্তু এস্পিনাসের যে অনুচ্ছেদটি উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে তার থেকে একটি বেশি নির্ভরযোগ্য ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উচ্চতর পশুদের মধ্যে যূথ ও পরিবার পরিপূরক নয়, পরন্তু তারা পরস্পর বিরোধী। এস্পিনাস চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন কেমন করে সঙ্গম ঋতুর সময়ে মর্দাদের মধ্যে ঈর্ষার ফলে প্রত্যেকটি পশুযূথের বাঁধন আল্‌গা হয়ে যায় অথবা সাময়িকভাবে ভেঙ্গে যায় 'যেখানে পরিবার খুব দৃঢ়সংবদ্ধ সেখানে যূথ বিরল ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়ায় অপরপক্ষে যেখানে অবাধ যৌন সম্পর্ক অথবা বহুবিবাহই রীতি, সেখানে প্রায় স্বাভাবিকভাবেই যূথ গড়ে ওঠে ....যূথ গঠনের জন্য পারিবারিক বন্ধনকে শিথিল হতে হয় এবং ব্যক্তিকে আবার মুক্ত হতে হয়। এইজন্যই পাখিদের মধ্যে সংঘবদ্ধ ঝাঁক দেখা যায় অত কদাচিৎ... অপরপক্ষে স্তন্যপায়ী পশুদের মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে সংঘবদ্ধ সমাজ দেখা যায়। নিছক এইজন্য যে, ব্যক্তি সেখানে পরিবারবদ্ধ নয়.....এইভাবে সূচনায় যূথের সামগ্রিক চেতনার সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে পরিবারের সামগ্রিক চেতনা। দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়: পরিবারের চেয়ে কোন উচ্চতর সমাজরূপ যদি উদ্ভূত হয়ে থাকে তবে তা, সম্ভবপর হয় শুধু এইজন্যই যে, সে সমাজরূপ মৌলিকভাবে পরিবর্তিত পরিবারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়; এতে করে এমন সম্ভাবনাও বাতিল হয় না যে, ঠিক সেই কারণেই পরবর্তী সময়ে এই পরিবারগুলি অনেক বেশি অনুকূল অবস্থার মধ্যে নিজেদের পুনর্গঠিত করে নিতে পেরেছিল' (এস্পিনাস, প্রথম পরিচ্ছেদ, জিরো-তেলোঁ কর্তৃক 'বিবাহ ও পরিবারের উৎপত্তি' নামক পুস্তকে উদ্ধৃত, ১৮৮৪[১৯], ৫১৮-৫২০ পৃঃ)।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, মানবসমাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানার

১৭. *E.A. Westermarch, The History of Human Marriage, London, 1891.* -সম্পাঃ

১৮. *A. Espinas, Des societies animals. Etude de psychologie comparee, Paris, 1877.* -সম্পাঃ

১৯. *A. Giraud-Teulon, Les origines du mariage et de la famille, Geneve, 1884.* -সম্পাঃ

ব্যাপারে পশু-সমাজগুলির অবশ্যই কিছুটা মূল্য আছে, কিন্তু কেবলমাত্র নেতিবাচক দিক দিয়ে। যতদূর জানা গেছে, উচ্চতর মেরুদন্ডী পশুদের মধ্যে কেবলমাত্র দুধরনের পরিবার দেখা গিয়েছে: বহুপত্নীত্ব অথবা একক জোড়ের পরিবার। উভয়ক্ষেত্রেই একজন মাত্র পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, একটি মাত্র স্বামীর স্থান আছে। মর্দার ঈর্ষা দিয়েই পশু পরিবারের বন্ধন ও সীমানা, তাতে পশু পরিবার ও যূথের মধ্যে বিরোধিতা জাগে। উচ্চতর সামাজিক রূপ অর্থাৎ পশু-যূথ কোথাও অসম্ভব হয়, কোথাও শিথিল হয়ে পড়ে বা যৌন সঙ্গমের ঋতুতে একেবারেই ভেঙে যায়; অন্তত যূথের ক্রমাগত বিকাশ মর্দার ঈর্ষার জন্য বাধা পায়। কেবল এতে বেশ প্রমাণিত হয় যে, পশুপরিবার এবং আদিম মানব সমাজ এ দুই ভিন্ন ব্যাপার। পশুস্তর থেকে বেরিয়ে আসা আদিম মানুষের কোনো পরিবারই ছিল না, নয়তো এমন ধরনের কোনো পরিবার তাদের মধ্যে ছিল যা পশুদের মধ্যে দেখা যায় না। মানুষরূপে উদীয়মান যে প্রাণীটি অমন হাতিয়ারহীন সেও যূথবদ্ধতার সর্বোচ্চ রূপ একক জোড় বেঁধে বিচ্ছিন্নভাবে অল্পসংখ্যায় টিকে থাকতে পারে। শিকারীদের বিবরণ থেকে ভেস্তের্মার্ক গরিলা ও শিম্পাঞ্জীদের সম্পর্কে এই কথা বলেছেন। কিন্তু পশুস্তর থেকে উদ্বর্তনের জন্য, প্রকৃতির ক্ষেত্রে যা জানা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় অগ্রগতি সম্পন্ন করার জন্য আর একটি জিনিস দরকার: আত্মরক্ষার দিক দিয়ে ব্যক্তির অপ্রতুল সামর্থ্যের জায়গায় যূথের মিলিত শক্তি ও যৌথ ক্রিয়া। এনথ্রপয়েড বানররা আজ যে অবস্থায় বসবাস করে তা দিয়ে মনুষ্যস্তরে মোটেই ব্যাখ্যা করা যায় না। এই বানরগুলি দেখে বরং এই মনে হয় যে, এরা উপশাখা মাত্র, আস্তে যার লোপ পাবার কথা অন্তত যাদের অবনতি ঘটছে। এদের পারিবারিক রূপের সঙ্গে আদিম মানুষের পারিবারিক রূপের তুলনা বাতিল করার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট। প্রাপ্তবয়স্ক মর্দাদের মধ্যে পরস্পর সহিষ্ণুতা, ঈর্ষা থেকে মুক্তিই হচ্ছে সেইসব বৃহৎ এবং স্থায়ী যূথ গঠনের প্রথম শর্ত, যার মধ্যে দিয়েই কেবল পশুস্তর থেকে মানুষে উৎক্রান্তি সম্ভবপর হয়েছে। বস্তুত, আমরা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, একেবারে আদিতম পরিবারের কোন রূপটি দেখতে পাই, যে বিষয়ে ইতিহাসে অবিসংবাদিত প্রমাণ আছে এবং যা আজও কোনো কোনো জায়গায় লক্ষ্য করা যায়? সমষ্টি-বিবাহ, যে বিবাহে একদল পুরুষ ও আর একদল স্ত্রী যৌথভাবে সকলেরই পতি ও পত্নী এবং যে বিবাহে ঈর্ষার স্থান নেই বললেই চলে। তাছাড়া, বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে আমরা পাই অন্য সমস্ত প্রথা বাদ দিয়ে বহুপতিপ্রথা যাতে ঈর্ষাবোধ আরও বেশি বাতিল হয়ে যায় এবং সেই কারণেই পশুজগতে তা অজ্ঞাত। অবশ্য সমষ্টি-বিবাহের যে রূপগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত তাদের সঙ্গে এমন সব অদ্ভূত জটিল অবস্থা জড়িয়ে আছে যাতে অনিবার্যই পূর্ববর্তী যুগের সহজতর যৌন সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং এইভাবে শেষ বিচারে পশুত্ব থেকে মানবত্বে উৎক্রমণ পর্বের উপযোগী একটা নির্বিচার যৌন সঙ্গম পর্বের নির্দেশ মেলে; তাই যেখান থেকে আমাদের চিরকালের মতো উত্তীর্ণ হয়ে আসার কথা, পশুদের মধ্যে বিবাহরূপের কথা তুলে আমরা ঠিক সেখানেই ফিরে আসছি।

কারণ নির্বিচার যৌন সম্পর্কের অর্থ কী? এর অর্থ যে, বর্তমানের বা অতীতের বিধিনিষেধগুলি তখন ছিল না। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, ঈর্ষার প্রতিবন্ধকতা চলে গিয়েছিল। অন্ততপক্ষে এটুকু নিশ্চয়ই যে, ঈর্ষা অপেক্ষাকৃত পরবর্তী বিকাশের একটি

আবেগ। অগম্যাগমনের ধারণা সম্পর্কেও ঐ একই কথা খাটে। প্রথমে শুধু যে ভাইবোনই স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করত তাই নয়, পরন্তু আজও পর্যন্ত অনেক জাতির মধ্যে মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির যৌন সম্পর্ক প্রচলিত আছে। বানক্রফ্‌ট (উত্তর আমেরিকার প্রশান্তমহাসাগরীয় রাষ্ট্রগুলির আদি উপজাতি', ১৮৭৫, ১ম খন্ড[২০]) বেরিং প্রণালীর কেভিয়েট্‌দের মধ্যে, আলাস্কার নিকটবর্তী কাডিয়াক্‌দের মধ্যে এবং ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকার অভ্যন্তরে টিনেদের মধ্যে এই সম্পর্কের অস্তিত্ব দেখেছেন। লেতুর্নো চিপেওয়া-ইন্ডিয়ান, চিলির কিউকাস, কেরিবিয়ানদের মধ্যে এবং ইন্ডোচীনের কারেনদের মধ্যে এই বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ করেছেন; পার্থীয়, পারসিক, শক, হূণ প্রভৃতিদের সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদের বিবরণ উল্লেখ না করলেও চলে। অগম্য বিভিন্নতর বয়সী লোকদের মধ্যে যে যৌন সম্পর্ক বস্তুতঃ বিশেষ বিভীষিকার উদ্রেক না করেই এমনকি সর্বাধিক কূপমণ্ডূক দেশের মধ্যেই বর্তমানে ঘটে থাকে, অগম্যবিধি উদ্ভাবনের আগে (এটা একটা উদ্ভাবন এবং অতি মূল্যবান উদ্ভাবন) মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততিদের যৌন সম্পর্ক তার চেয়ে বেশি জঘন্য বলে বোধ হওয়ার কথা ছিল না। বস্তুতঃ, ষাট বছরের 'কুমারীও' পয়সা থাকলে কখনো কখনো ত্রিশ বছরের যুবককে বিয়ে করে। যাইহোক যদি আমরা পরিবারের আদিতম রূপের সঙ্গে জড়িত অগম্যাগমনের ধারণাগুলি সরিয়ে নিই– এই ধারণাগুলি আমাদের ধারণা থেকে পৃথক এবং অনেক সময় একেবারে বিপরীত– তাহলে আমরা এমন এক ধরনের যৌন সম্পর্ক পাই যাকে কেবল নির্বিচারই বলা চলে। নির্বিচার এই দিক থেকে যে পরবর্তীকালের প্রথাবদ্ধ নিষেধগুলি তখন ছিল না। এর থেকে অবশ্য এইকথা আসে না যে, রোজই একটা এলোমেলো যৌন সম্পর্ক চলত। সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য আলাদা আলাদা জোড় বাঁধা মোটেই বাতিল হচ্ছে না, বস্তুত সমষ্টি-বিবাহেও এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইটাই দেখা যায়। সাম্প্রতিকতম গবেষক ভেস্তের্মার্ক যিনি এই আদি অবস্থা অস্বীকার করেছেন তিনি সন্তানের জন্ম পর্যন্ত স্ত্রী পুরুষ জোড় টিকলেই তাকে বিবাহ বলেছেন; তাহলে বলা চলে নির্বিচার যৌন সম্পর্কের অবস্থাতেও এই ধরনের বিবাহ খুবই হতে পারত এবং এতে নির্বিচারত্বের অর্থাৎ যৌন সঙ্গমে প্রথাগত নিষেধের অভাবের কোনো খন্ডন হয় না। ভেস্তের্মার্ক অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুরু করেছেন যে, 'নির্বিচার যৌন সম্পর্ক মানে ব্যক্তিগত রুচির দমন', অতএব 'বেশ্যাবৃত্তিই এর সবচেয়ে খাঁটি রূপ'। আমার কিন্তু মনে হয় যে, বেশ্যালয়ে চশমা দিয়ে যতক্ষণ দেখছি ততক্ষণ আদি অবস্থা বুঝবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সমষ্টি-বিবাহ সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা আবার এই বিষয়ে ফিরে আসব।

মর্গানের মতে নির্বিচার যৌন সম্পর্কের এই আদি অবস্থা থেকে খুব সম্ভবত খুব গোড়ার দিকে দেখা দিল :

১। **একরক্তসম্পর্কের পরিবার** – পরিবারের প্রথম স্তর। এখানে বিবাহের দলগুলি বিভিন্ন পুরুষানুক্রমে নির্ধারিত: পরিবারের গন্ডির মধ্যে সমস্ত ঠাকুর্দা ও ঠাকুমারা পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী, তাদের সন্তানসন্ততিদের অর্থাৎ বাপেদের ও মায়েদের সম্পর্কেও ঐ একই কথা খাটে; শেষোক্তদের সন্তানসন্ততিরা আবার তৃতীয় চক্রের স্বামীস্ত্রী, এদের

---

২০. *H.H. Bancroft, the Native Races of the Pacific States of North America. Vol.I.-v. New York. 1875-1876.* –সম্পাঃ

সন্তানসন্ততিরা অর্থাৎ প্রথমোক্তদের প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রীরা আবার চতুর্থ চক্রের স্বামী-স্ত্রী। এইভাবে এই রূপের পরিবারে কেবলমাত্র পূর্বপুরুষদের সঙ্গে উত্তরপুরুষের, মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততিগণের বিবাহ-সম্পর্কের (আমাদের ভাষায়) অধিকার ও দায়িত্ব থাকত না। ভাইয়েরা ও বোনেরা,– নিকট সম্পর্ক বা দূর সম্পর্কের সমস্ত মামাত পিসতুত মাসতুত জ্যাঠতুত ভাইবোনেরা – পরস্পরের ভাই ও বোন হতো এবং ঠিক এইজন্যই তারা সবাই পরস্পরের স্বামী ও স্ত্রী। পরিবারের এই স্তরে ভাইবোন সম্পর্কের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত ছিল।[২১] এই ধরনের একটি প্রতিনিধি স্থানীয় পরিবার হচ্ছে একজোড়া স্ত্রীপুরুষের বংশধরদের নিয়ে গঠিত, যাদের মধ্যে আবার এক একধাপের বংশধররা সকলেই পরস্পরের ভ্রাতাভগিনী এবং ঠিক এইজন্যই তারা পরস্পরের স্বামী ও স্ত্রী।

একরক্তসম্পর্কের পরিবার লোপ পেয়েছে। ইতিহাসে পরিচিত সবচেয়ে বন্য উপজাতিগুলির মধ্যেও এইধরনের পরিবারের কোন প্রমাণযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু এটি যে একসময়ে নিশ্চয়ই ছিল সেই সিদ্ধান্ত আমরা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আত্মীয়তাবিধি থেকে করতে বাধ্য হই। এ বিধি এখনো পলিনেশিয়ায় সর্বত্র প্রচলিত, এবং এতে আত্মীয়তার এমন ধাপগুলি প্রকাশিত যার উৎপত্তি কেবল এই ধরনের পরিবারেই সম্ভব। পরিবারের সমগ্র পরবর্তী বিকাশ থেকেও আমরা একই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হই, সে বিকাশের একটা আবশ্যিক পূর্ববর্তী পর্যায় হিসাবে পরিবারের এইরূপ ধরতে হয়।

২। **পুনালুয়া পরিবার**। পরিবার সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ যদি হয় মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততিদের যৌন সম্পর্ক রহিত করা, তাহলে দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে ভ্রাতা ও ভগিনীদের যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা। এই শেষোক্তদের বয়স খুব কাছাকাছি হওয়ায় এই পদক্ষেপটি ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ শুধু তাই নয়, পরন্তু প্রথমটির চেয়ে অনেক শক্তও বটে। ধীরগতিতে এই ব্যাপারটি সম্পন্ন হয়, সম্ভবত

---

২১. ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকালে একটি চিঠিতে মার্কস খুব কড়া ভাষায় ভাগনারের 'নিবেলুং' রচনায় আদিম অবস্থার সম্পূর্ণ মিথ্যা বিবরণের নিন্দা করেন। 'কে কখন শুনেছে যে, একজন ভাই তার বোনকে বধূ বলে আলিঙ্গন করছে?' ভাগনারের এই 'লম্পট দেবতা' যারা বেশ আধুনিক ধরনে প্রেমের সঙ্গে একটু অগম্যাগমন মিশিয়ে নিত, এদের উত্তরে মার্কস বলেছেন: 'আদিম যুগে ভগিনীই ছিল পত্নী এবং সেইটাই ছিল নীতি'। (এঙ্গেলসের টীকা)।

ভাগনারের অনুরাগী একটি ফরাসী বন্ধু এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত নন এবং তিনি বলেছেন যে, প্রাচীনতম 'এদ্দা' অর্থাৎ 'এগিসদ্রেক্কাতেই', যাকে ভাগনার আদর্শ বলে ধরেছেন, লোকি ফ্রেইয়াকে এইভাবে তিরস্কার করছেন, 'তুই দেবতাদের সামনে নিজের ভাইকে আলিঙ্গন করেছিস।' এতে নাকি দেখা যায় যে, তখনই ভাইবোনের বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। 'এগিসদ্রেক্কা' কিন্তু হচ্ছে সেই যুগের প্রকাশ যখন পুরাতন কীংবদন্তীতে বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে: এটি হচ্ছে দেবতাদের সম্পর্কে নিছক লুসিয়ানিয়ান ধরনের বিদ্রূপাত্মক রচনা। যদি মেফিস্টোফেলিস হিসাবে লোকি ফ্রেইয়াকে এইভাবে তিরস্কার করেন তাহলে এটা বরং ভাগনারের বিরুদ্ধেই যায়। আরও কয়েক ছত্র পরে লোকি নিয়র্দকেও বলছেন: 'তুমি ভগিনীকে দিয়ে (এমন) সন্তান উৎপাদন করেছ'। (*Vidh systur thinni gaztu slikan mog.*) নিয়র্দ 'আসা' জাতির লোক ছিল না, সে ছিল একজন 'ভানা' এবং সে ইংলিঙ্গা গাথায় বলছে যে, ভানাদের দেশে ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ প্রচলিত, কিন্তু আসাদের মধ্যে নয়। এর থেকে মনে হতে পারত যে, ভানারা আসাদের চেয়ে পুরনো দেবতা ছিল। সে যাইহোক নিয়র্দ আসাদের মধ্যে সমকক্ষ হিসাবে বসবাস করত এবং এইভাবে 'এগিসদ্রেক্কা' থেকে বরং বেশি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যখন নরওয়েতে দেবতাদের সম্পর্কে গাথা রচিত হয় তখন ভ্রাতা ও ভগিনীর পরস্পর বিবাহে, অন্তত দেবতাদের মধ্যে, কোন ঘৃণার উদ্রেক করত না। যদি কেউ ভাগনারের ত্রুটি মার্জনা করতে চান তাহলে তিনি 'এদ্দা' থেকে উদ্ধৃতি না দিয়ে গোটের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারেন, কারণ গোটে ভগবান ও বায়াদেরে সম্পর্কিত গাথায় অনুরূপ ভুল করে মন্দিরে স্ত্রীলোকদের ধর্মীয় আত্মসমর্পণের কথা বলেছিলেন এবং ব্যাপারটিকে বড়ো বেশি আধুনিক বেশ্যাবৃত্তির অনুরূপ করে তুলেছিলেন।(চতুর্থ সংস্করণ এঙ্গেলসের টীকা)।

শুরুতে সহোদর ভাইবোনদের (অর্থাৎ মায়ের দিক থেকে) যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়, প্রথমে বিচ্ছিন্ন কিছু ক্ষেত্রে, পরে ক্রমশ এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায় (হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে বর্তমান শতকেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম পাওয়া যেত) এবং সর্বশেষে এমনকি সমান্তরবর্তী সমস্ত ভাইবোনদের মধ্যে অথবা আমরা যা বলি প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাজিনদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। মর্গানের মতে এতে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন নীতির ক্রিয়ার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত' পাওয়া যায়। একথা সন্দেহাতীত, যেসব উপজাতিদের মধ্যে এই অগ্রগতির ফলে অন্তর্প্রজনন সঙ্কুচিত হলো তারা যেসব উপজাতির মধ্যে তখনও ভ্রাতা ও ভগিনীদের মধ্যে বিবাহ ছিল নিয়ম ও কর্তব্য, তাদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি ও অনেক বেশি পরিমাণে বিকাশলাভ করে। এই অগ্রগতির ফল যে কতখানি প্রবল প্রভাব ফেলল তা গোত্র সংগঠন থেকেই প্রমাণ হয়, এ গোত্রের প্রত্যক্ষ উদ্ভব এই অগ্রগতি থেকেই এবং লক্ষ্য ছাড়িয়ে তা বহুদূর এগিয়ে যায়। পৃথিবীর সমস্ত না হলেও অধিকাংশ বর্বর জাতিগুলির সমাজগঠনের ভিত্তি হলো গোত্র এবং গ্রীস ও রোমে আমরা সরাসরি এর থেকেই সভ্যতার স্তরে উত্তীর্ণ হই।

প্রত্যেকটি আদি পরিবার বড়জোর কয়েক পুরুষের পরই বিভক্ত হতে বাধ্য হতো। বিনা ব্যতিক্রমে বর্বর-যুগের মধ্যবর্তী স্তরের শেষাশেষি পর্যন্ত যে আদিম সাম্যতন্ত্রী সাধারণ গৃহস্থালীর ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাতে পারিবারিক গোষ্ঠীর একটা সর্বোচ্চ আয়তন নির্ধারিত হয়ে যায়, অবস্থা বিশেষে কিছু ইতর বিশেষ হলেও প্রত্যেকটি স্থানীয় এলাকায় তা কমবেশি সুনির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এক মায়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌন সম্পর্কের অবৈধতার ধারণা আসার সঙ্গে সঙ্গেই পুরানো গৃহস্থালী গোষ্ঠীর বিভাগ এবং নতুন গৃহস্থালী গোষ্ঠী (Hausgemeinden) প্রতিষ্ঠার উপর এর প্রভাব পড়তে বাধ্য (এই গোষ্ঠী পারিবারিক দলের সঙ্গে অনিবার্য মিলবেই এমন নয়)। একটি গৃহস্থালী গোষ্ঠীর কেন্দ্র হতো এক বা একাধিক ভগিনীদল, তাদের সহোদর ভাইয়েরা হতো আর একটি গোষ্ঠীর কেন্দ্র। এইভাবে অথবা অনুরূপ কোন উপায়ে একরক্তসম্পর্কের পরিবার থেকে মর্গান যাকে পুনালুয়া পরিবার বলছেন তার উৎপত্তি হলো। হাওয়াই প্রথা অনুযায়ী সহোদরা অথবা সমান্তরবর্তী (অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় বা ততোধিক স্তরের কাজিন বোনেরা) কয়েকজন ভগিনী হতো তাদের সাধারণ স্বামীদের স্ত্রী, কিন্তু এই সম্পর্কের মধ্যে থেকে তাদের ভাইয়েরা বাদ পড়ত। এই স্বামীরা এখন আর পরস্পরকে ভাই বলে সম্ভাষণ করে না, বস্তুত, তাদের এখন আর ভাই হবার দরকার নেই, পরন্তু তারা পরস্পরকে ডাকে 'পুনালুয়া' অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ সাথী, বলা যেতে পারে অংশীদার। ঠিক একইভাবে একদল সহোদর অথবা সমান্তরবর্তী ভাইয়েরা একত্রে এমন একদল স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হতো যারা তাদের ভগিনী নয় এবং এই স্ত্রীলোকেরা পরস্পরকে 'পুনালুয়া' বলে ডাকত। এইটিই হচ্ছে পরিবার গঠনের (Familienformation) চিরায়ত রূপ, পরে যার অনেকরকম পরিবর্তন হয়; এর একটি অপরিহার্য মূল বৈশিষ্ট্য হলো একটি নির্দিষ্ট পারিবারিক গন্ডির মধ্যে একদল পুরুষ ও একদল স্ত্রীর যৌথ পতিপত্নী সম্পর্ক, যে সম্পর্ক থেকে প্রথমে স্ত্রীদের সহোদর ভাইয়েদের এবং পরে সমান্তরবর্তী ভাইয়েদেরও বাদ দেওয়া হতো এবং ঐ একইভাবে বাদ দেওয়া হতো স্বামীদের বোনেদের।

পরিবারের এইরূপ থেকে একেবারে পরিপূর্ণ যথার্থতায় আমেরিকায় প্রচলিত

আত্মীয়তাবিধির বিভিন্ন ধাপগুলি মেলে। আমার মায়ের বোনেদের সন্তানসন্ততিরা তখনো থাকছে আমার মায়ের সন্তানসন্ততি; তেমনই আমার বাপের ভাইয়েদের ছেলেমেয়েরা আমার বাপেরও ছেলেমেয়ে এবং তারা সকলেই হচ্ছে আমার ভাইভগিনী, কিন্তু আমার মায়ের ভাইয়েদের ছেলেমেয়েরা এখন হচ্ছে তার ভাইপোভাইঝি, আমার বাপের বোনেদের ছেলেমেয়েরা হচ্ছে তার বোনপো-বোনঝি এবং তারা সকলেই আমার কাজিন। বস্তুতঃ আমার মায়ের বোনেদের স্বামীরা যখন আমার মায়েরও স্বামী এবং আমার বাপের ভাইয়েদের স্ত্রীরা তেমনই সকলে তারও স্ত্রী থাকছে না, ঘটনাক্ষেত্রে সর্বত্র না হলেও অধিকারের দিক দিয়ে, তখন ভাইবোনেদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক সমাজে নিন্দিত হওয়ায় প্রথম স্তরের যে কাজিনরা এতকাল নির্বিচারে ভ্রাতাভগিনী বলে গণ্য হতো তারা দুটো শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেল: একশ্রেণী এখনও আগের মতো ভাইবোন থাকল (সমান্তর); বাকিরা, একদিকে ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা ও অপরদিকে বোনের ছেলেমেয়েরা, আর ভাইবোন হতে পারে না, এদের সাধারণ জনকজননী –সাধারণ বাপ বা সাধারণ মা অথবা সাধারণ বাপমা –থাকতে পারে না এবং এজন্য এই প্রথম প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল ভাইপো-ভাইঝি ও বোনপো-বোনঝিদের, নারীপুরুষ কাজিনদের নতুন শ্রেণী গোষ্ঠীর পূর্বতন পরিবার প্রথায় অর্থহীন ছিল। আমেরিকার আত্মীয়তাবিধি যা ব্যক্তিগত বিবাহের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যেকোন পরিবারের সঙ্গে আদৌ খাপ খায় না তার খুঁটিনাটিগুলিরও পর্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ও স্বাভাবিক সমর্থন পাওয়া যায় এই পুনালুয়া পরিবার থেকে। যে পরিমাণে এই আত্মীয়তাবিধির প্রচলন ছিল অত্যন্ত ঠিক সেই পরিমাণেই পুনালুয়া পরিবার অথবা তদনুরূপ কোনো পরিবার নিশ্চয়ই বর্তমান ছিল।

পরিবারের এইযে রূপটির অস্তিত্ব হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে সত্যসত্যই প্রমাণিত হয়েছে তার খবর সম্ভবত গোটা পলিনেশিয়াতেই আমরা পেতাম যদি ধর্মপ্রাণ মিশনারিরা আমেরিকার সেকালের স্পেনীয় যাজকদের মতো, এইসব খ্রিস্টধর্ম-বিরুদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে 'জঘন্যতা'[২২] ছাড়াও আরও বেশি কিছু লক্ষ্য করতে পারতেন। যে ব্রিটেনরা তখন বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তরে তাদের সিজার যে বর্ণনা দিয়েছেন 'তারা দশ-বার জন মিলে যৌথভাবে স্ত্রী রাখত এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ভাইয়ে ভাইয়ে মিলে, বাপমা ছেলেমেয়ে মিলে,' তার প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা হয় সমষ্টিবিবাহ দিয়ে। যৌথভাবে স্ত্রী রাখার মতো বয়স্ক দশ-বার জন পুত্র বর্বর যুগে মায়েদের থাকত না, কিন্তু আমেরিকার আত্মীয়তাবিধি, যেটি পুনালুয়া পরিবারের সহগামী, তাতে অনেক ভাই থাকতে পারত, কারণ একজন মানুষের নিকট ও দূর সম্পর্কের সমস্ত কাজিনেরাই ছিল তার ভাই। 'বাপমায়ে ছেলেমেয়ে মিলে' এই বর্ণনায় সিজারের দিক থেকে ভুলবুঝা থাকতে পারে বলে মনে হয়। এই প্রথায় অবশ্য পিতা ও পুত্র অথবা মাতা ও কন্যা একই বিবাহদল থেকে একেবারে বাদ পড়ে না, কিন্তু এতে বাপ ও মেয়ে অথবা মা ও ছেলের সম্পর্ক অবশ্যই বাদ পড়ে। হিরোডোটস ও অন্যান্য প্রাচীন লেখকেরা বন্য ও বর্বর জাতিগুলির

---

২২. এ বিষয়ে এখন কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, বাখোফেন যে নির্বিচার যৌন সম্পর্কের চিহ্নগুলি আবিষ্কার করেছেন বলে বিশ্বাস করতেন তার সেই sumpfzeugung সমষ্টি বিবাহে এসে পৌঁছয়। 'বাখোফেন "পুনালুয়া" বিবাহকে যদি "অবৈধ" মনে করেন, তাহলে সেই যুগের কোন লোক বর্তমানে মাতা অথবা পিতার দিকে দূর বা নিকট সম্পর্কের কাজিনদের মধ্যে বিবাহকেও সহোদর ভাইবোনদের বিবাহের মতো অগম্যাগমন বলতে পারে' (মার্কস)। (এঙ্গেলসের টীকা)

মধ্যে সমষ্টিগতভাবে পত্নীসম্ভোগের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা এইভাবে সমষ্টি-বিবাহের এই বা অন্য কোনো রূপ দিয়েই সবচেয়ে সোজা ব্যাখ্যা করা যায়। ওয়াটসন এবং কেই 'ভারতের জনগণ'[২৩] নামক রচনায় অযোধ্যার টিকুরদের (গঙ্গার উত্তর দিকে অবস্থিত) যে বিবরণ দিয়েছেন তাতেও এই কথা খাটে, 'তারা বড় বড় গোষ্ঠীতে প্রায় যথেচ্ছভাবে বসবাস করে (অর্থাৎ যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে) এবং যখন দুজন লোককে বিবাহিত বলে ধরা হয় তখন সে বন্ধনটা মাত্র নামেই।'

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে পুনালুয়া পরিবার থেকেই গোত্র সংগঠনের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে হয়। অস্ট্রেলিয়ার শ্রেণী বিভাগ[২৪] পদ্ধতি থেকেও এর সূত্রপাত হওয়া অবশ্যই সম্ভব; অস্ট্রেলীয়দের মধ্যেও গোত্র আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে পুনালুয়া পরিবার দেখা দেয়নি; তাদের সমষ্টি-বিবাহের ধরন আরও স্থূলতর।

সব ধরনের সমষ্টিগত পরিবারে শিশুর পিতার নিশ্চয়তা নেই কিন্তু মাতা নিশ্চিত। যদিও মা সমগ্র পরিবারের সমস্ত সন্তানসন্ততিদের নিজের সন্তান বলে সম্ভাষণ করতো এবং তাদের প্রত্যেকের প্রতি তার মায়ের কর্তব্য থাকত, তাহলেও নিজের পেটের ছেলেমেয়েদের সে আলাদা করে জানে। এইভাবে এটা খুবই স্পষ্ট যে, সমষ্টি-বিবাহ যেখানে রয়েছে সেখানে কেবলমাত্র মায়ের দিক দিয়েই বংশপরম্পরা ঠিক করা যায় এবং এইভাবে একমাত্র মাতৃধারাই স্বীকৃত হয়। বস্তুত, সমস্ত বন্য জাতিদের মধ্যেই এবং বর্বরতার নিম্নতন স্তরের জাতিদের মধ্যেই এই ব্যাপার দেখা যায় এবং এই বিষয়টির প্রথম আবিষ্কার বাখোফেনের দ্বিতীয় মহৎ কৃতিত্ব। কেবলমাত্র মায়ের মারফত বংশ নির্ণয় এবং এর থেকে কালক্রমে যে উত্তরাধিকার সম্পর্ক দেখা দিল তাকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন মাতৃ-অধিকার। আমি সংক্ষেপের খাতিরে এই আখ্যাটি বজায় রাখছি। অবশ্য এই আখ্যা ভাল বাছাই হয়নি, কারণ সমাজ বিকাশের সেই স্তরে আইনী অর্থে অধিকার তখনও ছিল না।

এখন যদি আমরা পুনালুয়া পরিবারের দুটি টিপিকাল ধরনের (group) একটি নিই – অর্থাৎ যেটিতে রয়েছে কতকগুলি সহোদরা ও সমান্তরা বোন (অর্থাৎ সহোদরা বোনেদেরই বংশের প্রথম, দ্বিতীয় বা ততোধিক পর্যায়ের ভগিনী) ও তাদের সঙ্গে তাদের সন্তানসন্ততি এবং মায়ের দিক দিয়ে তাদের সহোদর ও সমান্তর ভাইয়েরা (আমাদের মত অনুযায়ী এরা বোনেদের স্বামী নয়) তাহলে আমরা ঠিক সেইসব লোকগুলিকে পাই যারা আদিরূপের গোত্রভুক্ত। এরা সকলেই একই মাতা থেকে জন্মেছে, এবং প্রত্যেক পুরুষেই এই মেয়েরা একই আদি মাতার বংশজাত হিসাবে হচ্ছে পরস্পরের ভগিনী। এই ভগিনীদের স্বামীরা কিন্তু এখন আর তাদের ভাই হতে পারে না অর্থাৎ তারা ঐ আদি মাতার বংশজাত হতে পারে না এবং সেইজন্য তারা ঐ রক্তসম্পর্কিত গোষ্ঠীর, পরবর্তী কালের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়; কিন্তু তাদের সন্তানসন্ততিরা এই গোষ্ঠীর মধ্যেই পড়ে, কারণ মায়ের দিক দিয়েই জন্মই নির্ধারক, কারণ এইটেই একমাত্র সুনিশ্চিত। যখন সমস্ত ভাইবোনেদের, এমনকি মায়ের দিক দিয়ে দূর সম্পর্কের সমান্তর ভাইবোনেদের

২৩. *J.F.Watson and J.W.Kaye, The People of India. Vol.I-VI.London, 1868-1872.* –সম্পাঃ

২৪. অস্ট্রেলীয় উপজাতিদের অধিকাংশই যেসব বৈবাহিক শ্রেণী বা বিভাগ অর্থাৎ বিশেষ নির্দিষ্ট গ্রুপে বিভক্ত হত তার কথা বলা হচ্ছে। এইরূপ প্রতিটি গ্রুপের পুরুষেরা কেবল অন্য একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের নারীর সঙ্গেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত। প্রতিটি উপজাতির মধ্যে এই ধরনের গ্রুপ থকত ৪ – ৮ টি পর্যন্ত। –সম্পাঃ

মধ্যে পর্যন্ত যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ হলো তখনই উপরোক্ত গোষ্ঠী হয়ে ওঠে যাদের নিজেদের মধ্যে বিয়ে চলবে না; এখন থেকে তা সামাজিক ও ধর্মীয় চরিত্রের অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠান মারফত নিজেকে ক্রমেই সংহত করে তোলে এবং একই উপজাতির অন্যান্য গোত্র থেকে পৃথক হয়ে ওঠে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরে করব। যদি অবশ্য আমরা দেখি যে, পুনালুয়া পরিবার থেকেই গোত্রের উদ্ভব আবশ্যিক শুধু নয়, স্পষ্টতই তাই হয়েছে, তাহলে প্রায় নিশ্চয়তার সঙ্গে ধরে নেওয়া যায় যে জাতিগুলির মধ্যে গোত্র সংগঠন দেখা যায় সেখানেই, অর্থাৎ প্রায় সমস্ত বর্বর ও সভ্য জাতিগুলির মধ্যে আগে এই রূপের পরিবার ছিল।

যে সময়ে মর্গান তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেন তখনও পর্যন্ত সমষ্টি-বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীতে সংগঠিত অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে সমষ্টি-বিবাহের প্রচলন সম্পর্কে অল্পকিছু জানা ছিল এবং উপরন্তু ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের সময়েই মর্গান হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পুনালুয়া পরিবার সম্পর্কে যে খবর পেয়েছিলেন সেটি প্রকাশ করেন। এ থেকে একদিকে আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত যে আত্মীয়তাবিধি মর্গানের সমস্ত গবেষণার প্রারম্ভবিন্দু তার পূর্ণ ব্যাখ্যা হয়; অপরদিকে মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্র উদ্ভবের তৈরি যাত্রাবিন্দু মিলছে এ থেকে। এবং সর্বশেষে অস্ট্রেলিয়ার শ্রেণী-সংগঠনের চেয়ে এটি বিকাশের অনেক উন্নত স্তর। এইজন্যই বেশ বুঝা যায় কেন মর্গান এই পুনালুয়া পরিবারকেই জোড়বাঁধা পরিবারের পূর্ববর্তী একটা আবশ্যিক বিকাশ-স্তর বলে ভেবেছিলেন এবং ধরে নিয়েছিলেন যে, প্রাচীন যুগে এই ধরনের পরিবার সর্বত্র প্রচলিত ছিল। তারপরে আমাদের কাছে সমষ্টি-বিবাহের অন্যান্য ধরনেরও অনেক তথ্য এসেছে এবং এখন আমরা জানি যে, মর্গান একটু বেশি এগিয়ে গিয়েছিলেন। তথাপি একথা ঠিক যে, পুনালুয়া পরিবার মারফত তিনি সৌভাগ্যক্রমে সমষ্টি-বিবাহের উচ্চতম ও চিরায়ত রূপটির সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিলেন, যে রূপটি থেকে উচ্চতর রূপে উৎক্রমণ সবচেয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়।

ইংরেজ মিশনারি লরিমার ফাইসনের কাছে সমষ্টি-বিবাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ সমৃদ্ধির জন্য আমরা ঋণী, কারণ ইনি এই ধরনের পরিবারের চিরায়ত আবাসভূমি অস্ট্রেলিয়ায় বহুদিন এই নিয়ে চর্চা চালিয়েছেন। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার মাউন্ট গ্যাম্বিয়ার অঞ্চলে অস্ট্রেলীয় নিগ্রোদেরই তিনি বিকাশের সর্বনিম্ন স্তরে দেখতে পান। গোটা উপজাতিটা এখানে দুটো বড় শ্রেণীতে বিভক্ত – ক্রোকি ও কুমাইট্। এক একটি শ্রেণীর অভ্যন্তরে যৌন সম্পর্ক কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ; অপরপক্ষে একটি শ্রেণীর প্রত্যেকটি পুরুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অপরশ্রেণীর প্রত্যেকটি স্ত্রীলোকের স্বামী এবং তেমনই ঐ স্ত্রীলোকও জন্মাবামাত্র তার স্ত্রী। অর্থাৎ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি নয়, গোটা দলের সঙ্গে দলের বিয়ে, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর। একথা লক্ষ্য করা উচিত যে, দুটি বহির্বিবাহিক শ্রেণীতে বিভাগজনিত বাধানিষেধ ছাড়া বয়সের অথবা বিশেষ রক্ত সম্পর্কের কোনো বাছবিচার করা হয় না। একজন ক্রোকি বৈধভাবেই প্রতিটি কুমাইট্ স্ত্রীলোককে স্ত্রী হিসাবে পাচ্ছে; যেহেতু কোনো কুমাইট্ স্ত্রীলোকের গর্ভজাত তার নিজের কন্যাও মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী কুমাইট্ সেজন্য এই কন্যাটি জন্মের সময় থেকেই প্রত্যেক ক্রোকি পুরুষের স্ত্রী অর্থাৎ তার বাপেরও। অন্তত শ্রেণী-সংগঠন যে রূপে আমরা জানি তাতে এ

ক্ষেত্রে কোনো নিষেধ আরোপ করে না। অতএব এই সংগঠন হয়তো এমন যুগে শুরু হয়ে যখন অন্তর্প্রজনন সঙ্কুচিত করার সমস্ত অস্পষ্ট প্রেরণা সত্ত্বেও মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির যৌন সম্পর্ক তখনো বিশেষ বীভৎস ব্যাপার বলে গণ্য হতো না, আর তাই নির্বিচার যৌন সম্পর্কের অবস্থার মধ্যে থেকেই শ্রেণী সংগঠনের উদ্ভব হয়েছে; নয়ত যখন বিবাহগত শ্রেণীর উৎপন্ন হলো তখন মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির যৌন সম্পর্ক ইতিপূর্বেই প্রথার দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল; সে ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থাটা আগের একরক্তসম্পর্কযুক্ত পরিবারেরই ইঙ্গিত করে এবং সেটা ছাড়িয়ে যাবার দিক দিয়ে এটা হলো প্রথম পদক্ষেপ। এই শেষের অনুমানটি অধিকতর সম্ভব বলে মনে হয়। যতদূর আমি জানি, অস্ট্রেলিয়ার কোনো বিবরণে মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির যৌন সম্পর্কের নিদর্শন নেই; এবং বহির্বিবাহের পরবর্তী রূপ, মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রগুলিতেও এরূপ সঙ্গমের নিষিদ্ধীকরণ প্রতিষ্ঠার আগে থেকে প্রচলিত বলে ধরে নিতে হয়।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার মাউন্ট গ্যাম্বিয়ার অঞ্চল ছাড়া দ্বি-শ্রেণী প্রথা ডার্লিং নদীর সন্নিহিত অঞ্চলে আরও পূর্বদিকে এবং উত্তর-পূর্ব দিকে কুইন্সল্যান্ডে দেখা যায়, এইভাবে অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রথা রয়েছে। এই প্রথায় শুধু ভাই ও বোনের বিবাহ নিষিদ্ধ, মায়ের দিক থেকে ভাইয়েদের সন্তানসন্ততি ও বোনেদের সন্তানসন্ততিদের বিবাহ নিষিদ্ধ, কারণ এরা একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; অপরপক্ষে ভাই ও বোনের ছেলেমেয়েরা পরস্পর বিয়ে করতে পারে। অন্তর্প্রজনন বন্ধ করার আরও একটি পদক্ষেপের সন্ধান পাওয়া যায় নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে ডার্লিং নদীর পার্শ্ববর্তী কামিলারোইদের মধ্যে যেখানে দুটি মূলশ্রেণীকে চারভাগে ভাগ করা হয় এবং এই চারটি শ্রেণীর প্রত্যেকটি দলবদ্ধভাবে একটি বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গে বিবাহিত হয়। প্রথম দুটিশ্রেণীর লোকেরা জন্ম থেকেই পরস্পরের স্বামীস্ত্রী; মা কোন শ্রেণীর প্রথম নাকি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সেই অনুসারে সন্তানসন্ততিরা তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সন্তানসন্ততিরা পরস্পর বিবাহিত হয় এবং তারা আবার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ এক পুরুষের লোকেরা সবসময়ই প্রথম ও দ্বিতীয়শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, পরের পুরুষের লোকেরা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর এবং তারপরের পুরুষের লোকেরা আবার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আসে। এই প্রথা অনুযায়ী (মায়ের দিকের) ভাই ও বোনেদের ছেলেমেয়েরা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী হতে পারে না, কিন্তু নাতিনাতনীরা পারে। এই অদ্ভুত জটিল প্রথাটির ওপর –অন্তত পরবর্তীযুগে – মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্র সংযুক্ত হয়ে তা আরও জটিল হয়ে পড়ে। কিন্তু এখন আমরা সে আলোচনা করতে পারব না। এইভাবে আমরা দেখি যে, অন্তর্প্রজনন রোধের প্রেরণা বার বার নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে, কিন্তু সেটা করেছে হাতড়ে হাতড়ে চলে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, উদ্দেশ্যের স্পষ্ট চেতনা ছাড়া।

সমষ্টি-বিবাহ, যা অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে আজও পর্যন্ত শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিবাহ, অর্থাৎ প্রায়ই সমগ্র মহাদেশে বিক্ষিপ্ত একটি গোটা শ্রেণীর পুরুষ মানুষের সঙ্গে ঐ একইভাবে বিক্ষিপ্ত একটি শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের বিবাহ, খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে এই সমষ্টি-বিবাহ তত ভয়ঙ্কর নয়, গণিকা-রঞ্জিত কল্পনায় কূপমণ্ডূক যা ভাবেন। বরং এই বিবাহের অস্তিত্ব সম্পর্কে বহু বৎসর ধরে কেউ সন্দেহই করেনি এবং অত্যন্ত সম্প্রতি এই নিয়ে আবার

বিতর্ক উঠেছে। ভাসাভাসা দেখলে একে মনে হবে একধরনের একটু শিথিল একপতিপত্নী প্রথা এবং কোথাও কোথাও বহুপত্নী প্রথা, তার সঙ্গে সময় সময় বিশ্বাসলঙ্ঘন। যে বিধি অনুযায়ী এই বিবাহ নিয়ন্ত্রিত হয় তা আবিষ্কার করতে হলে ফাইসন ও হাউইট যেমন করেছিলেন তেমনই বহু বৎসরের পর্যবেক্ষণ দরকার (কার্যক্ষেত্রে একজন সাধারণ ইউরোপীয়ের নিজেদের বিবাহ পদ্ধতির কথাই মনে পড়বে); সে বিধি অনুযায়ী নিজের বাড়ি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকেদের মধ্যে, এমন সব লোকেদের মধ্যে যাদের ভাষা পর্যন্ত সে বোঝে না, একজন অস্ট্রেলীয় নিগ্রো অনেক সময় শিবির থেকে শিবিরে ও উপজাতি থেকে উপজাতিতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এমন স্ত্রীলোক পাচ্ছে যারা তার কাছে সরল মনে বিনা প্রতিরোধে আত্মদান করছে এবং এ প্রথা অনুযায়ী যার একাধিক স্ত্রী আছে সে মানুষ অতিথির সেবায় রাত্রির জন্য একজনকে দিচ্ছে। যেখানে একজন ইউরোপীয় কেবলমাত্র দুর্নীতি ও আইনহীনতা দেখতে পায়, সেখানে আসলে রয়েছে কড়াকড়ি নিয়ম। এই স্ত্রীলোকেরা অপরিচিত লোকটির বৈবাহিক শ্রেণীর মধ্যে পড়ে এবং সেইজন্য জন্ম থেকেই তারা তার স্ত্রী; যে একই 'বিবাহবিধি' অনুযায়ী একদল অপর দলের জন্য বরাদ্দ থাকছে তাতেই বিবাহের জন্য বরাদ্দশ্রেণীর বাহিরে যৌন সম্পর্ক বহিষ্কার দণ্ডে নিষিদ্ধ। এমনকি যেখানে নারীহরণ চলে, যা প্রায়ই ঘটে এবং অনেক এলাকায় তাই রীতি, সেখানে পর্যন্ত শ্রেণী বিবাহের বিধি কড়াকড়িভাবে মানা হয়।

নারীহরণ প্রথার মধ্যেই একপতিপত্নী প্রথায় উৎক্রমণের লক্ষণ দেখা যায়– অন্ততপক্ষে জোড়বাঁধা বিবাহের রূপে। একজন যুবক যখন তার বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে একটি মেয়েকে হরণ করে বা নিয়ে পালায়, তখন একের পর এক সকলের সঙ্গেই ঐ মেয়েটির যৌন সম্পর্ক হয়, কিন্তু তারপর যে যুবক হরণের ব্যাপারে অগ্রণী, মেয়েটিকে তারই পত্নী বলে গণ্য করা হয়। আবার অপরদিকে অপহৃতা মেয়েটি যদি লোকটার কাছ থেকে পালিয়ে যায় এবং অপর কারও কাছে ধরা পড়ে তাহলে সে এই শেষোক্ত ব্যক্তির স্ত্রী হয় এবং প্রথম মানুষটির অধিকার চলে যায়। এইভাবে সাধারণভাবে প্রচলিত সমষ্টি-বিবাহের পাশাপাশি– এবং তার মধ্যে– দেখা দেয় ঐকান্তিক সম্পর্ক, বেশি বা কম সময়ের জন্য জোড়বাঁধা এবং সেই সঙ্গে বহুপত্নীত্ব; ফলে এখানেও সমষ্টি-বিবাহ ক্রমশ লুপ্ত হতে থাকে, শুধু একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, ইউরোপীয়দের প্রভাবে কোনটা আগে লোপ পাবে–সমষ্টি-বিবাহ অথবা এরকম বিবাহ যারা করে সেই অস্ট্রেলীয় নিগ্রোরাই।

সে যাইহোক, অস্ট্রেলিয়ায় যা প্রচলিত এইভাবে গোটা শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিবাহ হচ্ছে সমষ্টি-বিবাহের খুব নিচু ও আদিম রূপ; অপরপক্ষে আমরা যতদূর জানি পুনালুয়া পরিবার হচ্ছে এর বিকাশের উচ্চতম পর্যায়। আগেরটি যাযাবর বন্যদের সামাজিক অবস্থার উপযোগী বলে মনে হয়, কিন্তু শেষেরটির জন্য সাম্যতন্ত্রী গোষ্ঠীর অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বসতি ধরে নিতে হয় এবং এর থেকেই সরাসরিভাবে পরবর্তী উচ্চতর স্তরের বিকাশ ঘটে। এই দুয়ের মধ্যে নিশ্চয় কোনো কোনো মধ্যবর্তী স্তর আবিষ্কার হবে; এখানে আমাদের সামনে রয়েছে অনুসন্ধানের এমন একটি ক্ষেত্র যা সদ্যোন্মুক্ত ও প্রায় অকর্ষিত।

৩। **জোড়াবাঁধা পরিবার**। সমষ্টি-বিবাহের আমলে অথবা তারও আগে কমবেশি সময়ের জন্য জোড়বাঁধা পরিবার দেখা যেত; বহুপত্নীর মধ্যেও একজন মানুষের একটি প্রধান পত্নী (একে অবশ্য তখনও প্রিয় পত্নী বলা প্রায় চলে না) থাকত এবং ঐ মানুষটি হতো আবার অনেক পতির মধ্যে তার প্রধান পতি। এই অবস্থার জন্য মিশনারিদের মধ্যে নেহাৎ কম ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়নি, তাঁরা সমষ্টি-বিবাহের মধ্যে কখনও দেখতেন নির্বিচারে বহু ভোগ্যা স্ত্রী, কখনও বা খুশিমতো বিবাহভঙ্গন। এই ধরনের জোড়বাঁধার অভ্যাস অবশ্য গোত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এবং যাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ সেই 'ভাইয়েদের' ও 'বোনেদের' শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই ক্রমেই বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। রক্তসম্পর্কযুক্ত আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করায় যে প্রেরণা দেয় গোত্র তাতে ঘটনাবলী আরও এগিয়ে চলে। এইভাবে আমরা ইরকোয়াস এবং বর্বরতার নিম্নতন স্তরে অবস্থিত অন্যান্য ইন্ডিয়ান উপজাতিগুলির বেশিরভাগের মধ্যে দেখি যে, তাদের প্রথা অনুযায়ী আত্মীয় বলে স্বীকৃত সকলের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ এবং এই আত্মীয়েরা কয়েক শত রকমের। বিবাহের এই নিষেধাজ্ঞার ক্রমবর্ধিত জটিলতা সমষ্টি-বিবাহকে ক্রমেই অসম্ভব করে; তার জায়গা নেয় জোড়বাঁধা পরিবার। এই স্তরে একজন মানুষ একটিমাত্র স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাস করে, কিন্তু সেটা এমনভাবে যে পুরুষের পক্ষে বহুপত্নীত্ব এবং কখনো কখনো বিশ্বাসভঙ্গের অধিকার থাকে, যদিও অবশ্য অর্থনৈতিক কারণের জন্য বহুপত্নীত্ব কদাচিৎ আচরিত হয়; সেই সঙ্গে স্ত্রীলোকের তরফ থেকে একত্র বসবাসের সময় কড়াকড়িভাবে পাতিব্রত্য দাবি করা হয় এবং তার তরফে ব্যভিচার হলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। এই বিবাহের সম্পর্ক অবশ্য যে কোনো পক্ষ থেকেই সহজেই ভেঙে দেওয়া যায় এবং সন্তানসন্ততিরা আগের মতো কেবল মায়েরই অধিকারভুক্ত।

এইভাবে রক্তসম্পর্কযুক্ত আত্মীয়দের মধ্যে ক্রমাগত বেশি করে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ক্রিয়া চলতে থাকে। মর্গানের কথায়, 'রক্তসম্পর্কশূন্য গোত্রের মধ্যে বিবাহে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে একটি অধিকতর শক্তিশালী জাত সৃষ্টি হয়। যখন দুটি উন্নতিশীল উপজাতি একত্রে মিলে গিয়ে একটি জাতি হয় – তখন উভয় উপজাতির নৈপুণ্যের যোগফল অনুযায়ী বেড়ে উঠবে নতুন পুরুষদের খুলি ও মস্তিষ্ক।' গোত্রভিত্তিক উপজাতিগুলি সেইজন্য পশ্চাৎপদ উপজাতিদের হারিয়ে দিতে অথবা নিজেদের দৃষ্টান্তের জোরে স্বপথে চালাতে বাধ্য।

এইভাবে, স্ত্রীপুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক চলবার যে পরিধিটা একসময় সমস্ত উপজাতি জুড়ে ছিল, তাকে ক্রমেই সঙ্কীর্ণ করে আনার মধ্যেই রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে পরিবারের বিবর্তন। একের পর এক বাদ পড়তে থাকে, প্রথমে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, পরে আরও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়েরা, এবং শেষপর্যন্ত বিবাহসূত্রের কুটুম্বরা পর্যন্ত; অবশেষে কার্যক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের সমষ্টি-বিবাহ অসম্ভব হয়ে পড়ে; এবং সবশেষে বাকি রইল কেবলমাত্র একটি, তখনো শিথিলভাবে মিলিত যুগল, সেই অণু যা ভেঙে গেলেই বিবাহই আর থাকে না। শুধু এই ঘটনা দিয়েই প্রমাণ হয় যে একপতিপত্নী প্রথার উৎপত্তির পিছনে আধুনিক যুগের অর্থে ব্যক্তিগত যৌন প্রেম কত সামান্য ছিল। এই স্তরে অবস্থিত

সব জাতির মানুষের বাস্তব আচরণ এর পক্ষে আরও প্রমাণ দেয়। পরিবারের পূর্ববর্তী রূপগুলির আমলে পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের কখনও অভাব হতো না, বরং ঠিক উল্টো অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্ত্রীলোক ছিল, কিন্তু এখন স্ত্রীলোক হয়ে পড়ল দুর্লভ, তাদের খুঁজে পেতে হতো। এর ফলে জোঁড়বাঁধা বিবাহের উৎপত্তির সঙ্গেই স্ত্রীহরণ ও স্ত্রীলোক ক্রয় শুরু হয়। এটি ছিল গভীরতর যে পরিবর্তন ঘটে গেছে তার ব্যাপক লক্ষণ, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। এগুলি লক্ষণ, নারী সংগ্রহের নিতান্ত পদ্ধতি হলেও পান্ডিত্যবাগীশ স্কচ্ ম্যাক-লেনান সেগুলিকে পরিবারের বিশেষ বিশেষ ধরনে রূপান্তরিত করে নাম দিলেন 'হরণপূর্বক বিবাহ' এবং 'ক্রয়পূর্বক বিবাহ'। উপরন্তু আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে এবং (ঐ একই স্তরে অবস্থিত) অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে বিবাহ ঘটাবার দায়িত্ব পাত্রপাত্রীর নয়, বস্তুত, অনেক সময় এদের কোন মতামতই নেওয়া হয় না, এটি হচ্ছে উভয়ের মায়েদের ব্যাপার। এইভাবে প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি নরনারীর মধ্যে বাগ্‌দান হয় এবং বিবাহের দিন কাছে আসবার সময়ই কেবল তারা এই চুক্তির কথা জানতে পারে। বিবাহের আগে পাত্রীর গোত্র-আত্মীয়দের জন্য (অর্থাৎ পাত্রীর মায়ের দিকের আত্মীয়দের, বাপের বা তার দিকের আত্মীয়দের নয়) পাত্রকে উপহার দিতে হয়, এই উপহারগুলি হলো দত্তা কন্যার ক্রয়পণস্বরূপ। এই বিবাহ পাত্রপাত্রী উভয়ের যে কোনো একজনের ইচ্ছামতো ভেঙে দেওয়া যায়। তথাটি বহু উপজাতির মধ্যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইরকোয়াসদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে এইরূপ বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে জনমত বেড়ে ওঠে। পতিপত্নীর মধ্যে কোনো বিরোধ হলে উভয় তরফের গোত্র-আত্মীয়রা হস্তক্ষেপ করে মিটমাটের চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হলেই বিচ্ছেদ হয়; সন্তানসন্ততিরা মায়ের সঙ্গে থাকে এবং উভয়েরই আবার বিবাহ করবার অধিকার থাকে।

জোড়বাঁধা পরিবার এত দুর্বল ও অস্থায়ী ছিল যে, এর জন্য স্বতন্ত্র গৃহস্থালী প্রয়োজনীয় অথবা বাঞ্ছনীয় হতো না এবং এর ফলে আগের কাল থেকে পাওয়া সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালী ভেঙে যায়নি। কিন্তু সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালীর অর্থ গৃহে মেয়েদের আধিপত্য, ঠিক যেমন জন্মদাতা পিতাকে নিশ্চিতভাবে জানা অসম্ভব থাকায় গর্ভধারিনী মাকেই একমাত্র স্বীকৃতিদানের অর্থ মেয়েদের অর্থাৎ মায়েদের উচ্চ মর্যাদা। সমাজের সূচনায় নারীরা নাকি পুরুষের দাসী ছিল, এটি হচ্ছে আঠারো শতকের আলোকোদয়ের যুগ (Enlightenment) থেকে পাওয়া অতি আজগুবি একটি ধারণ। সমস্ত বন্যদের মধ্যে এবং নিম্নতন ও মধ্যবর্তী অবস্থার এবং অংশত উচ্চতন স্তরের বর্বরদের মধ্যেও স্ত্রীলোক শুধু স্বাধীনই ছিল না, পরন্তু তার অত্যন্ত সম্মানের আসন ছিল। সেনেকা উপজাতির ইরকোয়াসদের মধ্যে যিনি বহু বৎসর যাবৎ মিশনারি ছিলেন সেই আর্থার রাইট তখনও পর্যন্ত জোড়বাঁধা পরিবারের স্ত্রীলোকের আসন সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তা শোনা যাক : 'তাদের পারিবারিক ব্যবস্থার কথা বলতে গেলে, যখন এই পরিবারগুলি পুরনো লম্বা বাড়িতে (সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালীগুলিতে অনেকগুলি করে পরিবার থাকত) বসবাস করত ... তখন সর্বদাই কোনো একটি কুল (গোত্র) সেখানে আধিপত্য করত, মেয়েরা অন্যান্য কুল (গোত্র) হতে স্বামী গ্রহণ করত .... সচরাচর মেয়েরাই বাড়ির মধ্যে আধিপত্য করত; বাড়ির ভাণ্ডার ছিল সাধারণের সম্পত্তি; কিন্তু যে হতভাগ্য স্বামী অথবা প্রেমিক রসদ জোগানের ব্যাপারে নিজের কাজটুকু করতে খুবই অকর্মণ্য বা অলস হতো

তার কপাল খারাপ। বাড়িতে তার সন্তানসন্ততির সংখ্যা অথবা জিনিসপত্র যতই থাক না কেন যেকোন সময় তাকে তল্পি গুটিয়ে চলে যাবার হুকুম দেওয়া যেত; এবং এই ধরনের আদেশ পাওয়ার পর অমান্য করার চেষ্টা তার পক্ষে শুভ হতো না; এই বাড়ি তার পক্ষে অসহনীয় করে তোলা হতো, এবং তাকে নিজের কুলে (গোত্র) ফিরে যেতে হতো অথবা –প্রায়ই যা ঘটত–অপর একটি কুলে গিয়ে নতুন বিবাহ-সম্পর্ক পাততে হতো। কুলের (গোত্র) মধ্যে, তথা অন্য সর্বত্রই মেয়েদেরই প্রবল ক্ষমতা। যখন দরকার পড়ত তখন তারা সর্দারের মাথা থেকে, তাদের ভাষায়, শিঙ ভেঙে দিয়ে সাধারণ যোদ্ধাদের সারিতে নামিয়ে দিতে ইতস্তত করত না'। সাম্যতন্ত্রী যে গৃহস্থালীতে সমস্ত মেয়েরা অথবা বেশিরভাগ মেয়েরাই একই গোত্রের লোক, আর পুরুষেরা আসছে অন্যান্য সব গোত্র থেকে, সেই হচ্ছে আদিম যুগে সাধারণত প্রচলিত নারী আধিপত্যের বাস্তব ভিত্তি; এবং এইটির আবিষ্কার হচ্ছে বাখোফেনের তৃতীয় মহৎ অবদান। অধিকন্তু এইসঙ্গে আরো যোগ করতে পারি যে, পর্যটক ও মিশনারিদের বিবরণে বন্য ও বর্বরদের মধ্যে মেয়েদের উপর অত্যধিক পরিশ্রমের বোঝার যে কথা আছে তার সঙ্গে উপরের বক্তব্যের কোন বিরোধ নেই। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে শ্রম-বিভাগ যে কারণগুলি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, আর সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান নির্ধারিত হয় যে কারণে তা একেবারেই আলাদা। যেসব জাতির স্ত্রীলোকেরা আমাদের বিবেচনায় ন্যায্যের চেয়ে অনেক বেশি খাটে, তারা যে প্রকৃত শ্রদ্ধা পায় সেটা ইউরোপীয়েরা মেয়েদের যে মর্যাদা দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশি। সভ্যতার যে মহিলা কৃত্রিম মর্যাদার দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সমস্ত বাস্তব কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন, তার সামাজিক অবস্থান বর্বর যুগের কঠোর পরিশ্রমী নারীর চেয়ে ঢের নিচে, – স্বজাতির মধ্যে বর্বর যুগের সে নারী গণ্য হতো সত্যিকার মহিলা (lady, frowa, Frau – কর্ত্রী) হিসাবে এবং সেটা হতো তার সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রকৃতিবশেই।

জোড়বাঁধা পরিবার বর্তমান সময়ে আমেরিকায় সমষ্টি-বিবাহকে সম্পূর্ণভাবে স্থানচ্যুত করেছে কি না জানতে হলে উত্তর-পশ্চিমের এবং বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকার যে জাতিগুলি এখনো বন্য অবস্থার উচ্চতন স্তরে আছে তাদের মধ্যে ভালোভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। এই শেষোক্তদের মধ্যে যৌন স্বাধীনতার এতসব দৃষ্টান্তের বিবরণ পাওয়া যায় যাতে মোটেই মনে করা চলে না যে, পুরানো সমষ্টি-বিবাহ পুরোপুরি দমিত হয়েছে। অন্ততপক্ষে এর সমস্ত চিহ্ন আজও পর্যন্ত লোপ হয়নি। উত্তর আমেরিকার কমপক্ষে চল্লিশটি উপজাতির মধ্যে কোনো পুরুষ একটি পরিবারের বড় মেয়েকে বিয়ে করলে তার বাকি বোনেরাও প্রাপ্তবয়স্কা হলে তার স্ত্রীরূপে গণ্য – এটা হচ্ছে একদল ভগিনীদের আগেকার যৌথ পতি-প্রথার জের। এবং বানক্রফ্‌ট বলেছেন যে, বন্য অবস্থার উচ্চতন স্তরে অবস্থিত কালিফোর্নিয়া উপদ্বীপের উপজাতিদের কয়েকটি উৎসব আছে, তখন অনেকগুলি উপজাতি একত্র হয় নির্বিচার যৌন সম্পর্কের উদ্দেশ্যে। স্পষ্টত বুঝা যায় যে, এগুলি হচ্ছে বিভিন্ন গোত্র এবং ঐ উৎসবগুলি এদের কাছে সেই অতীত দিনের অস্পষ্ট স্মৃতি যখন একটি গোত্রের সমস্ত স্ত্রীলোক আর একটি গোত্রের সমস্ত পুরুষকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করত এবং সে গোত্রের পুরুষেরা আবার অন্য গোত্রের নারীদের স্ত্রী হিসাবে ধরত। তেমন প্রথা আজও পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত। কয়েকটি জাতির মধ্যে দেখা যায় যে, বয়ঃবৃদ্ধ পুরুষেরা, দলপতি ও যাদুকর-

পুরোহিতেরা নিজেদের স্বার্থে সাধারণ স্ত্রী-প্রথার সুযোগ নেয় এবং বেশিরভাগ স্ত্রীলোককে নিজেদের একচেটিয়া হিসাবে রাখে; কিন্তু তারাও কোনো কোনো উৎসব এবং বৃক্ষ জনজমায়েতের সময় পুরাতন সমষ্টিগত সঙ্গম অনুমোদন করতে বাধ্য হয় এবং বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষ নিয়ে সম্ভোগের জন্য নিজেদের স্ত্রীদের ছেড়ে দেয়। ভেস্তের্মার্ক (পৃঃ ২৮-২৯) এই ধরনের মধ্যে মধ্যে ঘটা স্যাটার্ন উৎসবের[২৫] ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যখন স্বল্পকালের জন্য সাবেকী অবাধ যৌন সঙ্গম বলবৎ হয়, যেমন ভারতবর্ষে হো, সাঁওতাল, পাঞ্জা ও কোটারদের মধ্যে এবং আফ্রিকার কিছু উপজাতির মধ্যে ইত্যাদি। কিন্তু অদ্ভুত লাগে যখন এইসব দেখে ভেস্তের্মার্ক সিদ্ধান্ত করেন যে, এইগুলি যা তিনি মানেন না সেই সমষ্টি-বিবাহের লুপ্তাবশেষ নয়, পরন্তু এইগুলি হচ্ছে পশু ও আদিম মানুষের মধ্যে সমভাবে প্রচলিত সঙ্গম ঋতুর জের।

এইবার আমরা বাখোফেনের চতুর্থ মহৎ আবিষ্কারে পৌঁছাই, সমষ্টি-বিবাহ থেকে জোড়বাঁধা পরিবারে উৎক্রমণের বহু প্রচলিত রূপ আবিষ্কারে। বাখোফেন যে জিনিসটিকে দেবতাদের সনাতন নির্দেশ লঙ্ঘন করার প্রায়শ্চিত্ত বলে বর্ণনা করেছেন, যে প্রায়শ্চিত্ত করে নারী পাতিব্রত্যের অধিকার ক্রয় করে, এটি বস্তুত আদিম সমাজের বহুস্বামী প্রথা থেকে মুক্ত হয়ে একটি পুরুষের স্ত্রী হওয়ার অধিকার অর্জনের যে প্রায়শ্চিত্ত তার একটি রহস্যাবৃত প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আত্মদানের রূপ নেয় : ব্যাবিলোনীয় মেয়েদের মিলিট্টার মন্দিরে বৎসরে একদিন ধরে আত্মদান করতে হতো; মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য উপজাতিরা তাদের মেয়েদের কয়েক বছরের জন্য আনাইটিসের মন্দিরে পাঠাত, সেখানে নিজেদের বাছাই করা পুরুষদের সঙ্গে স্বাধীন ভালবাসা অভ্যাস করার পর তারা বিবাহের অনুমতি পেত। ভূমধ্যসাগর থেকে গঙ্গার উপকূল পর্যন্ত এশিয়ার প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যে ধর্মের আবরণে এই ধরনের প্রথা দেখা যায়। যত দিন যায় মুক্তির জন্য প্রায়শ্চিত্তমূলক আত্মত্যাগ ততো হালকা হয়ে আসে, বাখোফেনও সেটা লিখেছেন : 'বৎসরে একবার করে আত্মদানের বদলে মাত্র একবার আত্মদান চালু হয়; বিবাহিতা স্ত্রীলোকের হেটায়ারিজমের জায়গায় দেখা দেয় কুমারীদের হেটায়ারিজম, বিবাহিত অবস্থায় তার আচরণের বদলে বিবাহের পূর্বে আচরণ, সকলের কাছে নির্বিচারে আত্মদানের বদলে বিশেষ ব্যক্তির কাছে আত্মদান' (মাতৃ-অধিকার[২৬],পৃঃ ১৯)। অন্যান্য কিছু জাতিদের মধ্যে আবার ধর্মের এ আবরণ নেই; কোনো কোনো জাতির মধ্যে যেমন পুরাকালের থ্রেশিয়ান, কেল্টিক প্রভৃতি, ভারতবর্ষের বহু আদিম অধিবাসী, মালয়ের উপজাতিগুলি, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী এবং আমেরিকার অনেক ইন্ডিয়ানদের মধ্যে আজ পর্যন্ত বিবাহের আগে মেয়েদের প্রচুর যৌন স্বাধীনতা থাকে। দক্ষিণ আমেরিকাতেও সর্বত্র এই জিনিস দেখা যায়। যেকোনো ব্যক্তি যিনি ঐ দেশের কিছুটা ভিতরে গিয়েছেন তিনি একথার সত্যতা মানবেন।

---

২৫. স্যাটার্ন উৎসব–স্যাটার্ন দেবতার সম্মানে প্রাচীন রোমের বার্ষিক উৎসব, অনুষ্ঠিত হতো কৃষিকাজ শেষ হবার উপলক্ষে, বছরের বড়ো দিনে। এ উৎসবের সময় গণভোজ ও মাতলামি চলত। দাসেরাও এতে অংশ নিত এবং স্বাধীন প্রজাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসতে পেত। স্যাটার্ন উৎসবের সময় অবাধ যৌন সঙ্গমের রেওয়াজ ছিল। এই থেকে 'স্যাটার্ন উৎসব' অর্থে উদ্দাম উপভোগের বাড়াবাড়িকে বোঝায়। –সম্পাঃ

২৬. *J.J. Bachofen, Das Mutterrecht, Stuttgart, 1861.* –সম্পাঃ

২৭. *L. Agassiz, A Journey in Brasil, Boston, 1886.* – সম্পাঃ

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আগাসিজ্ (বস্টন ও নিউ ইয়র্ক থেকে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'ব্রাজিল ভ্রমণ'[২৭] পুস্তকের ২৬৬ পৃঃ) ইন্ডিয়ান বংশ থেকে উদ্ভূত একটি ধনী পরিবার সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ দেন। যখন তাঁকে পরিবারের মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হলো এবং তিনি এর পিতার কথা জিজ্ঞাসা করলেন – তিনি মনে করেছিলেন যে, প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামে নিযুক্ত একজন অফিসার, ঐ বালিকার মায়ের স্বামীই হচ্ছে তার পিতা, – তখন মা হেসে উত্তর দিলেন : `nao tem pai, e filha da fortuna`–তার কোনো বাপ নেই, সে দৈবাৎ হয়েছে। এইভাবেই ইন্ডিয়ান অথবা অর্ধমিশ্র স্ত্রীলোকেরা এদেশে তাদের অবৈধ সন্তানদের পরিচয় দেয়, এতে কোনো অন্যায় বা লজ্জার কিছু আছে বলে মনে করে না। এটি মোটেই একটি অস্বাভাবিক ঘটনা নয়; পরন্তু উল্টোটাই ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। শিশুরা .... প্রায়ই কেবল তাদের মাকে জানে, কারণ সমস্ত যত্ন ও দায়িত্ব মাকেই পালন করতে হয়; তাদের বাপ সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না আর মাতা বা তার সন্তানদের কারও মনে হয় না যে, বাপের উপর তাদের কোনো দাবি-দাওয়া আছে।' সভ্য মানুষের কাছে যা নিতান্ত অদ্ভুত মনে হয়, মাতৃ-অধিকার ও সমষ্টি-বিবাহ অনুসারে সেইটাই রীতি।

কোনো কোনো জাতির মধ্যে আবার বরের বন্ধু ও আত্মীয়েরা অথবা বরযাত্রীরা বিবাহের সময়ই কন্যার উপর তাদের চিরাচরিত অধিকার খাটায় এবং সবশেষে পাত্রের পালা আসে; উদাহরণস্বরূপ, পুরাকালে বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে এবং আফ্রিকার অগিলাদের মধ্যে এবং আজও পর্যন্ত আবিসিনিয়ার বারিয়াদের মধ্যে এটি দেখা যায়। অন্য কোনো কোনো জাতির মধ্যে আবার একজন কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তি – উপজাতি অথবা গোত্রের দলপতি, কাসিক, শামান, পুরোহিত, প্রিন্স অথবা যে উপাধিই হোক না কেন – ইনিই সমস্ত সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং কন্যার সঙ্গে প্রথম রাত্রি যাপনের অধিকার ভোগ করেন। নব্য রোমান্টিক চিন্তাধারার হাজারও চুণকাম সত্ত্বেও এই 'প্রথম রাত্রির অধিকার' (jus primae noctis) আজও পর্যন্ত আলাস্কার বেশিরভাগ বাসিন্দাদের মধ্যে (বানক্রফট্ রচিত 'আদিম জাতিগুলি', ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১), উত্তর মেক্সিকোর তাহুদের মধ্যে ঐ পুস্তক, পৃঃ ৫৮৪) এবং অন্য জাতিদের মধ্যে সমষ্টি-বিবাহের লুপ্তাবশেষ হিসাবে রয়েছে; এবং এই প্রথা গোটা মধ্যযুগে অন্ততপক্ষে মূল কেল্টিক দেশগুলিতে ছিল, যেখানে এটি সরাসরি সমষ্টি-বিবাহ থেকে এসেছিল; যেমন আরাগনে ! ক্যাস্টিলের কৃষক কোনোদিনই ভূমিদাস ছিল না, আরাগনে কিন্তু ক্যাথলিক ফার্ডিন্যান্ড ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে এই প্রথা রদ করার আগে পর্যন্ত অত্যন্ত জঘন্য ভূমিদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। সরকারী আইনটিতে বলা হয়েছে : 'আমরা এই সাব্যস্ত ও ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত ভূস্বামীরা (সেনিওর, ব্যারন)....আর কৃষকদের বিবাহিত বধূদের সঙ্গে প্রথম রাত্রি যাপন করতেও পারবে না, অথবা বিবাহের রাত্রে পাত্রী বিছানায় শোবার পরে নিজের কর্তৃত্বের চিহ্নস্বরূপ বিছানা ও পাত্রীকে মাড়িয়ে যেতে পারবে না; অথবা উপরোক্ত ভূস্বামীরা কৃষকের সন্তানসন্ততিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিনামূল্যে অথবা মূল্য দিয়ে তাদের সেবা গ্রহণ

২৮. *S. Sugenheim, Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschajt und Horigkeit in Europa bis an die Mitte des neunzehnten Jahrunderts.* (উনিশ শতকের মধ্যভাগ অবধি ইউরোপ ভূমিদাসপ্রথা ও বেগারির অবসানের ইতিহাস), *St. Petersburg, 1861.* - সম্পাঃ

করতে পারবে না।' (ক্যাটালনীয় ভাষায় লেখা থেকে উদ্ধৃত, জুগেনহাইমের 'ভূমিদাস প্রথা', পিটার্সবুর্গ, ১৮৬১,[২৮] পৃঃ ৩৫।)

বাখোফেন যেখানে জোর করে বলেছেন যে তাঁর কথিত 'হেটায়ারিজম' অথবা Sumptzeugung থেকে একপতিপত্নী প্রথা মূলত স্ত্রীলোকদের চেষ্টাতেই এসেছিল, সেখানেও তিনি সম্পূর্ণ নির্ভুল। জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশের ফলে অর্থাৎ আদিম সাম্যতন্ত্রী ব্যবস্থার অবনতি ও জনসংখ্যার ঘনবসতির সঙ্গে সঙ্গে পুরাকাল থেকে প্রাপ্ত যৌন সম্পর্কগুলি যতই তার আদিম আরণ্যক চরিত্র হারিয়ে ফেলতে থাকল মেয়েদের কাছে ততোই তা অধিকতর পরিমাণে হীন ও পীড়নমূলক প্রতিভাত হবার কথা; ততোই আগ্রহের সঙ্গে পরিত্রাণ হিসাবে তারা অবশ্য পাতিব্রত্যের অধিকার, একটি পুরুষের সঙ্গে অস্থায়ী অথবা স্থায়ী বিবাহ চেয়ে থাকবে। এই অগ্রগতি পুরুষের কাছ থেকে আসতে পারে না, অন্তত এই কারণে যে, তারা আজও পর্যন্ত স্বপ্নেও কখনও আসল সমষ্টি-বিবাহের সুবিধা ছাড়তে চায়নি। যখন মেয়েদের চেষ্টার ফলে জোড়বাঁধা পরিবার দেখা দিল তখনই কেবল পুরুষেরা কড়াকড়িভাবে একপতিপত্নী প্রথা প্রচলন করতে পারল – অবশ্য কেবল স্ত্রীলোকদের পক্ষে প্রযোজ্য হিসাবেই।

বন্যাবস্থা ও বর্বরতার সীমারেখায় জোড়বাঁধা পরিবার দেখা দেয়; প্রধানত, বন্যাবস্থার উচ্চতন পর্যায়ে এবং কোথাও কোথাও বর্বরতার নিম্নতন স্তরে। পরিবারের এই রূপটিই বর্বর-যুগের বৈশিষ্ট্য, ঠিক যেমন সমষ্টি-বিবাহ হচ্ছে বন্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য এবং একপতিপত্নী প্রথা সভ্যতার। এই জোড়বাঁধা পরিবার থেকে স্থায়ী একপতিপত্নী প্রথায় পরিণতির জন্য ইতিপূর্বে যেসব কারণগুলি সক্রিয় ছিল তাছাড়াও পৃথক কারণের প্রয়োজন। জোড়বাঁধা পরিবারের ক্ষেত্রে সমষ্টি কমে এসেছে একেবারে তার শেষ এককে, তার দুই পরমাণুসমন্বিত এক অণুতে – একটি পুরুষ ও একটি নারীতে। ক্রমাগত সমষ্টি-বিবাহের পরিধি কমিয়ে কমিয়ে প্রাকৃতিক নির্বাচন তার কর্তব্য সমাপ্ত করেছে; এইদিক দিয়ে তার আর করবার কিছু ছিল না। তাই যদি কোন নতুন সামাজিক চালিকা শক্তিগুলি সক্রিয় না হতো তাহলে জোড়বাঁধা পরিবার থেকে নতুনতর এক পরিবার উদ্ভবের কোনো কারণ থাকত না। কিন্তু এই চালিকা শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠল।

আমাদের জোড়বাঁধা পরিবারের চিরায়ত জন্মভূমি আমেরিকা এবার থাক। এমন কোনো সাক্ষ্য মেলে না যার থেকে আমরা বলতে পারি যে, এখানে পরিবারের আরও উচ্চতর রূপ বিকশিত হয়েছিল অথবা এই মহাদেশ আবিষ্কার ও বিজয়ের আগে এখানকার কোনোখানে কোনসময়ে কড়াকড়ি একপতিপত্নী প্রথার চলন ছিল। প্রাচীন গোলার্ধে কিন্তু ব্যাপার অন্যরূপ।

এখানে পশুকে গৃহপালিত করে এবং পশুযূথের বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে ইতিপূর্বে অপ্রত্যাশিত সম্পদ দেখা দিল এবং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠল। বর্বরতার নিম্নতন স্তর পর্যন্ত স্থায়ী সম্পদ বলতে ছিল প্রায় একমাত্র ঘরবাড়ি, পরিধেয়, স্থূল অলঙ্কার এবং খাদ্য সংগ্রহ ও প্রস্তুত করবার হাতিয়ার; নৌকা, অস্ত্রশস্ত্র এবং সরলতম গার্হস্থ্য তৈজসপত্র। প্রত্যহ নতুন করে খাদ্য সংগ্রহ করতে হতো। আর এখন

ঘোড়া, উট, গাধা, গরু, ভেড়া, ছাগল ও শূকরের দল নিয়ে অগ্রগামী পশুপালক জাতিগুলি –ভারতবর্ষের পঞ্চনদ ও গঙ্গার এলাকা, তথা অক্সাস ও জাক্সার্তেসের তখনকার আমলের অতি সমৃদ্ধ রূপে জল সিঞ্চিত স্তেপভূমির আর্যগণ এবং তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী সেমিটিক জাতিগুলি যে সম্পদ অর্জন করেছিল তার শুধু তদারকি ও নিতান্ত প্রাথমিক যত্ন করলেই ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় প্রজনন ও দুধ ও মাংসের সমৃদ্ধতম খাদ্য সম্ভব হতো। খাদ্যসংগ্রহের আগেকার সমস্ত পদ্ধতি পেছনে পড়ে গেল। বন্য পশু শিকার আগে ছিল প্রয়োজন, আর এখন হয়ে উঠল একটি বিলাস।

কিন্তু এই নতুন সম্পদ কাদের অধিকার ছিল? নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শুরুতে গোত্রের অধিকারে ছিল। কিন্তু খুব গোড়ার দিকেই পশুযূথের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা নিশ্চয় দেখা দিয়ে থাকবে। একথা খুবই শক্ত যে, মোজেসের তথাকথিত প্রথম পুস্তকের রচয়িতার কাছে পিতা এব্রাহাম পশুযূথের মালিক হিসাবে যে প্রতীয়মান হয়েছিলেন সেটা একটা পারিবারিক গোষ্ঠীর কর্তা হিসাবে স্বীয় অধিকার বলে, নাকি বস্তুত একটি গোত্রের বংশপরম্পরাগত দলপতির পদমর্যাদা বলে। একটা জিনিস কিন্তু নিঃসন্দেহ এবং সেটি হচ্ছে এই যে, আধুনিক অর্থে তাঁকে সম্পত্তির মালিক মনে করলে চলবে না। একথাও সমভাবে নিশ্চিত যে, প্রামাণ্য ইতিহাসের সূচনাতেই আমরা সর্বত্র দেখতে পাই যে, পশুযূথগুলি ইতিমধ্যেই পরিবারের কর্তাদের পৃথক সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে, ঠিক যেভাবে বর্বর যুগের শিল্পসামগ্রীগুলি, ধাতুনির্মিত তৈজসপত্র, বিলাসদ্রব্য এবং সর্বশেষে মানবিক পশুদল অর্থাৎ ক্রীতদাসেরাও সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল।

কারণ এই সময় দাসপ্রথারও আবিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। বর্বরতার নিম্নতন স্তরে ক্রীতদাস কোনো কাজের নয়। এইজন্যই বিকাশের উচ্চতন পর্যায়ে পরাজিত শত্রুর প্রতি যে আচরণ করা হতো আমেরিকার ইন্ডিয়ানরা তা থেকে ভিন্নতর আচরণ করত। পুরুষ হলে হয় তাদের হত্যা করা হতো অথবা বিজয়ী উপজাতিতে ভাই বলে গ্রহণ করা হতো। মেয়েদের হয় বিবাহ করা হতো অথবা অন্য কোনোভাবে তাদের বেঁচে যাওয়া সন্তানসন্ততিদের সহ নিজের উপজাতিতে গ্রহণ করা হতো। এই স্তরে মানুষের শ্রমশক্তি থেকে তার ভরণপোষণের চেয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্বৃত্তি কিছু হতো না। পশুপালন, ধাতুকর্ম, বয়নশিল্প এবং সর্বশেষে ক্ষেত্রবর্ষণ প্রবর্তনের সঙ্গে এই অবস্থা বদলে গেল। যেমন এতদিন পর্যন্ত অতি সুলভ স্ত্রীদের এখন একটি বিনিময় মূল্য হলো এবং তাদের ক্রয় করা হতে থাকল, তেমনই ঘটল শ্রমশক্তির ক্ষেত্রেও, বিশেষতঃ পশুযূথগুলি শেষপর্যন্ত পরিবারের সম্পত্তি হয়ে যাবার পরে। গবাদি পশুর মতো অত তাড়াতাড়ি পরিবার বাড়েনি। পশুপালনের জন্য বেশি লোকের দরকার হতো; যুদ্ধবন্দীরা ঠিক এই উদ্দেশ্যেই কাজে লাগত এবং উপরন্তু ঠিক পশুদের মতোই এদেরও বংশবৃদ্ধি হতে পারত।

এই ধরনের সম্পদ একবার পরিবারগুলির মালিকানায় যাবার পর এবং সেখানে এর দ্রুত বৃদ্ধির ফলে জোড়বাঁধা পরিবার ও মাতৃ-অধিকার-ভিত্তিক গোত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার উপর দারুণ আঘাত এল। জোড়বাঁধা বিবাহ পরিবারের মধ্যে একটি নতুন উপাদান এনেছিল। এই ব্যবস্থায় গর্ভধারিণী মায়ের পাশে জন্মদাতা প্রামাণ্য

পিতাকেও পাওয়া যেত, যিনি আধুনিক যুগের অনেক 'পিতার' চেয়ে সম্ভবত বেশি প্রামাণ্য ছিলেন। তখনকার দিনে পরিবারের মধ্যে প্রচলিত শ্রমবিভাগের ধারা অনুযায়ী খাদ্যসংগ্রহ এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ভার এবং সেইহেতু হাতিয়ারগুলির মালিকানাও ছিল পুরুষদের; বিবাহবিচ্ছেদ হলে পুরুষেরা এগুলি নিয়ে যেত ঠিক যেমন স্ত্রীলোকেরা রেখে দিত গৃহস্থালীর সমস্ত জিনিসপত্র। তখনকার সমাজব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী পুরুষ ছিল খাদ্য দ্রব্যাদির নতুন সূত্রগুলিরও মালিক অর্থাৎ গবাদিপশুর ও পরে পরিশ্রমের নতুন হাতিয়াররূপে ক্রীতদাসদেরও মালিক। কিন্তু ঐ সমাজেরই রীতি অনুযায়ী পুরুষের সন্তানসন্ততিরা উত্তরাধিকার সূত্রে বাপের সম্পত্তি পেত না, কারণ এ ব্যাপারে অবস্থাটা ছিল এইরকম।

মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী, অর্থাৎ যতদিন মায়ের দিক দিয়ে বংশপরম্পরা ধরা হতো, এবং গোত্রের আদি উত্তরাধিকারপ্রথা অনুযায়ী গোত্রের কেউ মারা গেলে তার সম্পত্তি পেত গোত্রভুক্ত আত্মীয়রা। সম্পত্তিকে গোত্রের মধ্যেই থাকতে হতো। প্রথম দিকে, আলোচ্য সম্পত্তি যেহেতু খুবই অকিঞ্চিৎকর, তাই তা সম্ভবত গোত্রের নিকটতম আত্মীয়দের দখলে যেত– অর্থাৎ মায়ের দিক দিয়ে রক্তসম্পর্কযুক্ত আত্মীয়। মৃত পুরুষের সন্তানসন্ততিরা কিন্তু তার নিজের গোত্রের লোক নয়, তারা মায়ের গোত্রের লোক। গোড়ার দিকে তারা মায়ের সম্পত্তি মায়ের রক্তসম্পর্কের বাকি আত্মীয়দের সঙ্গে একত্রে উত্তরাধিকারে পেত এবং হয়তো পরে মায়ের সম্পত্তির ওপর ছেলেমেয়েদেরই হলো প্রথম দাবি; কিন্তু তারা তাদের বাপের সম্পত্তি পেত না, কারণ তারা বাপের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, অথচ সে সম্পত্তি সে গোত্রের মধ্যেই থাকবে। অতএব পশুযূথের মালিকের মৃত্যুতে পশুযূথের মালিকানা গিয়ে পড়ত প্রথমত, তার ভাইবোন ও বোনের ছেলেমেয়েদের দখলে অথবা তার মায়ের বোনেদের ছেলেমেয়েদের কাছে। তার নিজের ছেলেমেয়েরা কিন্তু উত্তরাধিকারে বঞ্চিত হতো।

অর্থাৎ যেমন সম্পদ বাড়তে থাকল তাতে একদিকে পরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষের প্রতিষ্ঠা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে থাকল এবং অপরদিকে তার নিজের শক্তিশালী সামাজিক অবস্থার জোরে নিজের সন্তানসন্ততির স্বপক্ষে প্রচলিত উত্তরাধিকারপ্রথা রূপান্তরের প্রেরণা দিল। কিন্তু মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী বংশধারা থাকাতে এটি হওয়া অসম্ভব ছিল। সেইজন্য এই প্রথা ভাঙার প্রয়োজন ছিল এবং তা ভাঙা হলো। এবং এই কাজটি আজ যেমন মনে হয় তেমন কিছু শক্ত ছিল না। কারণ এই বিপ্লব যদিও মানবসমাজের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে একটি সবচেয়ে নির্ধারক বিপ্লব, তবু এতে গোত্রের কোন জীবিত সদস্যের কোন অবস্থান্তর ঘটাবার প্রয়োজন হয়নি। আগেকার মতোই সকলে যেখানে ছিল সেইখানেই রইল। এই সহজ সিদ্ধান্তটুকুই যথেষ্ট যে, ভবিষ্যতে পুরুষের সন্তানসন্ততিরা হবে তার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু নারীর সন্তানসন্ততিরা গোত্র থেকে বাদ পড়বে এবং তারা তাদের বাপেদের গোত্রে অন্তর্ভুক্ত হবে। এইভাবে মায়েদের দিক থেকে বংশপরম্পরার হিসাব এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের উচ্ছেদ হলো এবং তার জায়গায় বাপের দিক দিয়ে বংশপরম্পরা ও

সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। সভ্য জাতিগুলির মধ্যে কবে এবং ঠিক কীভাবে এই বিপ্লব ঘটেছিল আমরা তার কিছুই জানি না। এটি পুরোপুরি প্রাগৈতিহাসিক যুগের মধ্যে পড়ে। কিন্তু এই বিপ্লব যে ঘটেছিল তা রীতিমতো প্রমাণিত হয় মাতৃ-অধিকারের অসংখ্য লুপ্তাবশেষ থেকে যেগুলি বিশেষ করে বাখোফেন সংগ্রহ করেন। অনেকগুলি ইন্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে, কত সহজে এই বিপ্লব সম্পন্ন হচ্ছে, এদের মধ্যে এই ব্যাপারটি অত্যন্ত সম্প্রতি ঘটেছে এবং এখনও ঘটে চলেছে অংশত সম্পদবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রা প্রণালীর পরিবর্তনের (বনজঙ্গল থেকে প্রান্তরে বসবাস) ফলে এবং অংশত সভ্যতা ও মিশনারিদের নৈতিক প্রভাবে। মিসৌরী অববাহিকার আটটি উপজাতির মধ্যে ছয়টিতে পুরুষের দিক দিয়ে এবং দুটিতে এখনও নারীর দিক দিয়ে বংশ ঠিক করা ও তদনুযায়ী উত্তরাধিকার বজায় আছে। শনী, মিয়ামি ও দেলওয়ারদের মধ্যে সন্তানসন্ততিদের বাপের গোত্র প্রচলিত একটা নাম দিয়ে বাপের গোত্রে অন্তর্ভুক্ত করার প্রথা প্রচলিত হয়েছে, যাতে করে তারা বাপের সম্পত্তি পেতে পারে। 'নাম বদলে বস্তু বদলে দেবার স্বাভাবিক মানবীয় কারচুপি, যেখানেই প্রত্যক্ষ স্বার্থের যথেষ্ট প্রেরণা থাকে, সেখানেই কোন ছিদ্র করে প্রচলিত ঐতিহ্যের মধ্যেই ঐতিহ্য ভাঙতে যাওয়া!' (মার্কস) ফলে অসম্ভব রকমের গোলমাল দেখা দেয় এবং তখন তার সমাধান করা সম্ভব ছিল এবং অংশত সমাধান করা হলো পিতৃ-অধিকারে উৎক্রমণ করে। 'এইটেই মনে হয় সবচেয়ে স্বাভাবিক পরিবর্তন।' (মার্কস) প্রাচীন গোলার্ধের সভ্য জাতিগুলির মধ্যে কীভাবে এই পরিবর্তন ঘটেছিল সে বিষয়ে তুলনামূলক আইনের বিশেষজ্ঞরা যা বলেছেন তা অবশ্য নিতান্ত প্রকল্প মাত্র – ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে স্টকহল্ম থেকে প্রকাশিত কভালেভ্স্কির রচিত 'পরিবার ও সম্পত্তির উৎপত্তি ও বিবর্তনের রূপরেখা'[২৯] দ্রষ্টব্য।

মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদ হচ্ছে স্ত্রীজাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহস্থালীর কর্তৃত্বও দখল করল, স্ত্রীলোক হলো পদানত, শৃঙ্খলিত, পুরুষের লালসার দাসী, সন্তান সৃষ্টির যন্ত্র মাত্র। স্ত্রীলোকের এই অবনত অবস্থা যা বিশেষভাবে বীর যুগের এবং ততোধিক চিরায়ত যুগের গ্রীকদের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছিল, তাকেই আস্তে আস্তে পালিশ করে এবং কিছুটা রূপান্তর করে মোলায়েম করা হয়েছে, কিন্তু মোটেই লুপ্ত হয়নি।

পুরুষদের এই যে একচ্ছত্র শাসন এখন প্রতিষ্ঠিত হলো তার প্রথম ফল হলো পিতৃপ্রধান পরিবারের তখন উদীয়মান একটি মধ্যবর্তী রূপ। এই ধরনের পরিবারের মূল বৈশিষ্ট্য বহুপত্নী প্রথা নয় (এই প্রথা সম্পর্কে পরে বলা হবে), পরন্তু 'স্বাধীন ও পরাধীন কিছুসংখ্যক ব্যক্তিদের পরিবার কর্তার পিতৃক্ষমতাধীনস্থ এক পরিবারের সংগঠন। সেমিটিক রূপে এই পরিবারের দলপতি বহুপত্নী গ্রহণ করে, পরাধীনদেরও স্ত্রীসন্তান থাকে, এবং সমগ্র পরিবার সংগঠনের উদ্দেশ্যে হচ্ছে একটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলে পশুপালন।' মূল বৈশিষ্ট্য হলো বাঁধা গোলাম ও পিতৃ-ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা, তাই এই ধরনের পরিবারের পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো রোমক পরিবার। Familia কথাটি শুরুতে আমাদের

২৯. *M. Kovalevsky, Tableau des origines et de l'evolution de la famille et de la propriete. Stockholm*, 1890. -সম্পাঃ

আধুনিক কূপমণ্ডুকদের যা আদর্শ, ভাবপ্রবণতা ও সাংসারিক গরমিলের সেই যুগ্মটা বোঝাত না। এমনকি রোমকদের মধ্যে গোড়ার দিকে এতে বিবাহিত দম্পতি ও তাদের সন্তানসন্ততিকেও বোঝাত না, শুধু গোলামদেরই বোঝাত। Famulus মানে একজন ঘরোয়া দাস এবং familia মানে একটি ব্যক্তির অধিকারভুক্ত সমস্ত ক্রীতদাস। এমনকি গেয়াসের সময়, পর্যন্ত familia, id est patriminium (অর্থাৎ উত্তরাধিকার), উইল করে হস্তান্তর করা হতো। রোমকরা একটি নতুন ধরনের সামাজিক সংগঠন বোঝাবার জন্য এই শব্দটি আবিষ্কার করে, –এতে পরিবারের প্রধানের অধীনে তার স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি এবং কয়েকজন গোলাম থাকত, রোমকদের পিতৃ-ক্ষমতার অনুযায়ী পরিবার প্রধান ছিলেন সকলের জীবনমরণের মালিক। 'অতএব এই শব্দটি ল্যাটিন জাতিগুলির বর্মাবৃত পারিবারিক প্রথার চেয়ে পুরনো নয়, যা এসেছে চাষবাস ও বিধিবদ্ধ দাসপ্রথার সূচনার পরে এবং গ্রীক ও আর্যবংশীয় ল্যাটিন জাতিগুলির পৃথক হয়ে যাওয়ার পরে।' এর সঙ্গে মার্কস একটু যোগ করেছেন, 'আধুনিক পরিবারের মধ্যে ভ্রূণ অবস্থায় শুধু দাসত্ব (servitus) নয়, পরন্তু ভূমিদাসত্বও আছে, কারণ গোড়া থেকেই এটির সঙ্গে কৃষি বেগারির সম্পর্ক ছিল। পরবর্তী যুগে সমাজ ও তার রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যাপকভাবে যতরকমের বিরোধ দেখা দিয়েছে তার সবই ছোট আকারে এর মধ্যে আছে।'

এই ধরনের পরিবারে দেখা যায় জোড়বাঁধা পরিবার থেকে একপতিপত্নী প্রথায় উত্তরণ। স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য, অর্থাৎ সন্তানসন্ততির পিতৃত্বের নিশ্চয়তার জন্য স্ত্রীলোককে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের অধীন করা হয়; পুরুষ যদি স্ত্রীকে হত্যা করে তবে সে তার অধিকার প্রয়োগ করেছে মাত্র।

পিতৃপ্রধান পরিবারের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা লিখিত ইতিহাসের যুগে এসে যাই এবং তাতে করে আসি এমন একটা ক্ষেত্রে যেখানে তুলনামূলক আইনবিচার পদ্ধতি থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য পেতে পারি। বস্তুত, এর ফলেই আমাদের এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। আমরা মাক্সিম কভালেভ্স্কির নিকট ('পরিবার ও সম্পত্তির উৎপত্তি ও বিবর্তনের রূপরেখা', স্টকহল্ম, ১৮৯০, পৃঃ ৬০–১০০) এই প্রমাণের জন্য ঋণী যে, পিতৃপ্রধান সাংসারিক গোষ্ঠী, (patriarchalische Hausgenossenschaft) যেগুলি আজও সার্ভ ও বুলগারদের মধ্যে 'জাদ্রুগা' (অর্থাৎ মৈত্রীর মতো কিছু একটা) অথবা 'ব্রাৎস্তভো' (ভ্রাতৃত্ব) বলে প্রচলিত এবং জাতিগুলির মধ্যে যার আকৃতি একটু অন্য রকমের,– এইটেই হচ্ছে সমষ্টি-বিবাহসঞ্জাত মাতৃ-অধিকার সমন্বিত পরিবার ও আধুনিক কালের কাছে জানা ব্যক্তিগত পরিবারের মধ্যবর্তী উৎক্রমণ স্তর। অন্ততপক্ষে প্রাচীন গোলার্ধের সভ্য জাতিগুলি, আর্য ও সেমিটিক জাতিদের সম্বন্ধে এটি প্রমাণিত বলে মনে হয়।

দক্ষিণী স্লাভদের 'জাদ্রুগা' এই ধরনের বর্তমানে প্রচলিত পারিবারিক গোষ্ঠীর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই পরিবার একজন পিতার কয়েক পুরুষের পুত্রপ্রপৌত্র ও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে গঠিত; সকলেই এক গৃহস্থালীর অন্তর্ভুক্ত, তারা একত্র জমি চাষ করে, একই সাধারণ ভাঁড়ার থেকে খাওয়া পরা চালায় এবং সমবেতভাবে সমস্ত উদ্বৃত্ত জিনিসের অধিকারী হয়। এই ধরনের গোষ্ঠীতে একটিমাত্র গৃহকর্তার (domacin) চূড়ান্ত

আধিপত্য থাকে, যিনি বাহিরের ব্যাপারে গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন, ছোটখাট বিষয়ে নিজেই নিষ্পত্তি করেন এবং টাকাকড়ির পরিচালনা তাঁরই হাতে থাকে – তিনিই এই তহবিল এবং সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনার জন্য দায়ী। তাঁকে নির্বাচিত হতে হয় এবং সবসয়েই যে তাঁকে বয়োজ্যেষ্ঠ হতে হবে তার কোন কথা নেই। পরিবারের মেয়েদের ও তাদের কাজকর্মের উপর পরিচালনা করেন গৃহকর্ত্রী (domacica), যিনি সাধারণত ঐ গৃহকর্তারই স্ত্রী। মেয়েদের জন্য স্বামী নির্বাচনে এর মত খুব গুরুত্বপূর্ণ, অনেক সময় তাই চূড়ান্ত। কিন্তু গোষ্ঠীর চূড়ান্ত ক্ষমতা পারিবারিক সভার উপর ন্যস্ত, সমস্ত পূর্ণবয়স্ক সদস্য, স্ত্রী ও পুরুষদের নিয়ে এই সভা। এই সভার সামনে গৃহকর্তা তাঁর কাজের হিসাব দেন; এই সভা শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সভ্যদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করে; কোন গুরুত্বপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয়, বিশেষতঃ জমি জায়গা প্রভৃতি বিষয়ে এখানেই সিদ্ধান্ত হয়।

মাত্র বছর দশেক আগে রাশিয়ায় এই ধরনের বৃহৎ পারিবারিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রমাণ হয়েছে; রুশ দেশের লোকাচারে এইগুলি ওব্‌শ্চিনা বা গ্রাম গোষ্ঠীর মতোই দৃঢ়মূল বলে এখন সাধারণভাবে স্বীকৃত। রাশিয়ার সবচেয়ে পুরনো আইনসংহিতা –ইয়ারোস্লাভের 'প্রাভ্‌দায়'[৩০] এই জিনিসটি পাওয়া যায় ডালমেটিয়ার আইনে যে নামে উল্লিখিত সেই একই নামে (verv) এবং পোলীয় ও চেকদের ঐতিহাসিক সূত্র থেকে এদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

হৈসলারের মতে ('জার্মান অধিকার প্রথা'[৩১]) জার্মানদের মধ্যে আদিতে যে অর্থনৈতিক একক ছিল সেটা আধুনিক অর্থের ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবার নয়, পরন্তু একটি গৃহগোষ্ঠী (Hausgenossenschaft) যাতে স্ব স্ব পরিবার সমেত কয়েক পুরুষের লোকজন থাকত এবং অনেক ক্ষেত্রে তাতে দাসও থাকত। রোমক পরিবারও শেষ পর্যন্ত এই ধরনের পরিবারে এসে পৌঁছায় এবং ফলে গৃহকর্তার স্বৈরক্ষমতা এবং তার তুলনায় পরিবারের বাকি সভ্যদের অধিকারহীনতা সম্পর্কেও সম্প্রতি জোর প্রশ্ন উঠেছে। এই ধরনের পারিবারিক গোষ্ঠী আয়র্ল্যান্ডে কেল্টিকদের মধ্যেও ছিল বলে অনুমান করা হয়; ফ্রান্সে একেবারে ফরাসী বিপ্লবের সময় পর্যন্ত নিভের্নেতে parconneries নামে এগুলি বজায় ছিল এবং ফ্রান্স কঁতেতে এগুলি আজও একেবারে লোপ পায়নি। লুআঁ জেলায় (Saone et Loire) বড় বড় কৃষক গৃহস্থালী দেখা যায় যেখানে একটি ছাদ সমান উচ্চ সাধারণের ব্যবহার্য কেন্দ্রীয় হলঘর থাকে, এর চারদিকে ঘুমাবার ঘরগুলি, এইসব ঘরে ছয় থেকে আট ধাপের সিঁড়ি দিয়ে পৌঁছাতে হয় এবং এইগুলিতে একই পরিবারে কয়েক পুরুষের লোকজন বাস করে।

ভারতবর্ষে মহান আলেকজান্ডারের যুগে নিয়ার্কাস এই গৃহস্থালী গোষ্ঠী ও তার এজমালি চাষবাসের উল্লেখ করেছেন এবং এগুলি আজও পর্যন্ত সেই অঞ্চলে, পাঞ্জাবে ও সমগ্র উত্তর-পশ্চিমে বিদ্যমান রয়েছে। ককেশাস অঞ্চলে কভালেভ্‌স্কি নিজে এর

---

৩০. ইয়ারোস্লাভের 'প্রাভদা' – প্রাচীন রুশে তৎকালীন প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে ১১শ-১২শ শতাব্দীতে রচিত ও সে সময়কার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের অভিব্যক্তিস্বরূপ 'রুশী ন্যায়' বা প্রাচীন রুশের আইন সংকলনের প্রাচীন সংস্করণের প্রথম ভাগের নাম। – সম্পা ঃ

৩১. *A. Heusler, Institutionen des deutschen Rechts, Bd I-11, Leipzing, 1885-1886.* – সম্পা:

অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন। আলজিরিয়ার কাবিলদের মধ্যে এখনো এই জিনিস দেখা যায়। এমনকি আমেরিকাতেও এর অস্তিত্ব ছিল বলা হয়ে থাকে; জুরিটার বিবরণে প্রাচীন মেক্সিকোর 'ক্যালপুলিসকে'[৩২] এই ধরনের গৃহস্থালীর সঙ্গে অভিন্ন বলে দেখাবার চেষ্টা হচ্ছে, অপরপক্ষে কুনভ (Ausland, 1890, Nos.42-44) মোটামুটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে, পেরুতে ঐ দেশজয়ের পূর্বে কর্ষিত জমির নিয়মিত বন্টন অর্থাৎ ব্যক্তিগত চাষ সমেত একধরনের মার্ক সংবিধান ছিল (আশ্চর্য যে এখানে মার্ক কথাটির প্রতিশব্দ ছিল marca)।

সে যাই হোক, জমির সাধারণ মালিকানা ও সমবেত কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত পিতৃপ্রধান গৃহস্থালী গোষ্ঠী এখন আগেকার চেয়ে নতুন তাৎপর্য অর্জন করল। এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে, প্রাচীন গোলার্ধের সভ্য ও অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে মাতৃপ্রধান পরিবার থেকে একপতিপত্নিক পরিবারে উত্তরণের সময় এই ধরনের গৃহস্থালীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পরে আমরা কভালেভ্স্কির আরও একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করব; যথা: পিতৃপ্রধান গৃহস্থালী গোষ্ঠী হলো একটা উৎক্রমণমূলক পর্যায়, যা থেকে আলাদা আলাদা পরিবারের চাষ এবং চাষজমি ও চারণ-ভূমির প্রথমে কিছু সময় পরপর এবং পরে স্থায়ীভাবে বিলি করার পদ্ধতি সহ গ্রাম গোষ্ঠী বা মার্ক বিকশিত হয়েছে।

এইসব গৃহস্থালী গোষ্ঠীর ভিতরকার পারিবারিক জীবনের ব্যাপারে অন্তত রাশিয়ার ক্ষেত্রে এটা উল্লেখযোগ্য যে, গৃহকর্তা তরুণীদের সম্পর্কে, বিশেষতঃ পুত্রবধূদের ক্ষেত্রে পদমর্যাদার প্রবল অপব্যবহার করত বলে শোনা যায় এবং অনেক সময় তারা হয়ে উঠত তার হারেম; রুশ দেশের লোকসঙ্গীতে এই অবস্থার বেশ মুখর প্রতিফলন পাওয়া যায়।

মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদের পরে দ্রুতগতিতে যে একপতিপত্নী প্রথা দেখা দেয়, সে বিষয়ে আলোচনার আগেই এখানে বহুপত্নীত্ব ও বহুস্বামীত্ব সম্পর্কে গোটাকতক কথা বলতে চাই। এই দু'রকমের বিবাহই হতে পারে কেবল নিয়মের ব্যতিক্রম, ইতিহাসের বলা যেতে পারে বিলাস সৃষ্টি, যদি না কোনো দেশে এই দু'রকমের বিবাহকে পাশাপাশি দেখা যায় এবং যতদূর জানা গেছে এমনটি কোথাও ঘটেনি। অতএব সমাজের প্রথা নির্বিশেষে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা এযাবৎ প্রায় সমানই থাকায় বহুপত্নী বিবাহের আওতাবহির্ভূত পুরুষেরা যেহেতু বহুস্বামী প্রথা থেকে পরিত্যক্ত স্ত্রীলোকেদের নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তাই এটা খুবই স্পষ্ট যে, উপরোক্ত দু'রকমের বিবাহের কোনোটারই ব্যাপক প্রচলন হতে পারেনি। বস্তুত, পুরুষের পক্ষ থেকে বহুপত্নীত্ব স্পষ্টত দাসপ্রথারই ফল এবং ব্যতিরেকমূলক অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রেই তা সীমাবদ্ধ। সেমাইট্দের পিতৃপ্রধান পরিবারে কেবলমাত্র পরিবার-পিতা স্বয়ং এবং বড়জোর তার জন কয়েক ছেলের বহু স্ত্রী থাকত, বাকি সকলকে এক একটি পত্নী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হতো। প্রাচ্যের সর্বত্র আজও এই জিনিসটি চলছে। বহুপত্নীত্ব হচ্ছে ধনী ও হোমরা-চোমরাদের একটি বিশেষ অধিকার এবং স্ত্রী সংগ্রহ হতো প্রধানত নারীদাসীদের কিনে; সাধারণ লোকেরা অধিকাংশ এক পত্নী নিয়েই থাকে। ভারতবর্ষ ও তিব্বতে বহুস্বামী প্রথা এইরকমই একটি ব্যতিক্রম, সমষ্টি-বিবাহ থেকে এর অবশ্যই চিত্তাকর্ষক উদ্ভবের জন্য আরো

৩২. Calpullis –আজটেকদের পারিবারিক গোষ্ঠী। – সম্পা ঃ

খুঁটিয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন। তবু বাস্তবক্ষেত্রে মুসলমানদের ঈর্ষাপরায়ণ হারেমগুলির তুলনায় এগুলি অনেকবেশি সহনীয়। যেমন, ভারতের নায়ারদের মধ্যে তিন, চার অথবা বেশি সংখ্যক পুরুষ মানুষের একটিমাত্র সাধারণ স্ত্রী থাকে; কিন্তু এদের মধ্যে আবার প্রত্যেকেই ঐ একই সময়ে আরও তিন বা ততোধিক পুরুষের সঙ্গে মিলে একটি দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা ততোধিক স্ত্রীও রাখতে পারে। বিস্ময়ের কথা যে, ম্যাক-লেনান এইসব বিবাহ ক্লাবের বর্ণনা দিয়ে ক্লাব বিবাহের নতুন বর্গ আবিষ্কার করেননি – পুরুষেরা একই সময়ে কয়েকটি ক্লাবের সভ্য হতে পারত। এই বিবাহের ক্লাবকে অবশ্য যথার্থ বহুস্বামী প্রথা বলা যায় না; অপরপক্ষে জিরো-তেলোঁ যা বলেছেন, এটি হচ্ছে সমষ্টি-বিবাহের এক বিশেষ (spezialisierte) রূপ যাতে পুরুষের বহুস্ত্রী থাকছে এবং স্ত্রীলোকের বহুস্বামী থাকছে।

৪। একপতিপত্নী পরিবার। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তর থেকে উচ্চতন স্তরে উৎক্রমণ যুগে জোড়বাঁধা পরিবার থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে; এর চরম বিজয় হচ্ছে সভ্যতার সূচনার অন্যতম লক্ষণ। এই প্রথার ভিত্তিতে আছে পুরুষের আধিপত্য, এর সুস্পষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে সুনিশ্চিত পিতৃত্বে সন্তানোৎপাদন, কারণ এটি সুনিশ্চিত হলে তবেই সন্তানসন্ততি প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী হিসাবে যথা সময়ে বাপের সম্পত্তি পাবে। জোড়বাঁধা বিবাহ থেকে একপতিপত্নী পরিবারের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এখানে বিবাহের বন্ধন অনেক বেশী শক্ত, যেকোনও পক্ষের মর্জিমতো সেটা এখন আর ভাঙা যায় না। এখন, সাধারণত কেবলমাত্র স্বামীই বিবাহ বন্ধন ছেদ করে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারে। দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাসভঙ্গের অধিকার এখনও পুরুষের থাকছে, অন্ততপক্ষে লোকাচারে অনুমোদিত হচ্ছে (নেপোলিয়ন সংহিতা অনুযায়ী স্বামীকে সুস্পষ্টভাবে এই অধিকার দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে রক্ষিতাকে দম্পতির গৃহে নিয়ে আসছে), এবং সমাজের অধিকতর অগ্রগতির সঙ্গে পুরুষেরা এই অধিকার বেশি বেশি খাটাতে থাকে। যদি কোথাও কোনো স্ত্রীলোক প্রাচীন যৌন প্রথা স্মরণ করে তাকে ফিরে পেতে চায় তবে আগের চেয়েও তাকে অনেক কঠোর শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

গ্রীকদের মধ্যে এই নতুন ধরনের পরিবারের কঠোরতম রূপ দেখা যায়। মার্কসের মতে, পুরানে দেবীদের যে প্রতিষ্ঠা তাতে এমন একটা পূর্বতন পর্ব বোঝায় যখন স্ত্রীলোক তখনো পর্যন্ত অনেক বেশি স্বাধীন ও শ্রদ্ধার পাত্রী ছিল; কিন্তু বীর যুগে দেখা যায় যে, পুরুষমানুষের আধিপত্য এবং নারীদাসীদের প্রতিযোগিতায় স্ত্রীলোকদের অবস্থার অনেক অবনতি হয়েছে। 'অডিসি'তে পাওয়া যায় কীভাবে টেলিমেকাশ মাকে ধমক দিয়ে চুপ করে থাকতে বলে। হোমারের কাব্যে বন্দী তরুণীরা বিজয়ীদের লালসার শিকার হচ্ছে; সামরিক দলপতিরা পদমর্যাদাক্রমে একের পর এক সর্বাপেক্ষা সুন্দরীদের নিজেদের জন্য বাছাই করছে। এই ধরনের একটি দাসী নিয়ে আকিলিস ও আগামেম্‌নসের ঝগড়াকে কেন্দ্র করেই যে সমগ্র 'ইলিয়ড' কাব্য তা আমরা জানি। হোমারের কাব্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বীর প্রসঙ্গেই তার শিবির ও শয্যার অংশীদার বন্দিনী কুমারীরও উল্লেখ আছে। এই কুমারীদের আবার গৃহে নিয়ে তোলা হয় দম্পতির সংসারে; যেমন

এস্কাইলাসের আগামেম্‌নস কাস্‌সান্দ্রাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এইসব দাসীদের ছেলেরা বাপের বিষয়-সম্পত্তির একটা ক্ষুদ্র ভাগ পায় এবং এদের স্বাধীন নাগরিক বলে ধরা হয়। টিউক্রশ হচ্ছেন টেলামনের এরকম এক অবৈধ পুত্র এবং তাকে পিতার নাম ধারণ করতে দেওয়া হয়েছিল। বিবাহিত স্ত্রীকে এইসবই সহ্য করতে হবে, কিন্তু তার নিজের বেলায় চাই কঠোর সতীত্ব এবং পাতিব্রত্য। একথা অবশ্য সত্য যে, সভ্যতার যুগের চেয়ে বীর যুগের স্ত্রীর সম্মান বেশি, কিন্তু তবে স্বামীর কাছে সে আসলে কেবল তার বৈধ উত্তরাধিকারীদের মা, তার প্রধান গৃহকর্ত্রী এবং দাসীদের কর্মাধ্যক্ষ যে দাসীদের সঙ্গে স্বামী ইচ্ছামতো রক্ষিতার মতো ব্যবহার করতে পারত ও করত। একপতিপত্নী বিবাহের পাশাপাশি এই দাসপ্রথার অস্তিত্ব এই যে সুন্দরী তরুণী দাসীরা সর্বতোভাবে পুরুষটির দখলে, এইটাই শুরু থেকে একপতিপত্নী প্রথার উপর এই চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য দেগে দেয় যে, একপতিপত্নীত্ব কেবর নারীর জন্য, পুরুষের জন্য নয়। এই বৈশিষ্ট্য তার আজও রয়ে গিয়েছে।

পরবর্তী যুগের গ্রীকদের মধ্যে ডোরিয়ান ও ইয়োনিয়ানদের পৃথক করে দেখতে হবে। প্রথমোক্তদের মধ্যে স্পার্টা হচ্ছে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, হোমারে যা পাওয়া যায় তার চেয়েও প্রাচীনতর বিবাহ-সম্পর্ক এদের মধ্যে ছিল। স্পার্টায় একধরনের জোড়বাঁধা বিবাহ দেখা যায়, স্থানীয় ধারণা অনুযায়ী রাষ্ট্র যে প্রথার কিছুটা পরিবর্তন করে; এতে সমষ্টি-বিবাহের অনেক চিহ্ন ছিল। সন্তানহীন বিবাহ ভেঙে দেওয়া হতো: রাজা আনাক্সান্দ্রিদাসের (খ্রিঃ পূঃ ৬৫০) স্ত্রী নিঃসন্তান হওয়ায় তিনি আর একটি বিবাহ করেন এবং দুটি গৃহস্থালী চালান; ঐ যুগেরই রাজা এরিস্টোনিস পূর্ব বিবাহিত দুটি নিঃসন্তান স্ত্রীর ওপর তৃতীয়বার একটি বিবাহ করেন, তবে প্রথমোক্তদের একজনকে ছেড়ে দেন। অপরপক্ষে কয়েকজন ভ্রাতার একটিমাত্র সাধারণ স্ত্রী থাকতে পারত। বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ থাকলে কোনো লোকে তাকে ভাগে পেতে পারত এবং এটাও সঙ্গতই গণ্য হতো, যদি কেউ নিজের স্ত্রীকে তুলে দিত বিসমার্ক কথিত একটা তাগড়া 'মর্দা ঘোড়ার' কাছে, – এই শেষোক্ত ব্যক্তি তার সহনাগরিক না হলেও। প্লুটার্কের রচনায় এক জায়গায় স্পার্টার একজন স্ত্রীলোক তার পশ্চাদ্ধাবক প্রণয়ীকে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যে পাঠালেন, – তা থেকে শোমানের মতে, অধিকতর যৌন স্বাধীনতারই ইঙ্গিত মেলে। প্রকৃত ব্যভিচার অর্থাৎ স্বামীর অজান্তে স্ত্রীর অবিশ্বস্ততা তাই তখনো আশ্রুতপূর্ব। অপরদিকে স্পার্টায় অন্তত তার গৌরবের যুগে গার্হস্থ্য দাসদাসী ছিল না; হেলট গোলামেরা মহালের মধ্যে আলাদাভাবে থাকত এবং এইজন্য তাদের নারীদের সঙ্গে সংসর্গের প্রলোভন স্পার্টিয়াটেসদের[৩৩] কম থাকত। এই ধরনের অবস্থার মধ্যে স্পার্টার মেয়েরা যে অন্যান্য গ্রীক মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেটা খুবই স্বাভাবিক। গ্রীক নারীদের মধ্যে প্রাচীনেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন কেবল স্পার্টার স্ত্রীলোক এবং এথেন্সের হেটায়ার শিরোমণিদের এবং এদের উক্তি তাঁরা লিপিবদ্ধ করার যোগ্য বলে মনে করতেন।

৩৩. স্পার্টিয়াটেস – প্রাচীন স্পার্টার পূর্ণাধিকার সম্পন্ন নাগরিক।
হেলট – প্রাচীন স্পার্টার অধিকারহীন অধিবাসী জমির সঙ্গে এরা বাঁধা থাকত এবং ভূস্বামী স্পার্টিয়াটেসদের জন্য নির্দিষ্ট দায়দায়িত্বে বদ্ধ ছিল। হেলটদের অবস্থা আসলে দাসদের চেয়ে মোটেই পৃথক ছিল না। – সম্পাঃ

ইয়োনিয়ানদের মধ্যে অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকমের; এথেন্স তাদের দৃষ্টান্তস্থল। মেয়েরা শুধু সুতাকাটা, কাপড়বোনা ও সেলাই শিখত, বড়জোড় একটু আধটু লেখাপড়া। তাদের পৃথক রাখা হতো এবং শুধু মেয়েদের সঙ্গেই মিশতে দেওয়া হতো। মেয়েদের মহল হতো বাড়ির একটি পৃথক ও নির্দিষ্ট অংশে হয় উপর তলায় অথবা বাড়ির পিছন দিকে – যেখানে পুরুষ মানুষ, বিশেষতঃ অচেনা লোকেরা যেতে পারত না, বাইরের কোনো পুরুষ এলে মেয়েরা সেখানে চলে যেত। দাসী সঙ্গে না নিয়ে মেয়েরা বাইরে যেত না; বাড়িতে তারা কার্যতঃ পাহারার মধ্যে থাকত; এরিস্টোফেনিস লম্পটদের ভয় দেখাবার জন্য ডালকুত্তা পোষার কথা বলেছেন এবং এশিয়ার নগরগুলিতে মেয়েদের পাহারা দেবার জন্য খোজা-প্রহরী রাখা হতো; হেরোডেটাসের সেই প্রাচীন যুগেই ব্যবসার জন্য চিওস দ্বীপে খোজা তৈরি করা হতো এবং ভাক্সমুথের মতে এটি শুধু বর্বরদের জন্যই নয়। ইউরিপিডিস্-এর রচনায় স্ত্রীকে বলা হয়েছে oikurema, গৃহস্থালী চালানোর একটি জিনিস (শব্দটি ক্লীবলিঙ্গের), এবং সন্তান প্রসবের কথা ছেড়ে দিলে এথেন্সীয়দের কাছে তারা ছিল মাত্র প্রধানা ঝি। স্বামী ব্যায়ামাদি করত, তার সামাজিক কাজকর্ম ছিল এবং তা থেকে স্ত্রী ছিল বহিষ্কৃত; এছাড়াও স্বামীর ব্যবহারের জন্য ছিল দাসীরা এবং এথেন্সের সমৃদ্ধির সময়ে ছিল ব্যাপক গণিকাবৃত্তি – যা কম করে বললেও, রাষ্ট্রের আনুকূল্য পেত। এই গণিকাবৃত্তিকে ভিত্তি করেই দেখা দেয় সেই একমাত্র বিশিষ্ট গ্রীক মহিলারা যারা তাদের রসবোধ ও শিল্পরুচিতে প্রাচীনকালের মেয়েদের সাধারণ স্তরের অনেক উঁচুতে পৌঁছেছিল, যেমন স্পার্টার মেয়েরা পৌঁছেছিল নিজেদের চরিত্রবলে। এথেন্সীয় পরিবারের সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা হচ্ছে এই যে, ওখানে মেয়েকে নারী হতে হলে আগে হতে হতো হেটায়ার।

কালক্রমে এই এথেন্সীয় পরিবারের ছাঁচেই শুধু বাকি ইয়োনিয়ানরাই নয়, পরন্তু মূল ভূখন্ড এবং উপনিবেশের সমস্ত গ্রীকরাও নিজেদের গার্হস্থ্য সম্পর্ক ক্রমেই বেশি করে গড়ে তুলতে থাকে। কিন্তু সবরকম অবরোধ ও প্রহরা সত্ত্বেও গ্রীক স্ত্রীলোকেরা স্বামীদের প্রতারণা করবার যথেষ্ট সুযোগ পেত। এই যে স্বামীরা নিজেদের স্ত্রী সম্পর্কে কোন ভালবাসা প্রকাশ করতে লজ্জিত বোধ করত, তারা সবরকমের কামক্রিয়ায় চিত্ত বিনোদন করত হেটায়ারদের নিয়ে, কিন্তু স্ত্রীলোকদের এই অপমান ফিরে আঘাত করল পুরুষদের ওপরেই এবং অধঃপতিত হয়ে তারা বালক-রতির বিকৃতিপঙ্কে নেমে গেল, গ্যানিমেডের পুরাকথা দিয়ে অবনত করল নিজেদের এবং নিজ দেবতাদের।

প্রাচীন যুগের সবচেয়ে সভ্য ও উন্নত জাতির মধ্যে যতখানি খোঁজ পাওয়া যায় তদনুযায়ী এইটাই হচ্ছে একপতিপত্নী বিবাহের সূচনা। ব্যক্তিগত যৌন ভালোবাসা থেকে কোনোক্রমেই এটি জন্মায়নি, এই দুয়ের মধ্যে কোনোই মিল নেই, কারণ আগের মতোই বিবাহ রয়ে গেল শুধু সুবিধার বিয়ে। এটি হচ্ছে পরিবারের প্রথম রূপ যা স্বাভাবিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল নয়, পরন্তু অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত যথা, আদি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত সাধারণ মালিকানার উপর ব্যক্তিমালিকানার জয়লাভের উপর। পরিবারের মধ্যে পুরুষের আধিপত্য, সন্তানসন্ততি কেবলমাত্র তার দ্বারাই হবে এবং এরা ভবিষ্যতে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে – গ্রীকরা খোলাখুলিই বলত যে,

এইগুলিই হচ্ছে একপতিপত্নী বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য। এইটুকু ছাড়া এই বিবাহ ছিল একটা বোঝা, দেবতা, রাষ্ট্র ও পূর্বপুরুষদের প্রতি একটি কর্তব্য যা পালন না করে উপায় নেই। এথেন্সের আইন শুধু বিবাহকেই বাধ্যতামূলক করেনি, পরন্তু পুরুষ কর্তৃক ন্যূনতম কতকগুলি তথাকথিত দাম্পত্য কর্তব্যের পালনকেও।

অতএব ইতিহাসে একবিবাহ দেখা দিল মোটেই স্ত্রী ও পুরুষের সদ্ভাব সূত্রে নয়, বিবাহের উচ্চতম রূপ হিসাবে তো আরো নয়। বরং তা দেখা দিচ্ছে নারী পুরুষের একজন কর্তৃক অপরের উপর আধিপত্য হিসাবে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এযাবৎ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একটি বৈরীর ঘোষণা রূপে। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে মার্কস ও আমার রচিত অপ্রকাশিত একটি পাণ্ডুলিপিতে[৩৪] নিম্নোক্ত কথাগুলি আছে : 'শ্রমের প্রথম বিভাগ হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রী ও পুরুষের বিভাগ।' বর্তমানে আমি এর সঙ্গে আরও যোগ করতে চাই : ইতিহাসে শ্রেণী-বিরোধ প্রথম যা দেখা দেয় সেটা মিলে যায় একপতিপত্নী বিবাহে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বিরোধের বিকাশের সঙ্গে এবং প্রথমশ্রেণী পীড়ন মেলে পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীজাতির ওপর পীড়নের সঙ্গে। একপতিপত্নী বিবাহ ইতিহাসের একটি বড় অগ্রসর পদক্ষেপ, কিন্তু সেই সঙ্গেই একটা আপেক্ষিক পশ্চাদগতি, যেখানে জনসমষ্টির একাংশের সচ্ছলতা ও উন্নতি হয় অপর এক অংশের দুঃখ ও পীড়নের মধ্যে দিয়ে। একপতিপত্নী বিবাহ হচ্ছে সভ্যসমাজের কোষ-রূপ, এখানে আমরা সেইসব বৈরিতা ও বিরোধের প্রকৃতি লক্ষ্য করতে পারি যেগুলি শেষোক্তের মধ্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে।

জোড়বাঁধা পরিবার এমনকি একপতিপত্নী বিবাহের বিজয়ের সঙ্গেই যৌন সম্পর্কের প্রাচীন আপেক্ষিক স্বাধীনতা আদৌ লুপ্ত হয়নি। "পুনালুয়া" গ্রুপগুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকায় পুরাতন বিবাহ-প্রথার গণ্ডী অনেক ছোট হয়ে এলেও তখনো এটি বিকাশমান পরিবারকে ঘিরে থাকে এবং সভ্যতার একেবারে সূচনা পর্যন্ত তার ঘাড়ে চেপে থাকে ..... শেষ পর্যন্ত এটি মিলিয়ে যায় হেটায়ারিজমের সেই নতুন রূপে যা পরিবারের ওপর একটি কালো ছায়া হিসাবে সভ্যতার মধ্যেও মানবসমাজের অনুগমন করে চলেছে।' হেটায়ারিজম কথাটি দিয়ে মর্গান বোঝাতে চেয়েছেন একপতিপত্নী বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষ ও অবিবাহিত স্ত্রীলোকের মধ্যে বিবাহ-বন্ধনের বাহিরের যৌন সম্পর্ককে এবং সকলেই জানেন যে, বিবিধরূপে সভ্য যুগের আগাগোড়া এটি প্রস্ফুটিত হয়েছে এবং ক্রমাগত প্রকাশ্য গণিকাবৃত্তি রূপ নিচ্ছে। এই হেটায়ারিজমের মূল পাওয়া যায় সরাসরি সমষ্টি-বিবাহের মধ্যে, এবং পাতিব্রত্যের অধিকার অর্জনের জন্য স্ত্রীলোকের প্রায়শ্চিত্তমূলক আত্মদান করার প্রথাতে। টাকা নিয়ে আত্মদান প্রথমে ছিল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ঘটতো প্রণয়ের দেবীর মন্দিরে এবং প্রথমে টাকাকড়ি জমা হতো মন্দিরের তহবিলে। আর্মেনিয়ার আনাইটিসের মন্দিরে ও করিন্থের আফ্রোদিতের মন্দিরে গিয়েরোদুলেরা[৩৫] এবং ভারতবর্ষের মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত দেবদাসীরা, তথাকথিত বায়াদেররা (কথাটি পর্তুগীজ শব্দ bailadeira বা নর্তকীর অপভ্রংশ) ছিল প্রথম গণিকা।

---

৩৪. গিয়েরোদুলেরা (hierodules) - মন্দিরের দাসী পরিচারিকা - সম্পাঃ

৩৫. Dei deutsche Ideoligie (জার্মান ভাবাদর্শ) বইটির কথা বলা হচ্ছে। - সম্পাঃ

গোড়ার দিকে এই যে ধর্মীয় আত্মদান সব স্ত্রীলোককেই করতে হতো, পরে কেবল দেবমন্দিরের পূজারিণীরাই বাকি সকলের বদলে সেই কাজ করত। মেয়েরা বিবাহের আগে যে যৌন স্বাধীনতা পেত তার থেকেই অন্যান্য জাতির মধ্যে হেটায়ারিজম দেখা দেয় – অতএব এ দিক থেকেও এটি হচ্ছে সমষ্টি-বিবাহের লুপ্তাবশেষ, কেবল আমাদের কাছে এটি অন্য রকম রাস্তা দিয়ে এসেছে। সম্পত্তির বৈষম্য শুরু হবার পরে অর্থাৎ বর্বরতার উচ্চতন স্তরের সময় থেকেই দাস শ্রমের পাশেই কখনো কখনো খাপছাড়াভাবে মজুরি-শ্রমও দেখা দেয় এবং যুগপৎ তার আনুষঙ্গিক হিসেবে ক্রীতদাসী মেয়েদের বাধ্যতামূলক আত্মদানের পাশাপাশি দেখা দেয় স্বাধীন নারীদের পেশাগত গণিকাবৃত্তি। এইভাবে সমষ্টি-বিবাহ সভ্যতার ঘাড়ে যে উত্তরদায়িত্ব চাপিয়ে দেয় সেটা দুপেশে ব্যাপার, যেমন সভ্যতার সৃষ্ট সবকিছুই দুপেশে, দুমুখো, স্ববিরোধী ও বৈরদ্যোতক : একদিকে একপতিপত্নী প্রথা, অন্যদিকে হেটায়ারিজম ও তার চূড়ান্ত রূপ গণিকাবৃত্তি। হেটায়ারিজম হচ্ছে অন্যান্য যেকোনো প্রথার মতোই একটা সামাজিক প্রথা; এর মারফত পুরনো যৌন স্বাধীনতা বজায় থাকছে – পুরুষের জন্য। যদিও বাস্তবক্ষেত্রে এই প্রথা শুধু সহ্য নয়, উৎসাহের সঙ্গে তা আচরিত করে বিশেষ করে শাসক শ্রেণীরা, তবুও মুখের কথায় এর নিন্দে করা হয়। অবশ্য বাস্তবক্ষেত্রে এই নিন্দাবাদ গণিকা বিলাসী পুরুষকে আঘাত করে না, আঘাত করে মাত্র স্ত্রীলোককে : তারা বর্জিত ও পতিত হয়ে আর একবার প্রমাণ করে যে, সমাজের বনিয়াদী নিয়ম হচ্ছে স্ত্রীলোকের ওপর পুরুষের চূড়ান্ত আধিপত্য।

একপতিপত্নী প্রথার মধ্যেই কিন্তু এতে করে দ্বিতীয় আর একটি বিরোধ দেখা দেয়। যে স্বামীর জীবন হেটায়ারিজমে সুশোভিত, তার পাশেই রয়েছে অবহেলিতা স্ত্রী। একটি আপেলের আধখানা খেয়ে তার পুরোটা হাতে ধরে রাখা যেমন অসম্ভব, একটা বিরোধের একটি দিক থাকবে অন্য দিকটি থাকবে না, সেও তেমনি অসম্ভব। তবু স্ত্রীদের কাছ থেকে উচিত শিক্ষা না পাওয়া পর্যন্ত পুরুষ অন্য কথাই ভেবেছিলেন মনে হয়। একপতিপত্নী বিবাহের সঙ্গে আগেকার দিনে অজ্ঞাত দুটি স্থায়ী সামাজিক জীব ঘটনাস্থলে এসে পড়ে – স্ত্রীর উপপতি ও প্রতারিত স্বামী। পুরুষ স্ত্রীলোকের ওপর জয়লাভ করেছে, কিন্তু বিজয়ীর মুকুট পরাবার ভার উদারচিত্তে গ্রহণ করেছে বিজিতারা। ব্যভিচার নিষিদ্ধ, কঠোরভাবে দন্ডিত তবু অদম্য,– একপতিপত্নী প্রথা ও হেটায়ারিজমের পাশাপাশি এটিও হয়ে উঠেছে একটি অপরিহার্য সামাজিক প্রথা। সন্তানের নিশ্চিত পিতৃত্ব এখনো পর্যন্ত বড়জোর নৈতিক বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এবং এই সমাধানহীন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নেপোলিয়ন সংহিতার তিনশ' বারো ধারা নির্দেশ দিচ্ছে : 'Lenfant concu pendant le mariage a pour pere le mari' –বিবাহের স্থিতিকালের মধ্যে গর্ভাধান হলে স্বামীই হলো সে সন্তানের পিতা। তিনহাজার বছরের একপতিপত্নী প্রথার এই হচ্ছে পরিণাম।

অতএব একপতিপত্নী পরিবারের যেসব ক্ষেত্রে এর ঐতিহাসিক উদ্ভব বিশ্বস্তভাবে প্রতিফলিত এবং পুরুষের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের ফলে স্ত্রী পুরুষের তীব্র বিরোধ সুপরিস্ফুট; সেখানে আমরা ক্ষুদ্র আকারে ঠিক সেই সব বিরোধ ও বৈরিতার ছবি পাই

যা নিয়ে সভ্যতার সূত্রপাত থেকেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এগিয়ে চলেছে, আর যার নিষ্পত্তি বা সমাধান করতে তা অক্ষম। স্বভাবতই আমি এখানে কেবল একপতিপত্নী প্রথার সেইসব ঘটনার কথা বলতে চাইছি যেখানে বিবাহিত জীবন সত্যসত্যই সমগ্র প্রথার আদি চরিত্রের নিয়ম অনুসারেই চলে, কিন্তু যেখানে স্ত্রী স্বামীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সব বিবাহের ক্ষেত্রেই যে ব্যাপারটা এমন নয় তা জার্মান কূপমণ্ডুকে বলে দিতে হবে না, যেমন রাষ্ট্রে তেমনি গৃহেও শাসনের সামর্থ্য তার আর নেই এবং তার স্ত্রী তাই সঙ্গত কারণেই সেই ব্রিচেস পরে, স্বামীটি যা পরার অনুপযুক্ত। তবে সান্ত্বনা হিসাবে জার্মান কূপমণ্ডুক তার সহব্যথী ফরাসী কূপমণ্ডুকের চেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান কল্পনা করে, কারণ ফরাসীর হাল প্রায়শই তার চেয়েও খারাপ।

তবে গ্রীকদের মধ্যে একপতিপত্নী পরিবার যে চিরায়ত কঠোর রূপ নিয়েছিল ঠিক সেই রূপেই তা সর্বত্র ও সর্বদাই দেখা দিয়েছে তা মোটেই নয়। ভবিষ্যতে বিশ্ববিজয়ী যে রোমকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গ্রীকদের চেয়ে একটু অমার্জিত, কিন্তু বেশি দূরপ্রসারী, এদের মধ্যে স্ত্রীলোক অনেক বেশি স্বাধীন ও সম্মানিত ছিল। রোমকেরা বিশ্বাস করত যে, স্ত্রীর উপরে জীবন মৃত্যুর ক্ষমতা থাকলেই স্ত্রীর সতীত্ব যথেষ্ট নিশ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া, এখানে স্ত্রীও ঠিক স্বামীর মতোই স্বেচ্ছায় বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারত। কিন্তু ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে জার্মানদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য একপতিপত্নী পরিবারের সর্বাধিক অগ্রগতি হয়, কারণ সম্ভবত এদের দারিদ্র্যের জন্য এদের মধ্যে তখনও পর্যন্ত জোড়বাঁধা বিবাহ থেকে পুরোপুরি একপতিপত্নী বিবাহে বিবর্তন সম্পূর্ণ হয়নি বলে মনে হয়। ট্যাসিটাসের বর্ণিত তিনটি ঘটনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি : প্রথমত, বিবাহের পবিত্রতায় এদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও – 'প্রত্যেকটি পুরুষ একটি স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত এবং স্ত্রীলোকেরা সতীত্বের রক্ষণীর মধ্যেই বসবাস করত– পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও উপজাতির দলপতিদের মধ্যে বহুপত্নীত্ব থাকত, অবস্থাটা আমেরিকানদেরই অনুরূপ, যাদের মধ্যে জোড়বাঁধা বিবাহ প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়ত, মাতৃ-অধিকার থেকে পিতৃ-অধিকারে উৎক্রমণ তাদের ঘটেছে নিশ্চয় অল্প কিছুদিন আগে, কারণ মায়ের ভাই অর্থাৎ মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী গোত্রের সবচেয়ে নিকট পুরুষ আত্মীয়কেই তখনও প্রায় নিজের জন্মদাতা পিতার চেয়েও নিকট আত্মীয় বলে মনে করা হতো; এই ব্যাপারটিও আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ, যাদের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক অতীতকে বোঝবার চাবিকাঠি দেখেছিলেন মার্কস – কথাটা তিনি প্রায়ই বলতেন। এবং তৃতীয়ত, জার্মানদের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা উচ্চ সম্মান পেত এবং সামাজিক ব্যাপারেও তাদের প্রতিপত্তি ছিল, – এই ব্যাপারটি একপতিপত্নী বিবাহের বৈশিষ্ট্যসূচক পুরুষের আধিপত্যের সরাসরি বিরোধী। এইসব বিষয়েই জার্মানদের সঙ্গে স্পার্টানদের মিল আছে; আমরা আগেই দেখেছি যে, এদের মধ্যেও জোড়বাঁধা বিবাহ সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় নি। এইভাবে এইদিক দিয়ে বিচার করলেও জার্মানদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন উপাদান বিশ্বপ্রাধান্য অর্জন করল। রোমক দুনিয়ার ধ্বংসস্তূপের ওপর বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের মধ্যে দিয়ে যে নতুন একপতিপত্নী প্রথা এবারে দেখা দিল তাতে পুরুষের আধিপত্য অনেক নম্রতর রূপে আচ্ছাদিত হলো এবং

চিরায়ত প্রাচীন যুগে যা কখনো ছিল না, অন্তত বাইরের দিক দিয়ে অনেক বেশি স্বাধীন ও সম্মানের আসন নিতে দেওয়া হলো নারীদের। এতে করে এই প্রথম বৃহত্তম নৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হলো যা আমরা পেয়েছি একপতিপত্নী বিবাহ থেকে ও তারই কল্যাণে – বিকাশটা চলেছে ক্ষেত্র বিশেষে একপতিপত্নী বিবাহের অভ্যন্তরে অথবা সমান্তরালভাবে, অথবা তার বিরোধিতায়, – যথা আধুনিক ব্যক্তিগত যৌন প্রেম যা আগেকার দিনে সারা দুনিয়ায় অজ্ঞাত ছিল।

কিন্তু এ অগ্রগতি নিশ্চিতই এসেছে এই পরিস্থিতি থেকে যে, জার্মানরা তখনো বাস করত জোড়বাঁধা পরিবারের মধ্যে এবং এই প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীলোকের যে মর্যাদা সেটা তারা যথাসম্ভব একপতিপত্নী বিবাহের সঙ্গে জুড়ে দেয়। জার্মানদের চরিত্রের কোন রূপকথাসুলভ বিস্ময়কর নৈতিক শুদ্ধতা থেকে এটি হয়নি, এর পেছনে সত্য এইটুকু যে, জোড়বাঁধা পরিবারে একপতিপত্নী বিবাহের মতো এত তীব্র নৈতিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়নি। অপরপক্ষে জার্মানরা যখন দেশান্তরী হয়ে বিশেষতঃ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কৃষ্ণসাগরের তৃণভূমির যাযাবরদের কাছে পৌঁছেছে তখন তাদের যথেষ্ট নৈতিক অবনতি ঘটে এবং অশ্বারোহন পারদর্শিতা ছাড়াও এরা তাদের কাছ থেকে গুরুতর অস্বাভাবিক অনাচার আয়ত্ত করে, আমিয়ানাস তাইফালি সম্পর্কে এবং প্রকোপিয়াস হেরুলি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবেই তা বলে গেছেন।

যদিও একপতিপত্নী বিবাহই হচ্ছে পরিবারের একমাত্র বিদিত রূপ যার থেকে আধুনিক যৌন প্রেমের বিকাশ ঘটা সম্ভব তবু একথা বলা ঠিক হবে না যে, সে প্রেম কেবলমাত্র অথবা প্রধানতঃ স্বামীস্ত্রীর পরস্পর ভালোবাসা হিসাবেই তার মধ্যে বিকশিত হয়েছে। সেটা নাকচ হয়ে যায় পুরুষাধিপত্যাধীন কঠোর একবিবাহের সমগ্র চরিত্রের ফলেই। ঐতিহাসিকভাবে সক্রিয় সমস্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে অর্থাৎ সমস্ত শাসক শ্রেণীর মধ্যে জোড়বাঁধা পরিবারের সময়ের পর থেকে বিবাহ যা ছিল ঠিক তাই থেকে গিয়েছে।

মাতাপিতার ব্যবস্থা করা একটা ব্যাপার। এবং যৌন প্রেমের প্রথম যে রূপ ঐতিহাসিকভাবে আর্বিভূত হচ্ছে প্রেমাবেগ রূপে, যে প্রেমাবেগে অধিকার থাকছে যে কোন ব্যক্তির (অন্তত শাসকশ্রেণীর যে কোন ব্যক্তির), আবির্ভাব হচ্ছে যৌন প্রেরণার সর্বোচ্চ রূপ হিসাবে – এই হলো তার বৈশিষ্ট্য – এই যৌন প্রেমের প্রথম রূপটি, মধ্যযুগের শিভালরি প্রণয় আদৌ দাম্পত্য প্রণয় ছিল না। অপরপক্ষে তার চিরায়ত রূপে, প্রভেন্সালদের মধ্যে তা পাল তুলে ছুটেছে ব্যভিচারের দিকে, আর তার গুণগান করেছেন কবিরা। জার্মান যে প্রভাত সঙ্গীত (Tagelieder) সেই 'আলবাস' (albas) হচ্ছে প্রভেন্সালদের প্রেমের কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাতে বর্ণোচ্ছল বর্ণনা আছে নাইট্ কী ভাবে প্রণয়িনীর সঙ্গে (অপরের স্ত্রী) রাত্রি যাপন করছে এবং প্রহরী বাইরে পাহারা দিচ্ছে এবং প্রভাতের ক্ষীণ আলো (alba) ফুটবার সঙ্গে সঙ্গেই ডেকে দিচ্ছে যাতে সে অলক্ষিতে পালাতে পারে। তখনকার বিদায় দৃশ্যই এর শীর্ষবিন্দু। উত্তরাঞ্চলের ফরাসীরা ও গণ্যমান্য জার্মানরা উভয়েই কাব্যের এ রীতি গ্রহণ করে এর সঙ্গে জড়িত শিভালরি প্রণয়ের রীতিনীতিসমেত; এবং এই ইঙ্গিতপূর্ণ বিষয় নিয়েই আমাদের পুরাতন কবি ভল্‌ফ্রাম ফন এশেনবাখ তিনটি অপূর্ব প্রভাত-সঙ্গীত দিয়ে গেছেন যেগুলিকে আমি তাঁর

তিনটি বড় বড় বীরগাথার চেয়ে অনেক বেশি পছন্দ করি।

আমাদের যুগে বুর্জোয়া বিবাহ প্রথা হচ্ছে দু-রকমের। ক্যাথলিক দেশসমূহে আগের মতোই মাতাপিতা তরুণ বুর্জোয়া সন্তানের জন্য উপযোগী পাত্রী যোগাড় করে দেন এবং এর ফলে স্বভাবতঃই একপতিপত্নী প্রথার আত্মবিরোধ পূর্ণভাবেই ফুটে ওঠে – স্বামীর দিক থেকে ঢালাও হেটায়ারিজম এবং স্ত্রীর দিক থেকে ঢালাও ব্যভিচার। ক্যাথলিক গির্জা থেকে বিবাহবিচ্ছেদ নিশ্চয়ই এইজন্য নিষিদ্ধ করা হয় যে, তাঁরা বুঝেছিলেন যে মৃত্যুর মতোই ব্যভিচারেরও কোন চিকিৎসা নেই। অপরপক্ষে প্রটেস্টান্ট দেশগুলিতে সাধারণতঃ বুর্জোয়া ঘরের ছেলেকে স্বশ্রেণী থেকে কমবেশি স্বাধীনভাবে স্ত্রী নির্বাচন করতে দেওয়া হয়। ফলে বিবাহের ভিত্তিতে কিছুটা ভালোবাসা থাকতে পারে এবং শালীনতার জন্য প্রটেস্টান্ট সুলভ ভণ্ডামিবশে সে ভালোবাসা আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এইক্ষেত্রে পুরুষের দিক থেকে হেটায়ারিজম অনেক কম এবং স্ত্রীলোকদের পক্ষ থেকে ব্যভিচারও ততোটা সাধারণ নয়। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক ধরনের বিবাহেই স্ত্রী-পুরুষ বিবাহের আগে যেমন ছিল পরেও তেমনই থাকে এবং যেহেতু প্রটেস্টান্ট দেশসমূহের বুর্জোয়ারা বেশির ভাগই কূপমণ্ডুক তাই প্রটেস্টান্টদের একপতিপত্নী বিবাহের উত্তম দৃষ্টান্তগুলির গড়পড়তা ধরলেও তা পরিণত হয় এক নিরেট একঘেঁয়েমির দাম্পত্য-জীবনে, যাকেই বলা হয় দাম্পত্য সুখ। এই দু-ধরনের বিবাহের প্রকৃষ্ট দর্পণ হচ্ছে উপন্যাস: ফরাসী উপন্যাসে ক্যাথলিক ধরনের বিবাহের সাক্ষাৎ মেলে এবং জার্মান উপন্যাসে প্রটেস্টান্ট ধরনের। উভয়ক্ষেত্রে পুরুষই 'পায়' : জার্মান নভেলের তরুণ যুবক পায় একটি তরুণী, ফরাসী নভেলে স্বামী পায় তার প্রবঞ্চনার হেনস্থা। কার দুর্ভোগ যে বেশি সব ক্ষেত্রে বলা শক্ত, কেননা জার্মান নভেলের নীরসতা ফরাসী বুর্জোয়ার মনে যতখানি ভীতি জাগায়, ফরাসী নভেলের 'দুর্নীতি' জার্মান কূপমণ্ডুকের মনে ঠিক ততখানি ভীতি উদ্রেক করে। তবু সম্প্রতি 'বার্লিন মহানগরীতে পরিণত হওয়ায়' যে হেটায়ারিজম ও ব্যভিচার এখানে বহুদিন থেকেই বর্তমান বলে জানা, তা নিয়ে জার্মান উপন্যাসে কিছুটা কম ভীতি দেখা দিচ্ছে।

কিন্তু উভয়ক্ষেত্রে বিবাহ নির্ভর করে পাত্রপাত্রীদের শ্রেণীর উপর এবং সেই হিসাবে এগুলি সুবিধার বিবাহই থেকে যায়। উভয়ক্ষেত্রেই এই সুবিধার বিবাহ প্রায়ই অত্যন্ত স্থূল বেশ্যাবৃত্তিতে পরিণত হয় – কখনো দুপক্ষের কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রীর বেলায়; স্ত্রীর সঙ্গে সাধারণ পতিতার পার্থক্য এইটুকু যে, সে ফুরনের মজুরের মতো নিজের দেহ ভাড়া খাটায় না, পরন্তু সে দেহটা বিক্রি করে চিরকালের মতো দাসত্ব। সমস্ত সুবিধামাফিক বিবাহ সম্পর্কে ফুরিয়ের এই মন্তব্য প্রযোজ্য : 'ব্যাকরণে যেমন দুটি নেতিবাচক শব্দে একটি ইতিবাচক শব্দ হয়, তেমনি বিবাহের নীতিশাস্ত্রে দুটি বেশ্যাবৃত্তি মিলে পূণ্যধর্ম হয়ে ওঠে।' কেবলমাত্র শোষিত শ্রেণীগুলির মধ্যে অর্থাৎ বর্তমানে প্রলেতারীয়দের মধ্যে স্ত্রী সম্পর্কে যৌন প্রেম সাধারণ ব্যাপার হতে পারে ও হয়ে থাকে, সরকারীভাবে এই সম্পর্ককে স্বীকার হোক বা না হোক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে চিরায়ত একপতিপত্নী প্রথার সমস্ত পুরনো বনিয়াদই আর থাকছে না। যে সম্পত্তির সংরক্ষণ ও উত্তরাধিকারের জন্য একপতিপত্নী প্রথা ও পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেরকম সব সম্পত্তিই

এখানে অনুপস্থিত। অতএব এখানে পুরুষের আধিপত্য খাটাবার কোন প্রেরণা নেই। উপরন্তু তার উপায়ও নেই : এই আধিপত্য রক্ষা করে যে নাগরিক আইন তার অস্তিত্ব শুধু বিত্তবান শ্রেণীগুলির জন্য এবং প্রলেতারীয়দের সঙ্গে তাদের কারবারের জন্য। এতে টাকাকড়ি লাগে এবং সেইজন্যই শ্রমিকের দারিদ্র্যের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে তার আচরণের ব্যাপারে এর কোন কার্যকারিতা নেই। এখানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত আর সামাজিক সম্বন্ধই হচ্ছে নির্ধারক ব্যাপার। উপরন্তু, যখন থেকে বৃহৎ শিল্প স্ত্রীলোককে ঘর থেকে শ্রমবাজার ও কারখানায় পাঠাল এবং প্রায়ই তাকে পরিবার পালনে রোজগার করতে হলো তখন থেকে প্রলেতারীয় সংসারে পুরুষের আধিপত্যের যা কিছু ভিত্তি ছিল সবই লোপ পেল – একপতিপত্নী বিবাহের প্রতিষ্ঠা থেকে স্ত্রীলোকের প্রতি যে রূঢ়তা দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল সম্ভবত তার কিছু কিছু ছাড়া। এইভাবে প্রলেতারীয় পরিবার সঠিক অর্থে আর একপতিপত্নীক নয়; এমনকি যেখানে নিবিড় প্রেম ও উভয় পক্ষের পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা বর্তমান সেখানেও, এবং আধ্যাত্মিক ও পার্থিব সমস্ত রকমের মন্ত্রপূত হয়েও। একপতিপত্নী প্রথার দুটি চিরন্তন সঙ্গী হেটায়ারিজম ও ব্যভিচারের ভূমিকা তাই এখানে প্রায় নগন্য। বস্তুতঃ স্ত্রীলোক বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার ফিরে পেয়েছে এবং বনিবনাও না হলে স্বামী স্ত্রী ছাড়াছাড়ি হতেই পছন্দ করে। সংক্ষেপে, প্রলেতারীয় বিবাহ ব্যুৎপত্তিগত অর্থে একপতিপত্নী হলেও ঐতিহাসিক অর্থে মোটেই নয়।

আমাদের আইনজ্ঞরা অবশ্য বলে থাকেন যে, আইন প্রণয়নে প্রগতির মধ্যে দিয়ে ক্রমেই বেশি বেশি পরিমাণে স্ত্রীলোকের অভিযোগের কারণগুলি দূর হচ্ছে। আধুনিক সভ্য দেশের আইনবিধি ক্রমশঃই এই জিনিসটা মেনে নিচ্ছে যে, প্রথমত, কার্যকরী হতে গেলে বিবাহকে দুই পক্ষ থেকে স্বেচ্ছামূলক চুক্তির ভিত্তিতে হতে হবে: এবং দ্বিতীয়ত, বিবাহিত অবস্থায় অধিকার ও দায়িত্বের দিক দিয়ে উভয়পক্ষের সমতা থাকবে। যদি এই দুটি দাবি যথাযথভাবে কার্যকরী হয় তাহলে মেয়েদের চাওয়ার আর কিছু থাকে না।

এই টিপিকাল উকিলী যুক্তি হচ্ছে ঠিক সেইরকম যা দিয়ে র‍্যাডিকাল বুর্জোয়া-প্রজাতন্ত্রী প্রলেতারীয়কে ফেরায়। কাজের চুক্তিকে মালিক-শ্রমিক উভয়পক্ষের স্বেচ্ছামূলক মনে করা হয়। কিন্তু কাগজে কলমে আইন উভয়পক্ষকে একই ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে দেয় বলে ধরা হয় চুক্তিটি স্বেচ্ছামূলক। ভিন্ন শ্রেণী অবস্থানের জন্য প্রাপ্ত একটি পক্ষের ক্ষমতা, অপরপক্ষের ওপর তার চাপ, উভয়ের বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা – এসব নিয়ে আইন মাথা ঘামায় না। এবং কাজের চুক্তি বলবৎ থাকায় সময় উভয়পক্ষকেই সমান অধিকারভোগী মনে করা হয়, যতক্ষণ না কোন এক পক্ষ সুস্পষ্টভাবে এই অধিকার ছেড়ে দিচ্ছে। বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে শ্রমিক যে তার সমান অধিকারের সামান্যতম আভাসটুকুও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, এই বিষয়েও আইনের কিছু করবার নেই।

বিবাহের ব্যাপারে খুব প্রগতিশীল আইনও এইটুকুতেই সন্তুষ্ট যে, উভয়পক্ষ বিবাহে সরকারীভাবে নিজেদের সম্মতি জানিয়েছে। আইনের যবনিকার আড়ালে যেখানে বাস্তব জীবন চলে সেখানে কী ঘটছে, কীভাবে এই স্বেচ্ছামূলক চুক্তিতে পৌঁছান হচ্ছে, তা নিয়ে আইন এবং আইনজ্ঞ মাথা ঘামায় না। অথচ বিভিন্ন দেশের আইনের মামুলি তুলনা

থেকেও আইনজ্ঞ বুঝতে পারবেন যে, এই স্বেচ্ছামূলক চুক্তি আসলে কী দাঁড়ায়। জার্মানিতে, ফরাসী আইনের অধীন সব দেশ ও অন্যান্য দেশগুলিতে যেখানে সন্তানসন্ততিরা বাধ্যতামূলকভাবে পিতামাতার সম্পত্তির ভাগ আইনত পায়, তাদের উত্তরাধিকারচ্যুত করা যায় না, সেখানে বিবাহের প্রশ্নে সন্তানসন্ততিদের মাতাপিতার সম্মতি নিতেই হয়। যেসব দেশে ইংরেজী আইন খাটে, যেখানে বিবাহে মাতাপিতার সম্মতির জন্য আইন-বাধ্যবাধকতা নেই, সেখানে সম্পত্তির ব্যাপারে মাতাপিতার উইলের নিরঙ্কুশ অধিকার আছে এবং তারা যদি এটা ইচ্ছা করে তাহলে সন্তানসন্ততিদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারে। অতএব এটা স্পষ্ট যে, এ সত্ত্বেও কিংবা বলা উচিত এইজন্যই যেসব শ্রেণীর মধ্যে উত্তরাধিকারের মতো সম্পত্তি আছে, ইংল্যান্ডে বা আমেরিকায় তাদের মধ্যে বিবাহের স্বাধীনতা ফ্রান্স বা জার্মানির চেয়ে একছিটে বেশি নয়।

বিবাহে স্ত্রী পুরুষের আইনী সমাধিকারের ক্ষেত্রেও অবস্থা এর চেয়ে ভাল নয়। পূর্বতন সামাজিক অবস্থার উত্তরদায়িত্ব হিসাবে প্রাপ্ত উভয়ের আইনগত অসম অধিকার, এটি স্ত্রীলোকের ওপর অর্থনৈতিক পীড়নের কারণ নয়, ফল। পুরনো সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালীতে যেখানে বহু দম্পতি ও তাদের ছেলেমেয়েরা থাকত সেখানে গৃহস্থালীর ব্যবস্থা স্ত্রীলোকদের উপর ন্যস্ত ছিল, – এই কাজটি পুরুষের খাদ্য আহরণের মতোই একটা সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় বৃত্তি বলে গণ্য করা হতো। পিতৃপ্রধান পরিবার আসার সঙ্গে অবস্থা বদলে গেল এবং আরও বেশি বদলাল একপতিপত্নী স্বতন্ত্র পরিবার আসার ফলে। গৃহস্থালীর কাজকর্মের সামাজিক বৈশিষ্ট্য চলে গেল। এটি আর সমাজের দেখবার বিষয় রইল না, এটি হয়ে দাঁড়াল ব্যক্তিগত সেবা। সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত হয়ে স্ত্রী-ই হলো প্রথম ঘরোয়া ঝি। কেবলমাত্র আধুনিক বৃহৎ শিল্পই আবার তাদের সামনে সামাজিক উৎপাদনে প্রবেশের দরজা খুলে দিয়েছে, অবশ্য কেবলমাত্র প্রলেতারীয় স্ত্রীলোকদের জন্যই। কিন্তু সেটা করেছে এরকমভাবে যে, যখন সে নিজের পরিবারের ব্যক্তিগত সেবার কর্তব্য পালন করে তখন সে সামাজিক উৎপাদনের বাইরে পড়ে যায় এবং কোন কিছু উপার্জন করে না; এবং যখন সে সামাজিক পরিশ্রমে অংশ নিয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করতে চায় তখন আর সে পারিবারিক কর্তব্য পালন করতে পারে না। কারখানার স্ত্রীলোকের পক্ষে যা প্রযোজ্য তা অন্য সব পেশা এমনকি চিকিৎসা ও আইনের পেশাতেও প্রযোজ্য। আধুনিক ব্যক্তিগত পরিবার স্ত্রীলোকের প্রকাশ্য অথবা গোপন গার্হস্থ্য দাসত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং বর্তমান সমাজ হচ্ছে এইসব ব্যক্তিগত পরিবারের অণুর সমষ্টি। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে বিত্তবান শ্রেণীগুলির মধ্যে পুরুষই হচ্ছে উপার্জনকারী, পরিবারের ভরণপোষণের কর্তা এবং এইজন্যই তার আধিপত্য দেখা দেয়, যার জন্য কোন বিশেষ আইনগত সুবিধা দরকার পড়ে না। পরিবারের মধ্যে সে হচ্ছে বুর্জোয়া; স্ত্রী হচ্ছে প্রলেতারিয়েত। কিন্তু শিল্পজগতে যে অর্থনৈতিক শোষণ প্রলেতারিয়েতকে পিষে ধরে তার বিশেষ প্রকৃতি সমগ্র তীক্ষ্ণতায় তখনই ফুটে ওঠে যখন পুঁজিপতি শ্রেণীর আইনগত সমস্ত বিশেষ সুবিধা দূর হয়েছে এবং আইনের চক্ষে উভয় শ্রেণীর সম্পূর্ণ সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র উভয় শ্রেণীর বিরোধ লোপ করে না; পরন্তু সে বিরোধ লড়ে শেষ করার ক্ষেত্র জোগায়। ঠিক একইভাবে আধুনিক পরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোকের ওপর স্বামীর আধিপত্যের বিশেষ চরিত্রে এবং উভয়ের মধ্যে সত্যকার সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ও পদ্ধতি তখনই পুরো ফুটে উঠবে যখন আইনের চক্ষে উভয়ের অধিকার সমান বলে স্বীকৃত হচ্ছে। তখন একথা স্পষ্ট হবে যে, সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে গোটা স্ত্রীজাতিকে আবার নিয়ে আসাই হচ্ছে তাদের মুক্তির প্রথম শর্ত; এবং এর জন্যই আবার দরকার হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক একক হিসাবে ব্যক্তিগত পরিবারের যে গুণটি রয়েছে তার বিলোপ।

* * *

আমরা তাহলে বিবাহের তিনটি মূল রূপ দেখতে পাচ্ছি – এগুলি মনুষ্যজাতির ক্রমবিকাশের তিনটি মূল স্তরের সঙ্গে মোটামুটি মেলে। বন্যাবস্থায় সমষ্টি-বিবাহ, বর্বরযুগে জোড়বাঁধা বিবাহ, সভ্যতার যুগে একপতিপত্নী সম্পর্ক, তার সঙ্গে ব্যভিচার ও গণিকাবৃত্তির অনুপূরণ। বর্বরতার উচ্চতন স্তরে জোড়বাঁধা বিবাহ ও একপতিপত্নী সম্পর্কের মাঝামাঝি ঢুকে আছে ক্রীতদাসীদের উপর পুরুষের কর্তৃত্ব এবং বহুপত্নী প্রথা।

আমাদের সমগ্র বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, এই পর্যায়ক্রমে অগ্রগতি জড়িয়ে আছে এই একটা অদ্ভুত ব্যাপারের সঙ্গে যে, নারীরাই ক্রমে সমষ্টি-বিবাহের যৌন স্বাধীনতা হারাচ্ছে, পুরুষরা নয়। বস্তুতঃ পুরুষদের জন্য আজও সমষ্টি-বিবাহ থেকে গিয়েছে। নারীর পক্ষে যা একটা অপরাধ এবং যার জন্য আইন ও সামাজিক বিচারে কঠোর সাজা পেতে হয়, পুরুষের বেলায় সেটা একটা সম্মানের ব্যাপার, বড়জোর সেটা সানন্দে বহন করার মতো একটু নৈতিক কলঙ্ক। অতীতকালের প্রথাগত হেটায়ারিজম যতই আমাদের যুগের পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদন প্রণালীর ফলে বদলে যায় ও তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া হতে থাকে, এবং যতই এটি নগ্ন পতিতাবৃত্তির রূপ নেয়, এর নৈতিক ফল ততোই খারাপ হয়। এবং এতে নারীর চেয়ে পুরুষের অধঃপতন হয় বেশি। নারীদের মধ্যে যে দুর্ভাগারা এর শিকার হতে বাধ্য হয় কেবল তাদেরই অধঃপতন ঘটে এবং তারাও সকলে যতটা সাধারণত মনে করা হয় ততোঁ অধঃপাতে যায় না। অপরপক্ষে এতে গোটা পুরুষজাতির নৈতিক অধঃপতন ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দশটার মধ্যে নয়টি ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী পূর্বরাগ হয়ে পড়ে কার্যতঃ বিবাহিত জীবনে বিশ্বাসহানির হাতে একটা প্রস্তুতিমূলক পাঠ।

আমরা এমন একটি সমাজ বিপ্লবের দিকে এগোচ্ছি যখন বর্তমানের একপতিপত্নী প্রথার অর্থনৈতিক ভিত্তি তেমন নিশ্চিতই লোপ পাবে, যেমন লোপ পাবে তার অনুপূরণ পতিতাবৃত্তির অর্থনৈতিক ভিত্তি। একই ব্যক্তির, মানে এক পুরুষের অধিকারে প্রচুর সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ফলে এবং অপর কাউকে নয়, কেবলমাত্র সে পুরুষের নিজের সন্তানসন্ততিকেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিয়ে যাবার ইচ্ছা থেকেই এই একপতিপত্নী প্রথা আসে। এইজন্যই নারীর পক্ষেই একপতিত্ব বাধ্যতামূলক, পুরুষের জন্য নয়। অতএব স্ত্রীলোকদের একপতিত্বে পুরুষদের গোপন বা প্রকাশ্য বহুপত্নীত্ব বাধেনি।

উত্তরাধিকারযোগ্য স্থায়ী সম্পদের অন্ততপক্ষে বেশির ভাগ অংশকে – উৎপাদনের উপায়কে – সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করে আসন্ন সমাজ-বিপ্লব কিন্তু উত্তরাধিকারের এইসব দুশ্চিন্তাকে সর্বনিম্নে নামিয়ে আনবে। যেহেতু একপতিপত্নী প্রথা অর্থনৈতিক কারণ থেকে জন্মেছে, তাই সেসব কারণ চলে গেলে কী এটিও লোপ পাবে?

এর উত্তরে যৌক্তিকতার সঙ্গেই বলা চলে : এই প্রথা লোপ না পেয়ে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবেই। কারণ উৎপাদনের উপায়গুলি সমাজের সম্পত্তি হওয়ার ফলে মজুরিশ্রম, প্রলেতারিয়েত লোপ পায় এবং সেই সঙ্গে সমাজের কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোকের (সংখ্যাগতভাবে যা গণন যোগ্য) পক্ষে অর্থের জন্য আত্মদানের আবশ্যকতাও লোপ পাবে। পতিতাবৃত্তি লোপ পাবে এবং একপতিপত্নী প্রথা ক্ষয় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বাস্তব হবে – সেটা পুরুষদের পক্ষেও।

মোটের উপর, পুরুষদের অবস্থা এইভাবে যথেষ্ট পরিমাণে বদলে যাবে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রেও, সমস্ত নারীর ক্ষেত্রেও অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটবে। উৎপাদনের উপায় সমাজের সম্পত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগত পরিবারগুলি আর সমাজের অর্থনীতির একক (Unit) থাকবে না। ব্যক্তিগত গৃহস্থালী পরিণত হবে সামাজিক শিল্পে। শিশুর পরিচর্যা ও শিক্ষা হয়ে উঠবে সামাজিক ব্যাপার, বিবাহবন্ধনের মারফত অথবা তার বাইরে, শিশু যেভাবেই জন্মাক না কেন, সমাজ তাদের সকলের দায়িত্ব নেবে। এইজন্যই 'ভবিষ্যৎ ফলাফলের' দুশ্চিন্তা নীতিগত ও অর্থনৈতিক উভয়দিক থেকে যেটি আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কারণ – যেজন্য একটি মেয়ে যাকে ভালবাসে সেই পুরুষের কাছে অবাধে আত্মসমর্পণ করতে পারে না – সেই কারণ আর থাকবে না। এটা কি অধিকতর অবাধ যৌন সঙ্গমের ক্রমিক উদ্ভব ঘটাবার মতো এবং সেই সঙ্গে কৌমার্যের মর্যাদা ও স্ত্রীলোকের লজ্জাশরম সম্বন্ধে আরো শিথিল একটা জনমত উদ্ভবের মতো কারণ ঘটাবে না কি? এবং সর্বশেষে বর্তমান জগতে একপতিপত্নী প্রথা ও পতিতাবৃত্তি সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও তারা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বিপরীত, একই সামাজিক অবস্থার দুটি মেরু – এটা কি আমরা দেখিনি? তাই একপতিপত্নী প্রথাকেও বিলুপ্ত না করে কি গণিকাবৃত্তি লোপ পেতে পারে?

এখানে একটি নতুন জিনিস কার্যকরী হতে থাকবে, এমন একটি জিনিস যা একপতিপত্নী প্রথার সূচনার সময় বড়জোর ভ্রূণ আকারে ছিল, যথা, ব্যক্তিগত যৌন প্রেম।

মধ্যযুগের আগে ব্যক্তিগত যৌন প্রেম বলে কোনো জিনিস ছিল না। একথা স্পষ্ট যে, ব্যক্তিগত সৌন্দর্য, অন্তরঙ্গ সাহচর্য, সমধর্মী প্রবণতা ইত্যাদি অবশ্য তখনও নর-নারীর মধ্যে যৌন সম্পর্কের কামনা জাগাত এবং তখনও এই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক কার সঙ্গে পাতাচ্ছে সে বিষয়ে নর ও নারী একেবারে নির্বিকার থাকত না। কিন্তু একালের যৌন প্রেম থেকে এটির অনেক পার্থক্য। প্রাচীন যুগে সর্বদা মাতাপিতাই বিবাহ স্থির করতেন; পাত্রপাত্রীরা নীরবে মেনে নিত। প্রাচীনকালে যেটুকু দাম্পত্য প্রেম জানা ছিল সেটা মোটেই একটা মানসিক প্রবৃত্তি ছিল না। ছিল একটা বাস্তব কর্তব্য, সেটা বিয়ের কারণ নয়, বিয়ের আনুষঙ্গিক। প্রাচীনকালে আধুনিক অর্থে প্রেম যদি হয়ে থাকে তাহলে

সরকারী সমাজের গন্ডীর বাইরেই তা হয়েছে। যে মেষপালকদের ভালোবাসার সুখ ও দুঃখের গান থিওক্রিটাস ও মোসাস রচনা করেছেন অথবা লঙ্গোসের রচনার 'ড্যাফনিস ও ক্লোয়ে', – এরা নিতান্তই ক্রীতদাস যারা রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নিতে পারত না, যেটা ছিল স্বাধীন নাগরিকদের এলাকা। গোলাম ছাড়া প্রেমের সম্পর্ক যা পাওয়া যেত, তা হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীন জগতের ভাঙ্গনের ফলস্বরূপ; সে প্রেম হতো যে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তারা ছিল প্রচলিত সমাজের বহির্ভূত– হেটায়ার অর্থাৎ বিদেশিনী বা মুক্তিপ্রাপ্তা নারী : এথেন্সে অবনতির প্রাক্কালে এবং রোমে সাম্রাজ্যের সময়ে। যদি কখনও স্বাধীন নাগরিক নরনারীর মধ্যে প্রেম সম্পর্ক হতো, তো সেটা কেবল ব্যভিচার হিসাবেই। আর আমাদের যুগের অর্থে যৌন প্রেম প্রাচীনকালের ক্লাসিকাল প্রেমের কবি এনাক্রিয়নের কাছে এতই অবাস্তব ছিল যে, তাঁর প্রিয় পাত্রটি স্ত্রী কিংবা পুরুষ তাতে তাঁর একেবারে কিছুই এসে যেত না।

প্রাচীন যুগের সহজ যৌন কামনা বা eros থেকে আমাদের যৌন প্রেমের বহু পার্থক্য আছে। প্রথমত, এতে প্রেমিকদের মধ্যে পরস্পর ভালোবাসা ধরে নেওয়া হয়; এই বিষয়ে নারী পুরুষের সমাধিকারী; কিন্তু প্রাচীনকালের eros -র ব্যাপারে সর্বদাই স্ত্রীলোকের মতামত নেওয়া হতো মোটেই এমন নয়। দ্বিতীয়ত, যৌন প্রেম এমন মাত্রার তীব্রতা এবং স্থায়ীত্ব জানে যে, প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে না পাওয়াকে অথবা বিচ্ছেদকে সর্বাধিক না হলেও বৃহৎ দুর্ভাগ্য বলে মনে করে; পরস্পরকে পাবার জন্য তারা বড় বড় বিপদের সম্মুখীন হয়, এমনকি জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে, প্রাচীনকালে যে ব্যাপারটি ঘটে বড়ো জোর কেবল ব্যভিচারের ক্ষেত্রে। সবশেষে যৌন সঙ্গমের ব্যাপারে এক নতুন নৈতিক মানদন্ড এসে যায় : এখন মূল প্রশ্ন এই নয় যে, এই সম্পর্ক বৈধ বা অবৈধ, এই প্রশ্নও ওঠে যে, সেটা পরস্পর ভালোবাসা থেকে নাকি নয়। বলা বাহুল্য যে, সামন্ত অথবা বুর্জোয়া আচরণে অন্য সব নৈতিক মানদন্ডের চেয়ে এর অবস্থা বেশি সুবিধার নয়, – একে স্রেফ উপেক্ষা করা হয়। তবে অন্য মানদন্ডের চেয়ে খারাপ বলেও মনে করা হয় না : অপরগুলির মতো একেও তত্ত্ব হিসাবে কাগজে কলমে মেনে নেওয়া হয় এবং বর্তমানে এর চেয়ে বেশি আশা করা যায় না।

যৌনপ্রেমের যে সূচনাতেই প্রাচীন যুগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, মধ্য যুগ সেখান থেকেই, অর্থাৎ ব্যভিচার থেকেই শুরু করল। আমরা ইতিপূর্বেই শিভালরি প্রেমের বর্ণনা দিয়েছি যা থেকে প্রভাত সঙ্গীতের উৎপত্তি। এই যে প্রেমের লক্ষ্য ছিল বিবাহবন্ধন ভাঙা আর যে প্রেম হবে বিবাহবন্ধনের ভিত্তিস্থানীয়, এই দুয়ের মধ্যে তখনো দুস্তর ব্যবধান থেকে গেছে। শিভালরির যুগে এই ব্যবধান সম্পূর্ণভাবে কাটানো যায়নি। এমনকি যখন আমরা লঘুচরিত্র ল্যাটিন জাতি ছেড়ে ধর্মপ্রাণ জার্মানদের দিকে তাকাই তাহলে নিবেলুঙ্গের গানে আমরা দেখতে পাই, – যে, ক্রিমহিল্ড ও জিগফ্রিড উভয় উভয়কে গোপনে কেউ কেউকে একচুল কম ভালোবাসত না, তবু গুন্থার যখন একজন অনামিত নাইটকে তার জন্য বাগদান করেছেন জানালেন, তখন জবাবে ক্রিমহিল্ড শুধু বলল, 'আমাকে জিজ্ঞাসা করবার কোনো দরকার নেই। আপনি যা আদেশ করবেন, আমি তাই করব। হে প্রভু, আপনি যাকেই আমার স্বামী মনোনীত করবেন আমি তাকেই বরণ করব।' এ কথা তার

মনে কখনই স্থান পায়নি যে, এই ব্যাপারে তার প্রেম কোনো রূপে বিবেচ্য হতে পারে। গুস্থার আগে কখনো না দেখেও ব্রুনহিল্ডের পাণিপ্রার্থনা করলেন আর এট্‌জেলও তাই করলেন ক্রিমহিল্ডের ক্ষেত্রে। 'গুড্‌রুন' এ এই একই ব্যাপার দেখা যায়, এতে আয়র্ল্যান্ডের সিগেবান্ট নরওয়ের উটৈর পাণি প্রার্থনা করছেন, হেগেলিংগেনের হেটেল হচ্ছেন আয়ার্ল্যান্ডের হিলডের বিবাহপ্রার্থী; এবং সবশেষে মোর্লান্ডের জিগফ্রিড, অর্মানের হার্টমুট এবং জিল্যান্ডের হেরুইং গুড্‌রুনের পাণিপ্রার্থনা করলেন এবং এখানেই সর্বপ্রথম দেখা গেল যে, গুড্‌রুন স্বেচ্ছা শেষোক্তের পক্ষেই মত দিলেন। তরুণ রাজপুত্রের পিতামাতা পাত্রী ঠিক করবেন, এই ছিল নিয়ম; এঁদের অবর্তমানে পাত্র অধীনস্থ উচ্চতম সর্দারদের পরামর্শ নিতেন এবং সর্বদাই তাঁদের কথা যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হতো। অন্য কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, নাইট অথবা ব্যারনের পক্ষে, যেমন স্বয়ং রাজপুত্রের পক্ষেও বিবাহ ছিল একটি রাজনৈতিক কাজ, নতুন বিবাহসম্পর্ক মারফত শক্তিবৃদ্ধির একটি সুযোগ। এতে নির্ধারক ব্যাপার ছিল বংশের স্বার্থ, ব্যক্তিগত প্রবণতা নয়। এখানে প্রেমের দাবিই বিবাহের সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত হবে এমন আশা কি করা যায়?

মধ্যযুগের নগরগুলিতে গিল্ড শিল্পপতিদের মধ্যেও এই একই জিনিস দেখা যায়। তার রক্ষাকল্পে যে বিশেষ অধিকার রয়েছে, বিশেষ বিশেষ শর্তসহ গিল্ড সনদ, যেসব কৃত্রিম বিধান দিয়ে অন্যান্য গিল্ড থেকে, সহযোগী গিল্ড শিল্পপতিদের থেকে, এর নিজের এ্যাপ্রেন্টিস ও মজুরদের থেকে পৃথক থাকত, তাতে যোগ্য পাত্রী সংগ্রহের ক্ষেত্র তার হতো অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই জটিল ব্যবস্থার অধীনে কে উপযুক্ত পাত্রী সেটা নিশ্চয় স্থির হতে ব্যক্তিগত পছন্দ দিয়ে নয়, পরন্তু পরিবারের স্বার্থ দিয়ে।

অতএব মধ্য যুগের শেষ পর্যন্ত সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষেত্রেই বিবাহ থেকে গিয়েছিল ঠিক তাই, যা ছিল তার প্রারম্ভিক যুগে : এমন একটি ব্যাপার যা প্রধান দুটি পক্ষ স্থির করছে না, প্রথমে লোকে ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহিত হয়ে যেত বিপরীত লিঙ্গের গোটা সমষ্টির সঙ্গে। সমষ্টি-বিবাহের পরবর্তী ধাপগুলিতে বিবাহের পরিধি ক্রমশ ছোট হয়ে এলেও সম্পর্কটা সম্ভবতঃ আগের মতোই ছিল। জোড়বাঁধা বিবাহে মায়েরাই সাধারণত ছেলেমেয়েদের বিয়ে ঠিক করত এবং এখানেও গোত্র সংগঠনে ও উপজাতির মধ্যে কী ধরনের নতুন কুটুম্বিতা সূত্রে দম্পতির প্রতিপত্তি বাড়বে সেই বিচারই ছিল নির্ধারক। এবং পরে যখন সাধারণ সম্পত্তির তুলনায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রাধান্য এবং উত্তরাধিকারের স্বার্থে পিতৃ-অধিকার ও একপতিপত্নী প্রথা প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন বিবাহ সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। ক্রয় করে বিবাহের প্রথা লোপ পেল, কিন্তু এই বেচাকেনা ব্যাপারটাই ক্রমশই বেশি করে এমনভাবে চলল, যাতে শুধু মেয়েদের নয় পুরুষেরও মূল্য যাচাই করা হতো ব্যক্তিগত গুণ দিয়ে নয়, সম্পত্তি দিয়ে। পাত্রপাত্রীর পরস্পর আকর্ষণকে বিবাহের চূড়ান্ত যুক্তি গণ্য করা শুরু থেকেই শাসক শ্রেণীগুলির ব্যবহারের মধ্যে কখনও শোনা যায়নি। এরকম ঘটনা ঘটতো বড়জোর প্রেমের কাহিনীতে অথবা নিপীড়িত শ্রেণীগুলির মধ্যে, যেটা ধর্তব্য নয়।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের সূচনায় এই ছিল অবস্থা, যখন ভৌগোলিক আবিষ্কারের

যুগের পর পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য ও কারখানা-শিল্প মারফত পৃথিবী জয়ে তা প্রবৃত্ত হলো। মনে হতে পারে যে, উপরোক্ত ধরনের বিবাহই ছিল এর পক্ষে খুব উপযোগী, কার্যতঃও তাই হলো। তবুও বিশ্ব ইতিহাসের বিদ্রূপ অফুরন্ত, পুঁজিবাদী উৎপাদনের ফলেই এই প্রথায় চূড়ান্ত ভাঙন ঘটল। সমস্ত জিনিসকে পণ্যে পরিণত করে এই পদ্ধতি পুরনো ঐতিহ্যগত সব সম্পর্ক ভেঙে দিল এবং বংশানুক্রমিক প্রথা ও ঐতিহাসিক অধিকারের জায়গায় আনল কেনাবেচা, 'স্বাধীন' চুক্তি। ইংরেজ আইনবিদ হেনরি মেইন ভেবেছিলেন, তিনি একথা বলে এক বিরাট আবিষ্কার করে ফেলেছেন যে, আগেকার যুগগুলি থেকে আমাদের সমগ্র অগ্রগতি হচ্ছে এই যে, আমরা এসেছি from status to contract, বংশানুক্রমিক একটা অবস্থা থেকে স্বেচ্ছামূলক চুক্তিতে। প্রসঙ্গতঃ, এই উক্তির মধ্যে যতটুকু নির্ভুল, তা অনেক আগেই 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারে' দেওয়া হয়েছিল।

চুক্তিবদ্ধ হতে হলে চাই এমন সব লোক যারা নিজেদের দেহ, কাজ ও সম্পত্তিকে স্বাধীনভাবে লেনদেন করতে পারে এবং যারা সমান শর্তে পরস্পরের সম্মুখীন হচ্ছে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কাজই হলো ঠিক এইরকম 'স্বাধীন' ও 'সমাধিকারী' লোক সৃষ্টি করা। যদিও গোড়ার দিকে এই কাজ অর্ধচেতনভাবে এবং তদুপরি ধর্মের আবরণে হয়েছে, তবুও লুথার ও কালভাঁ-এর 'ধর্মসংস্কার আন্দোলনের' (রিফরমেশন) সময় থেকেই এটি একটি বদ্ধমূল নীতি দাঁড়িয়েছে যে, মানুষ তখনই কেবল তার কাজের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী যখন সে কাজ করার সময় তার ইচ্ছার পূর্ণ স্বাধীনতা থেকেছে এবং অনৈতিক কর্মের জন্য সর্ববিধ বাধ্যতা প্রতিরোধ করাই হলো নৈতিক কর্তব্য। কিন্তু এই ব্যাপারের সঙ্গে ইতিপূর্বে প্রচলিত বিবাহপ্রথা মেলে কী করে? বুর্জোয়া ধারণা অনুযায়ী বিবাহ হচ্ছে একটি চুক্তি, একটি আইনগত ব্যাপার, তদুপরি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি, কারণ এতে দুটি মানুষের শরীর ও মন সারা জীবনের জন্য বিকিয়ে যাচ্ছে। খুব সত্য যে, কাগজে কলমে তখন এই চুক্তি স্বেচ্ছামূলকভাবেই হয়; পাত্রপাত্রীর সম্মতি ছাড়া এই কাজ হয় না, কিন্তু সকলেই জানেন, কী করে সে সম্মতি আদায় করা হয় এবং আসলে কারা এ বিবাহ ঘটায়। অথচ অপর সব চুক্তির ক্ষেত্রে যখন সিদ্ধান্তের সত্যিকার স্বাধীনতা দাবি করা হচ্ছে তখন এক্ষেত্রে কেন তা হবে না? যে দুজন তরুণ তরুণী জুড়ি বাঁধতে যাচ্ছে, নিজেদের দেহ ও দেহাংশের স্বাধীন বিলিবন্দোবস্তের অধিকার নেই কি তাদের ? শিভালরির দরুন কি যৌন প্রেম ফ্যালন হয়ে ওঠেনি এবং নাইটদের ব্যভিচারী প্রেমের বিপরীতে স্বামীস্ত্রীর ভালোবাসা কি তার সঠিক বুর্জোয়া রূপ নয়? কিন্তু বিবাহিতদের কর্তব্য যদি হয় পরস্পরের প্রতি প্রেম, তাহলে আর কাউকে নয় পরস্পরকেই বিবাহ করা কি প্রেমিকদের কর্তব্য দাঁড়ায় না ? প্রেমিক প্রেমিকার এই অধিকার কি বাপমা, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি চিরাচরিত সব ঘটকঘটকীদের চেয়ে অগ্রগণ্য নয়? যদি গির্জা ও ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের অধিকার বেপরোয়া ঢুকে পড়ে থাকে, তাহলে তরুণ পুরুষদের দেহমন অর্থসম্পত্তি সুখদুঃখ বিলিবন্দোবস্ত করবার ব্যাপারে বয়োজ্যেষ্ঠদের অসহ্য দাবির সামনেই তা বা চুপ করবে কেন?

যে যুগ সমস্ত পুরনো সামাজিক বন্ধন শিথিল করে দিয়েছিল এবং সমস্ত চিরাচরিত

প্রত্যয়ের ভিত্তি নড়িয়ে দিয়েছিল, সেই যুগে এইসব প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। এক ধাক্কায় দুনিয়ার পরিধি প্রায় দশগুণ বেড়ে গেল। একটি গোলার্ধের এক চতুর্থাংশের জায়গায় পশ্চিম ইউরোপের লোকদের কাছে গোটা পৃথিবীই উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং এই বাকি সাত-চতুর্থাংশ ভাগ দখলের জন্য তাদের মধ্যে তাড়াহুড়া পড়ে গেল। জন্মভূমির সাবেকী সঙ্কীর্ণ গণ্ডী যেভাবে ভাঙল ঠিক সেইভাবেই মধ্যযুগের নির্দিষ্ট চিন্তাপ্রণালীর আরোপিত হাজার বছরের পুরানো সব প্রতিবন্ধও গেল। মানুষের অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টির সামনে একটি অসীম বিস্তারের দিগন্ত খুলে গেল। যে তরুণকে প্রলুব্ধ করেছে ভারতের দৌলত এবং মেক্সিকো ও পতোজির সোনারূপার খনি তার কাছে সাবেকী সম্ভ্রমের শুভেচ্ছা এবং বংশানুক্রমে পাওয়া সম্মানীয় গিল্ড অধিকারের দাম কতটুকু? এটি ছিল বুর্জোয়াদের ভ্রাম্যমাণ নাইটবৃত্তির যুগ; এরও ছিল নিজস্ব রোমান্স এবং নিজস্ব প্রণয়ের স্বপ্ন, কিন্তু তা হচ্ছে বুর্জোয়া ভিত্তিতে এবং শেষবিচারে, বুর্জোয়া লক্ষ্যেরই অনুসরণে।

দেখা গেল, বিশেষতঃ প্রটেস্টান্ট দেশগুলিতে যেখানে চলতি সমাজব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি নাড়া খেয়েছিল সেখানে উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী ক্রমেই বিবাহের ক্ষেত্রেও চুক্তির স্বাধীনতা মেনে নিল এবং উল্লিখিতভাবে তা চালু করল। বিবাহ এখন শ্রেণী বিবাহই রয়ে গেল, কিন্তু শ্রেণীর চৌহদ্দির মধ্যে পাত্রপাত্রীরা বাছাই করবার কিছুটা স্বাধীনতা পেল। এবং কাগজে, কলমে, নীতিতত্ত্বে ও কাব্যের বিবরণে প্রত্যেকটি বিবাহ পরস্পরের যৌন প্রেমের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে এবং তার পিছনে স্ত্রী পুরুষের সত্যিকার স্বাধীন সম্মতি না থাকলে, বিবাহ নীতিহীন বলে যতটা অটলভাবে প্রমাণিত হলো তেমন আর কিছু নয়। সংক্ষেপে, প্রেম করে বিবাহ ঘোষিত হলো মানবীয় অধিকার বলে, শুধু পুরুষের অধিকার নয় (droit de l'homme) পরন্তু, ব্যতিক্রম হিসাবে স্ত্রীলোকেরও অধিকার (droit de la femme)।

কিন্তু এক বিষয়ে এই মানবীয় অধিকারের সঙ্গে অন্য সব তথাকথিত মানবীয় অধিকারের পার্থক্য ছিল। কার্যত শেষোক্ত অধিকারগুলি রইল শাসকশ্রেণী বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, নিপীড়িত শ্রেণী প্রলেতারিয়েত ছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত, কিন্তু এইখানে ইতিহাসের পরিহাস ফের দেখা যায়। শাসকশ্রেণী পরিচিত অর্থনৈতিক প্রভাবের অধীনেই রইল এবং সেজন্য কিছু কিছু ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রেই কেবল তাদের মধ্যে যথার্থ স্বেচ্ছামূলক বিবাহ দেখা যায়, অপরপক্ষে আমরা আগেই দেখেছি যে, নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে স্বেচ্ছামূলক বিবাহই হচ্ছে নিয়ম।

এইভাবে আমরা দেখি যে, বিবাহের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা সাধারণভাবে তখনই কার্যকরী হতে পারে, যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং তারই সৃষ্টি করা মালিকানা সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়ে সেইসব গৌণ অর্থনৈতিক হিসাবকে হটিয়ে দেয়, যেগুলি বিবাহের সঙ্গী নির্বাচনের উপর এত প্রভাব বিস্তার করে। তখন পরস্পর আকর্ষণ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকবে না।

যেহেতু যৌন প্রেম প্রকৃতিগতভাবেই একবদ্ধ – যদিও বর্তমানে কেবল স্ত্রীলোকের বেলাতেই এই একবদ্ধতা পূর্ণমাত্রায় রূপায়িত হয় – সেইজন্য যৌন প্রেমের ভিত্তিতে বিবাহ হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবেই একপতিপত্নী প্রথা। আমরা আগেই দেখেছি যে,

বাখোফেন যখন সমষ্টি-বিবাহ থেকে একবিবাহে অগ্রগতিকে প্রধানতঃ স্ত্রীলোকদের কীর্তি বলেছিলেন তখন তিনি কত সঠিক ছিলেন; জোড়বাঁধা বিবাহ থেকে একপতিপত্নী প্রথায় অগ্রগতিকেই কেবল পুরুষের কাজ বলা যায় এবং ঐতিহাসিকভাবে এতে বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটেছে এবং পুরুষের ক্ষেত্রে বিশ্বাসহানির সুযোগ বেড়েছে। তাই যে সমস্ত অর্থনৈতিক কারণের জন্য স্ত্রীলোকেরা পুরুষের নিত্যকার বিশ্বাসহানি সহ্য করতে বাধ্য হতো, – নিজেদের জীবনযাত্রা নিয়ে এবং তার চেয়ে বেশি সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ – তার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীলোকের যে সমতা অর্জিত হবে তার ফলে অতীত সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, স্ত্রীলোক বহুগামিনী না হয়ে বরং পুরুষই আরও কার্যকরীভাবে সত্যই একপত্নীব্রতই হবে।

কিন্তু একপতিপত্নী প্রথা থেকে যা নিশ্চিতই চলে যাবে তা হচ্ছে পুরানো মালিকানা প্রথা থেকে এ বিবাহ উদ্ভূত হওয়ায় তার উপর যেসব বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল সেগুলি যথা, প্রথমত, পুরুষের আধিপত্য এবং দ্বিতীয়ত, বিবাহ বন্ধনের অচ্ছেদ্য বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্য হচ্ছে তার আর্থিক আধিপত্যের প্রত্যক্ষ ফল এবং এ আর্থিক আধিপত্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি তা লোপ পাবে বিবাহবন্ধনের অচ্ছেদ্যতা অংশত এসেছে সেই অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে যার মধ্যে একপতিপত্নী প্রথার উদ্ভব এবং অংশত এমন একটি যুগের রীতি থেকে যখন এইসব অর্থনৈতিক অবস্থা ও একপতিপত্নী প্রথার যোগাযোগ সঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যায়নি এবং ধর্মে তা অতিরঞ্জিত হয়ে উঠত। বর্তমানেও বিবাহবন্ধন হাজারো গুণ লঙ্ঘিত। যদি কেবলমাত্র প্রেমের ভিত্তিতে বিবাহই নীতিসিদ্ধ হয়, তাহলে বিবাহ তখনই নীতিসিদ্ধ যতক্ষণ প্রেম থাকে। ব্যক্তিগত যৌন প্রেমের অনুভূতির স্থায়িত্ব কিন্তু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, বিশেষতঃ পুরুষদের মধ্যে খুবই বিভিন্ন হয়: তাই যখন একটি প্রেম একেবারে চলে যায় অথবা অপর একটি নতুন প্রেমাবেগ তার জায়গা নেয়, তখন স্বামী স্ত্রী উভয়ের পক্ষে এবং সমাজের পক্ষেও বিচ্ছেদ একটি আশীর্বাদ। বিবাহবিচ্ছেদ মামলার নিষ্প্রয়োজন কাদা মাড়িয়ে যাবার অভিজ্ঞতাটা শুধু আর সইতে হবে না।

অতএব আমরা এখানে পুঁজিবাদী উৎপাদনের আসন্ন বিলোপের পরে কীভাবে যৌন সম্পর্ক পরিচালিত হবে, সে বিষয়ে যে আন্দাজ করতে পারি সেটা প্রধানত নেতিমূলক চরিত্রের, কেবলমাত্র কী কী লোপ পাবে তাই নিয়ে তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু কোন্ কোন্ জিনিসের উদ্ভব হবে? সেটি দেখা যাবে নতুন পুরুষ গড়ে উঠবার পর, এমন সব পুরুষ যাদের কখনও পয়সা বা অন্য কোনো সামাজিক ক্ষমতা দিয়ে কোনো স্ত্রীলোককে খরিদ করার কারণ ঘটেনি, আর এমন সব নারী যারা সত্যিকার প্রেমের অনুভূতি ছাড়া আর কোনো কারণে পুরুষের কাছে আত্মদানে কখনো বাধ্য হয়নি, অথবা যাদের কোনো অর্থনৈতিক ফলাফলের ভয়ে প্রণয়পাত্রের কাছে আত্মদানে বিরত হতে হয়নি। এই ধরনের সব লোক একবার আবির্ভূত হলে আজ আমরা তাদের করণীয় বলে কী ভাবি সে নিয়ে তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না। তখন তারা চালু করবে নিজেদের আচার এবং ব্যক্তি আচরণ বিষয়ে নিজেদের সামাজিক মত, যা তার সঙ্গেই মিলবে, বাস।

এবার ফেরা যাক মর্গানের রচনায় যেখান থেকে আমরা অনেকটা সরে এসেছি।

সভ্যতার যুগে যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে সেগুলির ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ঐ রচনার গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না। কাজে কাজেই তিনি এই পর্বের একপতিপত্নী প্রথার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তিনিও একপতিপত্নী পরিবারের বিকাশকে একটা অগ্রগতি মনে করেছেন স্ত্রীপুরুষের পূর্ণ সমানাধিকারের কাছাকাছি, যদিও অবশ্য এই লক্ষ্যে পৌঁছান গেছে বলে তিনি মনে করেননি। কিন্তু তিনি লিখেছেন, 'যখন এই ব্যাপারটি মেনে নেওয়া হয় যে, পরিবার পর পর চারটি রূপের মধ্য দিয়ে গেছে এবং এখন পঞ্চম রূপ চলছে, তখন অমনি এই প্রশ্ন ওঠে যে, এই বর্তমান রূপ ভবিষ্যতে দীর্ঘস্থায়ী হবে কি না? এর একমাত্র এই উত্তর দেওয়া যায় যে, সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে এরও অগ্রগতি হবে এবং সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে এরও পরিবর্তন হবে, যেমনটি অতীতে ঘটেছে। এটি হলো সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি এবং তারই সংস্কৃতি প্রতিফলিত হবে এতে। সভ্যতার সূচনার পরে যখন একপতিপত্নী পরিবারের অনেক উন্নতি হয়েছে এবং বিশেষ করে আধুনিককালে, তখন এ কথা অন্তত অনুমান করা চলে যে, স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তা আরো উন্নতির সামর্থ্য রাখে। সুদূর ভবিষ্যতে যদি একপতিপত্নী পরিবার সমাজের প্রয়োজন পূরণের উপযোগী না হয়, তাহলে এর জায়গায় কী আসবে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না।'

৩
ইরকোয়াস গোত্র-সংগঠন

এবার আমি আসছি মর্গানের আর একটি আবিষ্কারে যেটি আত্মীয়তাবিধি থেকে পরিবারের প্রাগৈতিহাসিক রূপ পুনর্গঠনের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মর্গান প্রমাণ করেছেন যে, আমেরিকান ইন্ডিয়ান উপজাতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন পশু নামধারী আত্মীয়মণ্ডলীগুলি মূলতঃ গ্রীকদের genea এবং রোমকদের gentes থেকে অভিন্ন; আমেরিকার রূপটি হলো আদি রূপ এবং গ্রীক ও রোমকদের রূপগুলি হচ্ছে পরবর্তী ও তদদ্ভূত রূপ; গোত্র, ফ্রাত্রি, উপজাতিরূপে গ্রীক ও রোমকদের আদিকালের সমগ্র সমাজ সংগঠনের একটা নিখুঁত সমান্তরাল আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে দেখা যায়; সমস্ত বর্বরদের মধ্যে সভ্যতায় প্রবেশ করা অবধি এমন কি তারপরেও গোত্র প্রথা একটা সাধারণ প্রতিষ্ঠান (এইসময় পর্যন্ত যত তথ্য পাওয়া গিয়েছে তদনুযায়ী)। এইটে প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ও রোমক ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্বোধ্য অংশ এক লহমায় পরিষ্কার হয়ে যায়। একইসঙ্গে এই আবিষ্কারটি রাষ্ট্রের সূচনার পূর্ববর্তী প্রাচীন সমাজ সংগঠনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির উপর অপ্রত্যাশিতভাবে আলোকপাত করে। জানবার পরে এটা যতই সোজা মনে হোক না কেন, মর্গান কিন্তু খুব সম্প্রতি এটি আবিষ্কার করেন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর পূর্ববর্তী রচনায়[৩৬] এই গূঢ় তত্ত্ব তিনি ধরতে পারেননি যার আবিষ্কারে ইংরেজদের মতো সাধারণতঃ অতি আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন প্রাগৈতিহাসিক পণ্ডিতেরাও কিছুদিনের জন্য মূষিকের মতো চুপ হয়ে গিয়েছিলেন।

এই রক্তসম্পর্কযুক্ত আত্মীয়মণ্ডলীর জন্য মর্গান সাধারণ আখ্যা হিসাবে ল্যাটিন ভাষার gens শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এটি গ্রীক প্রতিশব্দ genos-এর মতোই এসেছে তাদের সাধারণ আর্য মূল gan থেকে (জার্মান ভাষায় আর্য ভাষার g-এর জায়গায় যেখানে সাধারণতঃ K ব্যবহৃত হয়, সেখানে এটি হয় (Kan), যার অর্থ হচ্ছে 'জনন'। Gens genos সংস্কৃত ভাষার 'জনস্' গথদের Kuni (পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী), প্রাচীন নর্ডিক ও অ্যাংলোস্যাক্সন kyn, ইংরেজি kin, মধ্য জার্মানির উচ্চভূমিতে kunne, এই সমস্ত শব্দগুলিই গোত্র ও উৎপত্তির দ্যোতক। কিন্তু ল্যাটিন শব্দ gens আর গ্রীক শব্দ genos এমন রক্তসম্পর্কযুক্ত আত্মীয়মণ্ডলীগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় যারা একই উৎপত্তির গর্ব করে (এই ক্ষেত্রে একই সাধারণ পূর্বপুরুষ) এবং কয়েকটি বিশিষ্ট সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মারফত এরা একত্র গ্রথিত হয়ে ওঠে একটা বিশেষ গোষ্ঠী

৩৬. L.H. Morgan, System of Consanquinity and Affinity of the Human Faminly, Washington, 1871.(এল. এইচ. মর্গান, 'মানব পরিবারের জ্ঞাতি ও আত্মীয়তা ব্যবস্থা', ১৮৭১।) – সম্পাঃ

হিসাবে, যদিও এতকাল পর্যন্ত আমাদের সমস্ত ঐতিহাসিকদের কাছে এর উৎপত্তি ও প্রকৃতি অস্পষ্ট ছিল।

পুনালুয়া পরিবারের সম্পর্কে পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি আদি রূপের একটা গোত্র সংগঠন কী রূপ। যে সমস্ত লোক পুনালুয়া বিবাহের ফলে এবং অনিবার্যভাবেই তথায় প্রাধান্যকারী ধারণা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট বিশিষ্ট মাতার গোত্র-প্রতিষ্ঠাত্রীর বংশধররূপে পরিগণিত, তাদের নিয়েই এ গোত্র ওঠে। এইরূপ পরিবারে পিতৃত্ব অনিশ্চিত বলে মাতৃধারাই একমাত্র প্রামাণ্য। যেহেতু ভাইয়েরা নিজেদের বোনদের বিবাহ করতে পারে না, পরন্তু অন্য বংশের মেয়েদের বিবাহ করতে হয়, সেইজন্য এই শেষোক্ত মেয়েদের ছেলেমেয়েরা মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী গোত্রের বাইরে পড়ে। অতএব প্রত্যেক পুরুষের শুধু কন্যাদের ছেলেমেয়েরাই আত্মীয়মণ্ডলীর মধ্যে থেকে যায় এবং ছেলেদের সন্তানসন্ততিরা তাদের মায়েদের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতএব একই উপজাতির মধ্যে, অনুরূপ ধরনের বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে এই যে রক্তসম্পর্কযুক্ত গোষ্ঠীটি পৃথক হয়ে যাচ্ছে তার রূপ তখন কী হয়?

মর্গান এই আদি গোত্রের চিরায়ত রূপ হিসাবে ইরকোয়াস গোত্র, বিশেষতঃ সেনেকা উপজাতির গোত্রকে ধরেছেন। এই উপজাতির মধ্যে আটটি গোত্র আছে, বিভিন্ন পশুর নাম অনুযায়ী তাদের নাম করা হয়েছে : (১) নেকড়ে, (২) ভালুক, (৩) কচ্ছপ, (৪) বীবর, (৫) হরিণ, (৬) স্নাইপ, (৭) বক, (৮) বাজপাখি। প্রত্যেকটি গোত্রে নিম্নলিখিত আচার প্রচলিত।

১। এরা নির্বাচিত করে একজন সাচেম্ (শান্তির সময়ে প্রধান ব্যক্তি) এবং একজন সর্দার (যুদ্ধের দলপতি)। গোত্রের ভেতর থেকেই সাচেমকে নির্বাচিত করতে হয় এবং তার পদ হচ্ছে গোত্রের মধ্যে বংশানুক্রমিক এই অর্থে যে, এই পদ শূন্য হলে তৎক্ষণাৎ তা পূরণ করতে হয়। যুদ্ধের দলপতি গোত্রের বাইরে থেকেও নির্বাচিত করা যায় এবং এই পদটি কখনো কখনো শূন্যও থাকতে পারে। পূর্ববর্তী সাচেমের ছেলে কখনো এই সাচেমের পদ পেতে পারে না, কারণ ইরকোয়াসদের মধ্যে মাতৃ-অধিকার প্রচলিত ছিল এবং সেইজন্য ছেলে অন্য গোত্রে পড়ত। কিন্তু ভাই অথবা ভাগিনেয় প্রায়ই নির্বাচিত হতো। পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই নির্বাচনে ভোট দিত, কিন্তু এই নির্বাচনকে অপর সাতটি গোত্রের কাছে অনুমোদিত হতে হতো এবং তখনই কেবল নির্বাচিত ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করা হতো। আবার সেটা হতো সমগ্র ইরকোয়াস উপজাতি সমামেলের সাধারণ পরিষদ দ্বারা। পরে এর তাৎপর্য বোঝা যাবে। গোত্রের মধ্যে সাচেমের কর্তৃত্ব ছিল পিতৃসুলভ ও নিছক নৈতিক ধরনের। জবরদস্তির কোনো উপকরণ তার হাতে থাকত না। নিজের পদমর্যাদার বলে সেইসঙ্গেই সে ছিল সেনেকা উপজাতীয় পরিষদের একজন সভ্য তথা ইরকোয়াস সমামেলের সাধারণ পরিষদেরও সভ্য। যুদ্ধের সর্দারি কেবলমাত্র যুদ্ধাভিযানের সময় হুকুম দিতে পারত।

২। গোত্র ইচ্ছামতো সাচেম ও সর্দারকে পদচ্যুত করতে পারে। এটাও স্ত্রী ও পুরুষেরা উভয়ে মিলিতভাবে স্থির করে। তারপরে পদচ্যুত ব্যক্তি অপর সকলের মতো সাধারণ যোদ্ধা ও সাধারণ ব্যক্তি বলে পরিগণিত হতো। উপজাতির পরিষদ গোত্রের

মতের বিরুদ্ধেও সাচেমকে পদচ্যুত করতে পারে।

৩। কোনো লোকই নিজের গোত্রের মধ্যে বিয়ে করতে পারে না। এইটাই হচ্ছে গোত্রের মূল নিয়ম, এই বন্ধন ধরে রাখে গোত্রকে; যে অতি ইতিবাচক রক্তসম্পর্কের জোরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে সত্য সত্যই গোত্র গড়ে তোলে, এটি তার নেতিবাচক প্রকাশ। মর্গান এই সহজ ব্যাপারটি আবিষ্কার করে সর্বপ্রথম গোত্রের প্রকৃতি প্রকাশ করলেন। তার আগে পর্যন্ত গোত্রের প্রকৃতি যে কত কম জানা ছিল, বন্য ও বর্বরদের সম্পর্কে ইতিপূর্বের বিবরণ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়; সেখানে গোত্র সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীকে অজ্ঞতার সঙ্গে নির্বিচারে উপজাতি, ক্লান, থাম্ (thum) প্রভৃতি বলা হয়েছে; এদের সম্পর্কে আবার কখনো কখনো বলা হয়েছে যে, এরকম গোষ্ঠীর ভিতরে বিবাহ নিষিদ্ধ। এতে এমন একটা অসম্ভব তালগোলের সৃষ্টি হয় যাতে ম্যাক-লেনান এসে হস্তক্ষেপ করে নেপোলিয়নের মতো শৃঙ্খলা আনলেন এই ফতোয়া দিয়ে : সমস্ত উপজাতি দুইভাগে বিভক্ত, একদলের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ (বর্হিবিবাহিক) এবং অন্য দলে নিজেদের মধ্যে বিবাহ চলে (অন্তর্বিবাহিক)। এইভাবে সমস্ত ব্যাপারটিকে একেবারে গুলিয়ে দিয়ে তাঁর এই দুটি আজব শ্রেণীর মধ্যে, বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহের মধ্যে কোনটি আগে ও কোনটি পরে তাই নিয়ে গভীর গবেষণায় মাততে পারলেন। এই অর্থহীন চেষ্টা রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গোত্র এবং সেইহেতু গোত্র সভ্যদের মধ্যে বিবাহের অসম্ভাব্যতা আবিষ্কারের পরে আপনাআপনি থেমে গেল। স্পষ্টতঃই ইরকোয়াসদের আমরা বিকাশের যে স্তরে দেখি, সেখানে গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষেধের নিয়ম অটলভাবে মানা হয়।

৪। মৃত ব্যক্তিদের সম্পত্তি গোত্রের বাকি সভ্যদের কাছে যেত – এই সম্পত্তি গোত্রের মধ্যেই থাকা চাই। যেহেতু একজন ইরকোয়াস তেমন বেশি কিছু রেখে যেতে পারত না, সেইজন্য এই উত্তরাধিকার গোত্রের নিকটতম আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ হতো; একজন পুরুষমানুষ মারা গেলে তা পেত সহোদর ভাইবোন ও নিজের মামারা; একজন স্ত্রীলোক মারা গেলে তা যেত তার নিজের ছেলেমেয়ে ও সহোদর বোনেদের কাছে, কিন্তু তার নিজের ভাইয়েদের কাছে নয়। ঠিক এই কারণেই স্বামী বা স্ত্রী একে অপরের সম্পত্তি পেতে পারত না এবং ছেলেমেয়েরা বাপের সম্পত্তি পেত না।

৫। গোত্রের সভ্যরা পরস্পরের সাহায্য ও রক্ষায় বাধ্য ছিল, বিশেষত বাইরের কেউ কোন ক্ষতি করলে তার প্রতিশোধের জন্য সাহায্য করতে হতো। নিজের নিরাপত্তার জন্য ব্যক্তি গোত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ওপর নির্ভর করত এবং করতে পারত; একটি ব্যক্তিকে আঘাত করলেই সমগ্র গোত্রকে আঘাত করা হতো। এর থেকে অর্থাৎ গোত্রের রক্তের বন্ধন থেকে এসেছে রক্তের বদলা নেবার দায়িত্ব; ইরকোয়াসরা শর্তহীনভাবে এটি মানত। গোত্রের বাইরের কেউ গোত্রের কোন সভ্যকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির গোটা গোত্র প্রতিশোধের শপথ নিত। প্রথমত মিটমাটের চেষ্টা হতো। হত্যাকারীর গোত্র পরিষদের অধিবেশন হতো এবং নিহত ব্যক্তির গোত্র পরিষদের কাছে ব্যাপারটি শান্তিতে মীমাংসার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হতো প্রধানতঃ দুঃখপ্রকাশ করে ও দামী জিনিস উপহার দিয়ে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে ব্যাপারটি সেইখানে মিটে যেত। অন্যথায় নিহত ব্যক্তির

গোত্রের এক বা একাধিক ব্যক্তির উপর প্রতিশোধের ভার দেওয়া হতো, তাদের কর্তব্য হতো হত্যাকারীর পিছনে লেগে থেকে তাকে হত্যা করা। এই কাজ সম্পন্ন হলে নিহত ব্যক্তির গোত্রের অভিযোগ করবার কোন অধিকার থাকত না; ধরে নেওয়া হতো যে, ব্যাপারটি চুকে গেল।

৬। গোত্রের একটি বা একসার নির্দিষ্ট নাম থাকে, যে নাম সমস্ত উপজাতির মধ্যে কেবলমাত্র এরাই ব্যবহার করতে পারে, যাতে করে একজন ব্যক্তির নাম থেকে বোঝা যায় সে কোন গোত্রের লোক। গোত্রের নামের সঙ্গে সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে গোত্রের অধিকারগুলিও জড়িত থাকে।

৭। গোত্র বিজাতীয়দেরও নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে এবং তার ফলে এই বিজাতীয়রা গোটা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হয়। যেসব যুদ্ধবন্দীদের মেরে ফেলা হতো না তাদের এভাবে কোনো গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করে সেনেকা উপজাতির সভ্য করা হতো এবং এর ফলে তারা উপজাতি ও গোত্রের পূর্ণ অধিকার পেত। গোত্রের ব্যক্তিগত সদস্যদের প্রস্তাবে এই লোকদের গ্রহণ করা হতো : পুরুষেরা বহিরাগতকে ভাই বা বোন বলে গ্রহণ করত, স্ত্রীলোকেরা সন্তানসন্ততি বলে গ্রহণ করত। জিনিসটাকে পাকা করবার জন্য গোত্র কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হতো। যেসব গোত্রের জনসংখ্যা বিশেষ কোনো অবস্থার জন্য কমে যেত তারা অপর কোন গোত্র তার সম্মতিতে ব্যাপকভাবে নিজেদের মধ্যে লোক গ্রহণ করতো। ইরকোয়াসদের ভেতর উপজাতির পরিষদের প্রকাশ্য সভায় গোত্রের মধ্যে লোক নেবার অনুষ্ঠান হতো, কার্যতঃ এই ব্যাপারটি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রূপ নিত।

৮। ইন্ডিয়ান গোত্রের মধ্যে বিশেষ ধর্মীয় উৎসবের প্রমাণ পাওয়া শক্ত, কিন্তু তবুও ইন্ডিয়ানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি কমবেশি পরিমাণে গোত্রের সঙ্গে জড়িত। ইরকোয়াসদের মধ্যে তাদের বার্ষিক ছয়টি ধর্মের উৎসবের এক একটি গোত্রের সাচেম ও সর্দারদের পদাধিকার বলে 'ধর্মের রক্ষক' হিসেবে গণ্য করা হতো এবং তারা পুরোহিতের কাজ করত।

৯। গোত্রের একটি সাধারণ সমাধিস্থান থাকত। নিউ ইয়র্ক স্টেটের যে ইরকোয়াসরা শ্বেতজাতির বেষ্টনীর মধ্যে পড়েছে তাদের মধ্যে এখন এই সমাধিস্থান লোপ পেলেও আগে ছিল। অন্যান্য ইন্ডিয়ান উপজাতিদের মধ্যে এটা এখনও আছে, যেমন ইরকোয়াসদের খুব ঘনিষ্ঠ একটি উপজাতি টুস্কারোরাসদের মধ্যে। এরা খ্রিস্টান হয়ে গেলেও এখনও এদের সমাধিস্থানে প্রত্যেকটি গোত্রের জন্য এক একটি পৃথক সারি আছে, যেখানে একই সারিতে মা ও সন্তানসন্ততিদের কবর দেওয়া হয়, কিন্তু বাপকে নয়। ইরকোয়াসদের মধ্যেও গোত্রের সমস্ত সদস্যই অন্ত্যেষ্টিতে অংশগ্রহণ করে, কবর তৈরি করে, অন্ত্যেষ্টি ভাষণ দেয় ইত্যাদি।

১০। গোত্রের একটি পরিষদ থাকে – গোত্রের সমস্ত পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও মেয়েদের নিয়ে সমান অধিকারের ভিত্তিতে গঠিত গণতান্ত্রিক সভা। এই পরিষদ সাচেম ও সর্দারদের এবং একইভাবে অন্যান্য 'ধর্মের রক্ষকদেরও' নির্বাচন ও খারিজ করত। এই পরিষদ গোত্রের নিহত সদস্যদের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দান-দক্ষিণা (Wergeld) অথবা

রক্তপ্রতিশোধের সিদ্ধান্ত নিত, বাইরের লোকদের গোত্রে গ্রহণ করত। সংক্ষেপে এইটাই হচ্ছে গোত্রের উচ্চতম ক্ষমতা।

এই হলো একটি টিপিকাল ইন্ডিয়ান গোত্রের অধিকার। 'একটি ইরকোয়াস গোত্রের সমস্ত সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন এবং পরস্পরের স্বাধীনতা রক্ষা করতে বাধ্য; ব্যক্তিগত অধিকারের দিক দিয়ে তারা সমান, সাচেম ও সর্দারদের কোনো সুযোগসুবিধা নেই; তারা ছিল রক্তের বন্ধনে মিলিত একটি ভ্রাতৃমণ্ডলী। কদাচ সূত্রবদ্ধ করা না হলেও স্বাধীনতা, সমানাধিকার ও ভ্রাতৃত্ব ছিল গোত্রের মৌলিক নীতি। আবার গোত্র হলো একটি সমাজব্যবস্থার ইউনিট, এই বনিয়াদের ওপরই ইন্ডিয়ানদের সমাজ সংগঠিত হয়েছিল। ইন্ডিয়ানদের চরিত্রের সর্বজনীন স্বীকার্য বৈশিষ্ট্য – স্বাধীনতাবোধ ও ব্যক্তিগত মর্যাদাজ্ঞানের ব্যাখ্যা এর থেকে মেলে।'

আমেরিকা আবিষ্কারের সময় সমগ্র উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানরা মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রে সংঘবদ্ধ ছিল। ডাকোটার মতো কয়েকটি মাত্র উপজাতির মধ্যে গোত্র ভগ্নদশায় পড়েছিল এবং ওজিবোয়া ও ওমাহা প্রভৃতি অন্য কয়েকটি উপজাতির মধ্যে পিতৃ-অধিকারের ভিত্তিতে গোত্র সংগঠিত হয়েছিল।

সংখ্যাবহুল যেসব ইন্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে পাঁচ বা ছয়ের বেশি গোত্র ছিল, তাদের মধ্যে তিনটি, চারটি বা ততোধিক গোত্র একত্র হয়ে একটি বিশিষ্ট জনসমষ্টি দেখি। তাকে ইন্ডিয়ান ভাষায় যা বলা হয় তার হুবহু গ্রীক অনুবাদে মর্গান এর নাম দেন ফ্রাত্রী (ভ্রাতৃত্ব)। এইভাবে সেনেকাদের মধ্যে দুটি ফ্রাত্রী আছে, প্রথমটির মধ্যে এক থেকে চার নম্বর গোত্র আছে এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে পাঁচ থেকে আট নম্বর। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, ফ্রাত্রীগুলি প্রধানতঃ হচ্ছে সেইসব আদি গোত্র যাতে উপজাতিটি শুরুতে বিভক্ত ছিল। কারণ একই গোত্রের ভিতরে বিবাহ নিষিদ্ধ হবার পর প্রত্যেকটি উপজাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখতে হলে তার কমপক্ষে দুটি গোত্র থাকা চাই। উপজাতির লোক বাড়ার সঙ্গে প্রত্যেকটি গোত্র আবার দুই বা ততোধিক গোত্রে ভাগ করা হয় এবং এরা প্রত্যেকে একটি স্বতন্ত্র গোত্রের রূপ নেয় আর আদি গোত্রটি সন্ততি গোত্রগুলি নিয়ে ফ্রাত্রীর রূপ নেয়। সেনেকা ও অন্য বেশিরভাগ ইন্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে একটি ফ্রাত্রীর অন্তর্ভুক্ত গোত্ররা হচ্ছে ভ্রাতৃ গোত্র, অপরপক্ষ অন্য ফ্রাত্রীর গোত্ররা হলো তাদের কাজিন গোত্র। আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের আত্মীয়তাবিধির এই নামকরণের যে অতি বাস্তব এবং অর্থব্যঞ্জক তাৎপর্য আছে তা আমরা আগেই দেখেছি। প্রথমে কোনো সেনেকা নিজের ফ্রাত্রীর মধ্যে বিবাহ করতে পারত না, কিন্তু এই নিষেধ অনেকদিন হলো চলে গিয়ে এখন কেবল গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেনেকাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী 'ভল্লুক' ও 'হরিণ' হচ্ছে দুটি আদি গোত্র এবং বাকিগুলি এদের শাখাপ্রশাখা। এই ধরনের নতুন সংগঠন দৃঢ়মূল হবার পরেই প্রয়োজনমতো এর পরিবর্তন হয়েছে। কোনো ফ্রাত্রীর গোত্রগুলি মরে গেলে ভারসাম্য রক্ষার জন্য অন্য ফ্রাত্রীর মধ্যে থেকে কখনো কখনো গোটাগুটি সব গোত্র সরিয়ে আনা হতো এই ফ্রাত্রীতে। এইজন্যই আমরা দেখি যে, একই নামের গোত্র বিভিন্ন উপজাতির ফ্রাত্রীগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরনে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

ইরকোয়াসদের মধ্যে ফ্রাত্রীর কাজ হচ্ছে অংশত সামাজিক এবং অংশত ধর্মীয় ।(১) দুটি ফ্রাত্রীর মধ্যে বল খেলা হয়, প্রতিটি ফ্রাত্রী নিজের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের আনে এবং ফ্রাত্রীর বাকি সদস্যরা দর্শক হয়ে ফ্রাত্রী অনুযায়ী স্থান নেয় এবং নিজ নিজ ফ্রাত্রীর জয়লাভের জন্য বাজি ধরে। (২) উপজাতির পরিষদের অধিবেশনে প্রত্যেকটি ফ্রাত্রীর সাচেম ও সর্দারেরা একত্রে বসে দুটি দলে মুখোমুখি হয়ে, এবং প্রত্যেক বক্তা প্রতিটি ফ্রাত্রীর প্রতিনিধিদের পৃথক সংস্থা হিসাবে সম্ভাষণ করে। (৩) যদি উপজাতির মধ্যে কোনো লোক নিহত হয় এবং নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারী একই ফ্রাত্রীর সভ্য না হয়, তাহলে নিহতের গোত্র ভ্রাতৃপদবাচ্য গোত্রদের কাছে আবেদন জানায় এবং এরা ফ্রাত্রীর পরিষদ ডেকে গোটা সংস্থা হিসাবে অন্য ফ্রাত্রীর কাছে ব্যাপারটির শান্তিতে মীমাংসার জন্য সেই ফ্রাত্রীর পরিষদ আহ্বান করতে বলে। এ ক্ষেত্রেও তাহলে ফ্রাত্রী আদি গোত্রের রূপেই দেখা দিচ্ছে এবং আলাদা আলাদা দুর্বল শাখাপ্রশাখার গোত্রের চেয়ে তার পক্ষে সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। (৪) পদস্ত কোনো ব্যক্তির মৃত্যুতে অপর ফ্রাত্রী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধির ব্যবস্থা করে এবং মৃতের ফ্রাত্রীর লোকেরা যায় শোকযাত্রী হিসাবে। একজন সাচেম মারা গেলে অপর ফ্রাত্রী ইরকোয়াসদের সমামেলের পরিষদকে পদশূন্য হয়েছে বলে বিজ্ঞাপিত করে। (৫) ফ্রাত্রীর পরিষদকে আবার সাচেম নির্বাচনের সময় দেখা যায়। নির্বাচনের ভ্রাতৃ গোত্রের সমর্থনটা প্রায় অবধারিত বলে ধরা হতো, কিন্তু অন্য ফ্রাত্রীর গোত্রেরা বিরোধিতা করতে পারত। এরকম হলে প্রথম ফ্রাত্রীর পরিষদের বৈঠক হতো এবং তারা যদি বিরোধীদের সমর্থন করত তাহলে নির্বাচন বাতিল হয়ে যেত। (৬) আগেকার দিনে ইরকোয়াসদের বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় গুহ্যাচার ছিল যাকে শ্বেত জাতির লোকেরা medicine-lodges (বৈদ্যের সভা) আখ্যা দিয়েছিলেন। সেনেকাদের মধ্যে এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলি দুটি ধর্মীয় ভ্রাতৃমণ্ডলীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হতো, এক একটি ফ্রাত্রীর জন্য একটি মণ্ডলী; এতে নতুন সদস্য নেবার জন্য নিয়মিত দীক্ষানুষ্ঠান হতো। (৭) দেশজয়ের সময়ে[৩৭] যে চারটি linages (গোত্র) তলাসকালার চারটি এলাকা অধিকার করেছিল তারা যদি চারটি ফ্রাত্রী হয়ে থাকে, যা প্রায় নিশ্চিত, তাহলে প্রমাণিত হয় যে, এই ফ্রাত্রীরা গ্রীকদের মতো অথবা জার্মানদের সমজাতীয় আত্মীয়গোষ্ঠীর মতো সামরিক ইউনিট হিসাবেও কাজ করত। এই চারটি linages পৃথক সৈন্যদল হিসাবে নিজস্ব উর্দি ও পতাকা নিয়ে এবং নিজস্ব নেতার অধীনে যুদ্ধে যেত।

যেমন কয়েকটি গোত্র নিয়ে উপজাতি একটি ফ্রাত্রী, তেমনই গোত্র প্রথার চিরায়ত রূপ হিসাবে কয়েকটি ফ্রাত্রী মিলে একটি উপজাতি হতো। কিছু ক্ষেত্রে খুব ক্ষয়িষ্ণু উপজাতির মধ্যে এই মধ্যবর্তী স্তর বা ফ্রাত্রী দেখা যায় না। আমেরিকায় ইন্ডিয়ান উপজাতিগুলির বৈশিষ্ট্য কী কী ?

১। নিজস্ব ভূখন্ড ও নিজস্ব নামের অস্তিত্ব। প্রত্যক্ষ বসবাসের এলাকা ছাড়াও প্রত্যেকটি উপজাতির দখলে মাছ ধরা ও পশু শিকারের জন্য বেশ বিস্তীর্ণ অঞ্চল থাকত। এরপরে এবং প্রতিবেশী উপজাতির দখলী অঞ্চল অবধি বেশ বিস্তৃত নিরপেক্ষ ভূখন্ড

৩৭ ১৫১৯ - ১৫২১ সালে স্পেনীয় বিজয়ীগণ কর্তৃক মেক্সিকো জয়ের কথা বলা হচ্ছে – সম্পাঃ

থাকত: দুটি পাশাপাশি উপজাতির ভাষা সমগোত্রীয় হলে এই নিরপেক্ষ ভূখন্ড অপেক্ষাকৃত ছোট হতো, এবং না হলে তা বিস্তৃত হতো। এই রকম নিরপেক্ষ ভূখন্ডই ছিল জার্মানদের সেই সীমান্তঅরণ্য, সিজারের সুয়েভিরা (suevi) নিজস্ব ভূখন্ডের চারপাশে যে ঊষরভূমি রেখেছিল, দিনেমার ও জার্মানদের মাঝখানকার isarnholt (ডেনিস ভাষার jarnved, limes Danicus), জার্মান ওস্লাভদের মাঝখানে স্যাক্সন অরণ্য এবং brainbor (স্লাভ ভাষায় 'প্রতিরক্ষার অরণ্য') যার থেকে ব্রান্দেনবুর্গ নাম এসেছে। এইভাবে অসুনির্দিষ্ট সীমানার ভিতরকার ভূখন্ডটি ছিল উপজাতির সাধারণের ভূমি যা প্রতিবেশী উপজাতিরা মানত এবং উপজাতিটি বাইরের আক্রমণ থেকে এ ভূমিটা রক্ষা করত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সীমানার অনিশ্চয়তা নিয়ে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অসুবিধা হতো কেবল তখনই, যখন জনসংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। উপজাতির নাম ভেবেচিন্তে স্থির করার চেয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আকস্মিকতার ফল বলেই মনে হয়। কালক্রমে প্রায় দেখা যেত যে, প্রতিবেশী উপজাতিরা একটি উপজাতির নিজেদের ব্যবহৃত নামের বদলে অন্য নাম দিয়েছে, যেমন জার্মানদের (die Deutschen) ক্ষেত্রে, এদের প্রথম ব্যাপক ঐতিহাসিক নাম 'জার্মানী' (germanen) হচ্ছে কেল্টিকদের দেওয়া।

২। একটি উপজাতির একটি বিশেষ উপভাষা। বস্তুত উপজাতি ও উপভাষা মোটামুটি মিলে যায়। অল্প কিছুকাল আগেও আমেরিকায় বিভাগের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন উপজাতি ও উপভাষার সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছিল এবং এখনও তা একেবারে থেমে গেছে বলে মনে হয় না। যেখানে দু'টি ক্ষয়িষ্ণু উপজাতি মিলে একটি হয়, সেখানে দেখা যায় যে, ব্যতিক্রম হিসাবে একই উপজাতির মধ্যে দুটি ঘনিষ্ঠ উপভাষা বলা হচ্ছে। এক একটি আমেরিকান উপজাতির জনসংখ্যা গড়ে দুই হাজারের নিচে। চেরকী উপজাতির লোকসংখ্যা কিন্তু প্রায় ছাব্বিশ হাজার – এই হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যা যারা একই উপভাষা ব্যবহার করে।

৩। গোত্রগুলির দ্বারা নির্বাচিত সাচেম ও সর্দারের ক্ষমতাভিষিক্ত করার অধিকার।

৪। গোত্রের মতের বিরুদ্ধে হলেও তাদের অপসারণের অধিকার। যেহেতু সাচেম ও সর্দারেরা উপজাতির পরিষদেরও সদস্য, সেইজন্য তাদের ওপর উপজাতির এই অধিকারের ব্যাখ্যা স্বতই মিলছে। যেখানে অনেক উপজাতি মিলে একটি সমামেল প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রত্যেক উপজাতিই এক সম্মিলিত পরিষদে প্রতিনিধি পাঠায়, সেখানে উক্ত অধিকার এই সম্মিলিত পরিষদে বর্তায়।

৫। একটি সাধারণ ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা (পুরাণ) ও পূজাপদ্ধতির অস্তিত্ব। 'নিজেদের বর্বর ধরনে আমেরিকার ইন্ডিয়ানরাও ছিল ধর্মপ্রাণ'। তাদের পুরাণ নিয়ে এখনও মোটেই বিচারমূলক অনুসন্ধান হয়েছে বলা যায় না। তারা ধর্মের ধারণাগুলিকে মানবীয় রূপ দিয়েছিল – নানা ধরনের ভূতপ্রেত, – কিন্তু বর্বরতার যে নিম্নতন স্তরে তারা ছিল তাতে তাদের মধ্যে তখনো মূর্তি রচনা, তথাকথিত দেব মূর্তির প্রচলিত হয়নি। এটা হলো প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক শক্তির পূজা, যা বিকশিত হয়ে উঠেছিল বহু-ঈশ্বরবাদে (polytheism)। বিভিন্ন উপজাতির ছিল নিজের নিজের বিশিষ্ট পূজাপ্রথা যথা নাচ ও খেলাধুলা সম্বলিত নিয়মিত ধর্মোৎসব। প্রত্যেকটি ধর্মোৎসবে বিশেষ করে নৃত্য ছিল আবশ্যিক

অঙ্গ, প্রত্যেকটি উপজাতি নিজের নিজের এ অনুষ্ঠান করত পৃথকভাবে।

৬। সাধারণ ব্যাপার নিষ্পত্তির জন্য একটি উপজাতীয় পরিষদ। এতে থাকত প্রত্যেকটি গোত্রের সাচেম ও সর্দাররা – এরাই ছিল গোত্রের প্রকৃত প্রতিনিধি, কারণ এদের যে কোনো সময়ে পদচ্যুত করা যেত। প্রকাশ্যভাবে পরিষদের অধিবেশন হতো. এদের ঘিরে থাকত উপজাতির বাকি মানুষ; এদের আলোচনায় অংশ নেওয়া ও নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার অধিকার ছিল; পরিষদই সিদ্ধান্ত করত। উপস্থিত প্রত্যেকেই পরিষদের সামনে সাধারণতঃ বলতে পারত, স্ত্রীলোকেরাও নিজেদের পছন্দ মতো কোনো মুখপাত্র মারফত নিজেদের অভিমত প্রকাশ করতে পারত। ইরকোয়াসদের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মতিক্রমে করতে হতো, ঠিক যেমনটি হতো জার্মানদের মার্ক গোষ্ঠীগুলির অনেক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে। বিশেষ করে অন্যান্য উপজাতির সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারগুলি উপজাতীয় পরিষদের দায়িত্বে হতো। এরা দূত গ্রহণ করত ও দূত পাঠাত, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করত। যুদ্ধ শুরু হলে স্বেচ্ছাসেবকরাই প্রধানত যুদ্ধ চালাত। যাদের সঙ্গে সুস্পষ্ট শান্তি চুক্তি নেই, তেমন প্রত্যেক উপজাতির সঙ্গেই উপজাতিটির নীতিগতভাবে যুদ্ধের অবস্থা বর্তমান। এই ধরনের শত্রুদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সংগঠন করত সাধারণতঃ কয়েকজন পুরোগামী যোদ্ধা। তারা যুদ্ধের একটি নাচের ব্যবস্থা করত; এই নাচে যোগদানের অর্থ ছিল অভিযানে যোগ দিতে রাজী হওয়া। তখনই একটি সৈন্যদল গঠিত হতো এবং দেরি না করে তারা যাত্রা করত। যখন উপজাতির এলাকা আক্রান্ত হতো তখনও ঐ একইভাবে প্রধানত স্বেচ্ছাসেবকরাই প্রতিরক্ষা চালাত। এই ধরনের দলের যাত্রা ও প্রত্যাবর্তন সর্বদাই হতো এক একটা সামাজিক উৎসবের উপলক্ষ। এইরকম অভিযানের জন্য উপজাতীয় পরিষদের মত নেবার দরকার হতো না। এইরকস সম্মতি চাওয়াও হতো না এবং দেওয়াও হতো না। এগুলি ছিল ঠিক সেই ট্যাসিটাসের বর্ণিত জার্মান বাহিনীগুলির বেসরকারী (প্রাইভেট) অভিযানের মতো, কেবল পার্থক্য এই যে, জার্মানদের মধ্যে বাহিনীগুলি ইতিমধ্যেই বেশি স্থায়ী রূপ নিয়েছিল এবং শান্তির সময়ে এরা একটি শক্তিশালী কেন্দ্ররূপে থাকত যাদের চারপাশে যুদ্ধের সময়ে স্বেচ্ছাসৈনিকেরা এসে জমতো। এই ধরনের যোদ্ধবাহিনী বেশিরভাগ সময় সংখ্যায় বেশি হতো না। ইন্ডিয়ানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানগুলি, বহুদূর পর্যন্ত অভিযান চালালেও, সৈন্য সংখ্যায় ছিল নগন্য। যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের জন্য এই ধরনের কয়েকটি বাহিনী একত্র হতো, তখন প্রত্যেক দল কেবল নিজেদের দলপতিকে মেনে চলত। অভিযানের পরিকল্পনায় ঐক্য আসত কমবেশি পরিমাণে এইসব দলপতিদের পরিষদ থেকে। আমিয়ানাস মার্সেলিনাসের বর্ণিত চতুর্থ শতাব্দীতে রাইন নদীর ঊর্ধ্বাংশের আলামান্নিরা এই ধরনেই যুদ্ধ করত।

৭। কোনো কোনো উপজাতির মধ্যে আমরা একজন সর্বোচ্চ সর্দার (Oberhauptling) দেখতে পাই, তার ক্ষমতা অবশ্য খুব বেশি ছিল না। সাচেমদেরই সে একজন, সে সঙ্কটসময়ে দ্রুত কর্মপদ্ধতি নেবার প্রয়োজন সাময়িকভাবে ব্যবস্থা করত ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না পরিষদ বসে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করছে। এটি হলো

কার্যনির্বাহী ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা সৃষ্টির দুর্বল প্রচেষ্টা, এবং পরবর্তী বিকাশে দেখা গেছে যে এই প্রচেষ্টা সাধারণতঃ উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থ প্রচেষ্টা হতো। দেখা যাবে যে, কার্যক্ষেত্রে সর্বোচ্চ যুদ্ধনেতাই সর্বত্র না হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইরূপ কার্যনির্বাহী ক্ষমতাধর হয়ে উঠত।

আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের বৃহত্তম অংশ উপজাতি মিলনের স্তর থেকে আর এগোয়নি। সংখ্যার দিক দিয়ে ছোট এইসব উপজাতিগুলি একটি অপরটি থেকে বিস্তীর্ণ সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে বিচ্ছিন্ন এবং অবিরাম যুদ্ধের ফলে দুর্বল, এদের এলাকা বিরাট, লোক ছিল অল্প। সাময়িক সঙ্কটের সময় এখানে ওখানে নিকট সম্পর্কিত উপজাতিদের মধ্যে যে জোট দেখা দিত, সঙ্কট কেটে গেলে তা ভেঙে যায়। কিন্তু কোনো কোনো এলাকায় আদিতে আত্মীয় হলেও পরে বিভক্ত হয়ে যাওয়া উপজাতিগুলি স্থায়ী সমামেলে পুনর্মিলিত হতো এবং এইভাবে জাতি গঠনের দিকে প্রথম পদক্ষেপ হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ইরকোয়াসদের মধ্যে এরূপ সমামেলের সবচেয়ে অগ্রসর রূপ দেখা যায়। মিসিসিপি নদীর পশ্চিমে তাদের আদি বাসভূমি থেকে তারা যাত্রা করে – সম্ভবত ওখানে তারা সুবৃহৎ ডাকোটা আত্মীয় গোষ্ঠীর একটি শাখা ছিল – দীর্ঘদিন যাযাবরের মতো ঘুরে তারা স্থায়ীভাবে যেখানে বসবাস করে, বর্তমানে সেই জায়গার নাম নিউ ইয়র্ক স্টেট। তাদের মধ্যে ছিল পাঁচটি উপজাতি : সেনেকা, কায়ুগা, ওনন্দাগা, ওনেইডা এবং মোহক। মাছধরা, পশুশিকার ও খুব প্রাথমিক কৃষির দ্বারা তারা জীবনধারণ করত, প্রায়ই কাঠের বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা গ্রামে তারা বাস করত। তাদের সংখ্যা কখনোই বিশ হাজারের বেশি ছিল না এবং পাঁচটি উপজাতির মধ্যেই কয়েকটি সাধারণ গোত্র দেখা যেত। তারা একই ভাষার অন্তর্গত ঘনিষ্ঠ উপভাষায় কথাবার্তা বলত এবং পাঁচটি উপজাতির মধ্যে বিভক্ত একই অখণ্ড এলাকায় বাস করত। যেহেতু সদ্য জয়লাভ দ্বারা এই ভূখণ্ড দখল করা হয়েছিল, সেইজন্য বেদখল উপজাতিদের বিরুদ্ধে এদের মধ্যে অভ্যস্ত সহযোগিতা ছিল খুবই স্বাভাবিক। অন্তত পনের শতকের শুরুতে তা একটি রীতিমত 'চিরস্থায়ী সমামেল', বা কনফেডারেসীর রূপ নেয়; নিজের সদ্যলব্ধ ক্ষমতার চেতনায় তা তখনই আক্রমণকারীর চরিত্র নেয় এবং ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ যখন এর ক্ষমতা সর্বাধিক, তখন এরা চারপাশের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দখল করে কোথাও অধিবাসীদের তাড়িয়ে দিয়েছে এবং কোথাও বা তাদের কর দিতে বাধ্য করেছে। যেসব ইন্ডিয়ানরা বর্বরতার নিম্নতন স্তর কাটিয়ে উঠতে পারেনি (অর্থাৎ মেক্সিকানরা, নিউ মেক্সিকানরা[৩৮] ও পেরুবাসীদের বাদে), ইরকোয়াস সমামেল ছিল তাদের সবচেয়ে পরিণত সামাজিক সংগঠন। এই সমামেলের মূল বৈশিষ্টগুলি ছিল নিম্নরূপ :

১। সম্পূর্ণ সমাধিকার এবং উপজাতির আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপারে স্বাধীনতার ভিত্তিতে পাঁচটি রক্তসম্পর্কিত উপজাতির চিরস্থায়ী সমামেল। এই রক্তসম্পর্কই ছিল সমামেলের সত্যকার ভিত্তি। পাঁচটি উপজাতির মধ্যে তিনটিকে বলা হতো পিতৃ-উপজাতি এবং এরা পরস্পর ভ্রাতৃ পদবাচ্য ছিল; বাকি দুটিকে বলা হতো পুত্র-উপজাতি এবং তারাও একইভাবে পরস্পরের কাছে ছিল ভাই। তিনটি – প্রাচীনতম – গোত্রের

৩৮. ১৭ পৃষ্ঠার ফুটনোট দ্রষ্টব্য। – সম্পাঃ

জীবিত প্রতিনিধিদের পাঁচটি উপজাতির মধ্যেই পাওয়া যেত এবং আরও তিনটি গোত্রের সভ্যদের দেখা যেত তিনটি উপজাতির মধ্যে। এইসব গোত্রের লোকেরা সমস্ত পাঁচটি উপজাতির মধ্যেই পরস্পর ভাই ভাই ছিল। নিতান্ত উপভাষার কিছু পার্থক্যসহ এদের যে সাধারণ ভাষা সেটি ছিল একই উদ্ভবের প্রকাশ ও প্রমাণ।

২। সমামেলের সংস্থা হলো একটি সমামেল-পরিষদ, তাতে একই পদমর্যাদা ও অধিকার সম্পন্ন পঞ্চাশজন সাচেম থাকত; সমামেল সংক্রান্ত ব্যাপার এই পরিষদই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করত।

৩। সমামেল গঠিত হবার সময় এই পঞ্চাশজন সাচেমকে উপজাতি ও গোত্রগুলির মধ্যে বন্টন করা হয় নতুন পদাধিকারী হিসাবে। এ পদগুলি গড়া হয় বিশেষ করে সমামেলের উদ্দেশ্য রেখে। কোন পদ খালি হলে গোত্ররাই নতুন লোকের নির্বাচন করত এবং সবসময়েই তারা তাকে অপসারিত করতে পারত। কিন্তু তাদের পদাধিষ্ঠিত করার অধিকার ছিল কেবল সমামেল-পরিষদের।

৪। সমামেল-পরিষদের সাচেমরা নিজ নিজ উপজাতিরও সাচেম ছিল এবং প্রত্যেকেরই উপজাতীয় পরিষদে একটি আসন ও একটি ভোট ছিল।

৫। সমামেল-পরিষদের সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমেই করতে হতো।

৬। ভোট হতো উপজাতি হিসাবে, ফলে বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত নিতে হলে তার আগে প্রত্যেক উপজাতি ও তার পরিষদের সমস্ত সভ্যের একমত হতে হতো।

৭। পাঁচটি উপজাতীয় পরিষদের যে কেউ সমামেল-পরিষদ আহ্বান করতে পারত, কিন্তু সমামেল-পরিষদের নিজের ইচ্ছায় সভা আহ্বানের ক্ষমতা ছিল না।

৮। সমবেত জনতার উপস্থিতিতে পরিষদের বৈঠক হতো। যেকোন ইরকোয়াসেরই এখানে বলার অধিকার ছিল, কিন্তু সিদ্ধান্ত করত কেবলমাত্র পরিষদ।

৯। সমামেলের সরকারীভাবে কোন শীর্ষ ব্যক্তি অথবা কোনো প্রধান কর্মকর্তাও থাকত না।

১০। কিন্তু সমামেলের দুজন সমানাধিকার ও ক্ষমতাবিশিষ্ট সর্বোচ্চ সর্দার ছিল (স্পার্টার দুজন 'রাজা' ও রোমের দু'জন 'কন্সাল')।

এই হচ্ছে গোটা সামাজিক ব্যবস্থা যা নিয়ে ইরকোয়াসরা চারশ বছর কাটিয়েছে এবং আজও কাটাচ্ছে। আমি মর্গানের বিবরণ অনুসারে একটু বিশদ করেই এই ব্যবস্থা বর্ণনা করেছি এইজন্য যে, এখানে আমরা এমন একটি সমাজ সংগঠন পর্যালোচনা করবার সুযোগ পাচ্ছি যেখানে তখন পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্র দেখা দেয়নি। রাষ্ট্র বলতে বুঝায় একটি বিশেষ সামাজিক কর্তৃপক্ষ যা স্থায়ী সংশ্লিষ্ট সকলের সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন; মাউরার নির্ভুলভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, জার্মানদের মার্কের গঠনতন্ত্র রাষ্ট্র থেকে মূলগতভাবে পৃথক, এটা একটি বিশুদ্ধ সামাজিক সংগঠন যদিও পরে এইটিই অনেকাংশে রাষ্ট্রের ভিত্তির কাজ করে; – তাই মাউরার তাঁর সমস্ত রচনায় খুঁজেছেন কী করে মার্ক, গ্রাম, মহাল (manors) ও নগরগুলির গঠনতন্ত্র থেকে এবং তার পাশাপাশি সরকারী কর্তৃপক্ষের ক্রমিক উদ্ভব ঘটল। উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের থেকে দেখা যায় যে, আদিতে যা ছিল একটিমাত্র মিলিত উপজাতি, তা ক্রমে ক্রমে কেমন করে এক

বিশাল মহাদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে; কেমন করে উপজাতিগুলি বিভাগের মধ্যে দিয়ে হয়ে উঠেছে নানা জনসমষ্টি, বহু উপজাতির সমষ্টি; কেমন করে ভাষা বদলাতে বদলাতে শুধু পরস্পরের অবোধ্যই হয়নি, পরন্তু তাদের আদি ঐক্যের চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে; এবং কেমন করে একই সময়ে উপজাতির অভ্যন্তরে বিশিষ্ট গোত্রগুলি ভেঙে ভেঙে বহু হয়েছে, আদি মাতৃ-গোত্রগুলি ফ্রাত্রীরূপে টিকে থেকেছে অথচ প্রাচীনতম এই গোত্রের নামগুলি আজও বহুদূরের ও বহুদিন বিচ্ছিন্ন উপজাতিগুলির মধ্যে একই রয়ে গেছে – নেকড়েবাঘ ও ভল্লুক আজও অধিকাংশ ইন্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে গোত্রের নাম। সাধারণভাবে বলা যায় যে, উল্লিখিত গঠনতন্ত্র তাদের সকলের পক্ষেই খাটে; ব্যতিক্রম শুধু এই যে, এদের মধ্যে অনেকে আত্মীয় উপজাতিগুলির সমামেলের স্তরে পৌঁছায়নি।

কিন্তু আমরা এও দেখি যে, গোত্রকে যদি সমাজের মূল এককরূপে ধরা হয় তাহলে প্রায় অনিবার্য আবশ্যিকতায় – কারণ স্বাভাবিকভাবেই – গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির গোটা ব্যবস্থা বেড়ে ওঠে এই একক থেকে। এই তিন জনসমষ্টির প্রত্যেকটিই বিভিন্ন পর্যায়ের রক্তসম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ এবং প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজকর্ম চালায়, কিন্তু সেইসঙ্গে আবার এক অপরের পরিপূরক। তাদের উপর যে সাধারণ কাজকর্মের দায়িত্ব বর্তিয়েছিল, তা হচ্ছে বর্বরতার নিম্নতন স্তরে অবস্থিত লোকদের সমগ্র সামাজিক কাজকর্ম। অতএব যেখানেই আমরা লোকেদের সামাজিক এককরূপে গোত্রকে দেখতে পাব সেখানেই আমরা উপরে উল্লিখিত উপজাতি-সংগঠনের মতো একটা সংগঠন খুঁজে দেখতে পারি; এবং যেখানে যথেষ্ট তথ্য আছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, গ্রীক ও রোমকদের মধ্যে, সেখানে শুধু এ সংগঠন খুঁজে পাব তাই নয়, এ বিষয়েও দৃঢ়প্রত্যয় হয়ে উঠতে পারব যে, মালমসলার অনুপস্থিতির ক্ষেত্রেও আমেরিকার সমাজ সংগঠনের সঙ্গে তুলনা করলেই সমস্ত জটিল প্রশ্ন ও ধাঁধার সমাধান মিলবে।

এবং তার শিশুসুলভ সরলতা সত্ত্বেও কত আশ্চর্য এই গোত্র সংগঠন! সব ব্যাপারই সৈন্য, সেপাই পুলিস, ছাড়াই অনায়াসে চলে; অভিজাতকুল, রাজা, শাসক, নগরপাল, অথবা বিচারক ছাড়াই চলে; কারাগার, মামলা - মকদ্দমা নেই। সমস্ত ঝগড়া ও বিরোধ নিষ্পত্তি করে সংশ্লিষ্ট লোকেরা সমগ্রভাবে মিলে, গোত্র অথবা উপজাতি অথবা একাধিক গোত্র নিজেরা মিলে। রক্তের বদলার ভয় কেবল একেবারে চূড়ান্ত, কদাচিৎ প্রযুক্ত ব্যবস্থা হিসাবে, আমাদের সভ্য সমাজে মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে এরই সভ্যরূপ এবং এতে সভ্যতার সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। যদিও বর্তমান অপেক্ষা অনেক বেশি কাজ সমবেতভাবে চলত, – গৃহস্থালীর কাজ কয়েকটি পরিবার মিলিতভাবে এবং সাম্যতন্ত্রী ভিত্তিতে চালাত, ভূমি ছিল উপজাতির সম্পত্তি, কেবল ঘরোয়া আবাদ সাময়িকভাবে বরাদ্দ হতো গৃহস্থালীর জন্য, – তবুও আমাদের মতো ব্যবস্থাপনার বিশাল ও জটিল যন্ত্রের কোনো দরকার হয়নি। যারা সংশ্লিষ্ট, তারাই সিদ্ধান্ত করে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শত শত বৎসরের পুরাতন রীতিতে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয়ে আছে। গরীব ও অভাবগ্রস্ত কেউ থাকতে পারে না – সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালী এবং গোত্র সংগঠন বৃদ্ধ, রুগ্ন ও যুদ্ধ-পঙ্গুদের দায়িত্ব মানে। স্ত্রীলোক সমেত সকলেই স্বাধীন ও সমানাধিকার সম্পন্ন। তখনও পর্যন্ত দাসের কোন স্থান ছিল না অথবা সাধারণভাবে অপর কোনও উপজাতিকে অধীন করাও হতো না।

যখন ১৬৫১ সাল নাগাদ ইরকোয়াসরা 'এরি' এবং 'নিরপেক্ষ উপজাতি'[৩৯] জয় করল, তখন তারা এদের সমানাধিকারের ভিত্তিতে সমামেলে যোগ দিতে বলে; বিজিতরা অস্বীকার করলে পরেই তাদের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করা হয়। এবং এই সমাজ কী ধরনের নরনারী সৃষ্টি করেছিল, তার ইঙ্গিত পাই অকলুষিত ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে সংস্পর্শ এসে শ্বেত জাতির সমস্ত ব্যক্তিই এই বর্বরদের যে আত্মসম্ভ্রমবোধ, অকপটতা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও সাহসের প্রশংসা করেছেন তা থেকে।

খুব সম্প্রতি আমরা আফ্রিকায় এই বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখেছি। কয়েক বছর আগে জুলু কাফ্রিরা, তেমনই মাস কয়েক মাত্র আগে নুবিয়ানরা[৪০] উভয় উপজাতির মধ্যেই গোত্র সংগঠন এখনও লোপ পায়নি – যা করেছে, তা যে কোন ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনীর অসাধ্য। শুধুমাত্র কোঁচ ও বর্শা নিয়ে, কোন আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াই তারা ব্রিচলোডার বন্দুকের গুলিবর্ষণের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসে একেবারে ইংরেজ পদাতিকদের সঙ্গীনের মুখে। সকলেই মানে যে, ঘনিষ্ঠ পঙক্তি বন্ধনে থাকলে ইংরেজ পদাতিক বিশ্বে অতুলনীয়। কিন্তু তাদের এরা বিশৃঙ্খল করে দেয় ও একাধিকবার হটিয়ে দেয়, যদিও সমরসজ্জায় আসমান-জমিন ফারাক ছিল, যদিও এদের মধ্যে সমরসেবা বলে কিছু ছিল না এবং যদিও ওরা সামরিক অনুশীলন কিছুই জানত না। তাদের ক্ষমতা ও সহ্যশক্তি ইংরেজদের এই নালিশ থেকেই ভালো বুঝা যায় যে, একজন কাফ্রি চব্বিশ ঘন্টায় একটি ঘোড়ার চেয়ে তাড়াতাড়ি এবং বেশিদূর যেতে পারে। একজন ইংরেজ চিত্রকর বলেছেন, 'এদের ক্ষুদ্রতম পেশীটি পর্যন্ত ইস্পাত কঠিন হয়ে দড়ির মতো ফুটে ওঠে'।

শ্রেণী - বিভাগ দেখা দেবার আগে এইরকম ছিল মানুষজাতি ও তার সমাজ। এবং যদি এদের সঙ্গে আজকের দিনের বেশির ভাগ সভ্য মানুষকে তুলনা করি, তাহলে বর্তমানে প্রলেতারীয় ও গরীব কৃষকদের সঙ্গে প্রাচীনকালের গোত্রের স্বাধীন সদস্যদের বিরাট পার্থক্য নজরে পড়বে।

এটি হচ্ছে ছবির একটি দিক মাত্র। এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, এই সংগঠনের ধ্বংস ছিল অনিবার্য। উপজাতি ছাড়িয়ে তা বাড়তে পারেনি; উপজাতিগুলির সমামেলের মধ্যেই ইতিমধ্যেই এই সংগঠনের পতন সূচিত হয়েছিল, তা পরে আমরা দেখব, এবং অন্যদের পরাধীন করার জন্য ইরকোয়াসদের প্রচেষ্টার মধ্যে তা দেখা গেছে। যেটা উপজাতির বাইরে, সেটা আইনেরও বাইরে; যেখানে স্পষ্ট কোন শান্তিচুক্তি ছিল না, সেখানেই উপজাতিতে উপজাতিতে যুদ্ধ চলত; এবং চলত তার সেই নিষ্ঠুরতা নিয়ে, যার জন্য অন্য পশুজগৎ থেকে মানুষ বিশিষ্ট এবং যে নিষ্ঠুরতা হ্রাস পেয়েছে কেবল পরে বৈষয়িক স্বার্থবুদ্ধি থেকে। যার নিদর্শন আমরা আমেরিকায় দেখেছি, সেই পরিপূর্ণ বিকশিত গোত্র-সংগঠনের সঙ্গে ধরে নিতে হয় একটি অতি মাত্রায় অপরিণত উৎপাদন, অর্থাৎ বিরাট ভূখণ্ড নিয়ে অল্পসংখ্যক মানুষের বাস, এবং এইজন্য তার উপর অনাত্মীয়,

---

৩৯. 'নিরপেক্ষ জাতি' ('নিরপেক্ষ উপজাতি') – ১৭ শ শতাব্দীতে এরি হ্রদের উত্তর উপকূলবাসী ইন্ডিয়ান ইরকোয়াসদের কয়েকটি আত্মীয় উপজাতির সমর মৈত্রীকে এই নামে অভিহিত করা হয়। এই মৈত্রীকে ফরাসী ঔপনিবেশিকরা এই নাম দেয়, কারণ নিজেদের ইরকোয়াস ও গুরনদের মধ্যে যুদ্ধে তারা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে। – সম্পাঃ

৪০. ১৮৭৯ সালে আফ্রিকার জুলুদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ এবং ১৮৮৩০ সালে নুবিয়ানদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধে কথা বলা হচ্ছে। –সম্পাঃ

প্রতিকূল ও অবোধ্য বাহ্য প্রকৃতির প্রায় পরিপূর্ণ প্রভুত্ব, এ প্রভুত্বের প্রতিফলন ঘটেছে তার শিশুসুলভ সরল ধর্মীয় ধারণায়। যেমন বহিরাগতের পক্ষে তেমনি নিজের পক্ষেও উপজাতিই ছিল মানুষের সীমানা, উপজাতি গোত্র ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়, প্রকৃতি নির্দিষ্ট একটি উচ্চতর শক্তি যার কাছে অনুভূতি, চিন্তা ও কার্যে ব্যক্তি ছিল সম্পূর্ণ অধীন। এই যুগের লোকেরা আপাতদৃষ্টিতে যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, তারা কিন্তু একে অন্যের থেকে মোটেই পৃথক ছিল না, মার্কসের কথায় বলা যায় যে, তারা তখনও আদিম গোষ্ঠীর নাড়ির সঙ্গে বাঁধা। এই আদিম গোষ্ঠীর আধিপত্য ভাঙা দরকার ছিল এবং এটি ভাঙাও হলো। কিন্তু যেসব প্রভাবের ফলে এটি ভাঙল, সেগুলো আমাদের কাছে মনে হয় প্রাচীন গোত্র-সমাজের সহজ নৈতিক গরিমা থেকে একটি অধোগতি, পতন। নীচতম স্বার্থসমূহ – হীন লোভ, পাশবিক কামনাবৃত্তি, জঘন্য লালসা, সাধারণ সম্পদের স্বার্থপর লুণ্ঠন, এর মধ্যে দিয়েই নতুন সভ্য শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এল; সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য উপায় – চৌর্য, ধর্ষণ, প্রবঞ্চনা ও বেইমানিতে শ্রেণীহীন প্রাচীন গোত্র সংগঠনের ভিত্তি দুর্বল করে তাকে ধ্বংস করল। এবং আড়াই হাজার বছরের অস্তিত্বের মধ্যে এই নতুন সমাজ শোষিত ও উৎপীড়িত বৃহত্তম জনসংখ্যার স্বার্থের বিনিময়ে একটি ছোট সংখ্যাল্প অংশের বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়; এবং বর্তমানে সে অবস্থা আরো বেশি সত্য।

৪
গ্রীক গোত্রসংগঠন

পেলাসগিয়ান এবং একই উপজাতি থেকে উদ্ভূত অন্যান্য জনসমষ্টির মতো গ্রীকরাও প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আমেরিকানদের মতোই একই সংস্থা-পর্যায়ক্রমে গড়ে উঠেছিল : গোত্র, ফ্রাত্রী, উপজাতি এবং উপজাতিসমূহের সমামেল। কোথাও হয়তো ফ্রাত্রী ছিল না, যেমন ডোরিয়ানদের মধ্যে; সকল ক্ষেত্রেই উপজাতিগুলির সমামেল গড়ে উঠেনি; কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই গোত্র ছিল একক। যে সময় থেকে গ্রীকরা ইতিহাসের মধ্যে এল, তখন তারা সভ্যতার প্রবেশ মুখে। বীর যুগের গ্রীকরা ইরকোয়াসদের চেয়ে এতখানি এগিয়ে ছিল যে, পরিণতির প্রায় দুটি যুগের ব্যবধান রয়েছে গ্রীক ও আমেরিকার উপরিকথিত উপজাতিগুলির মধ্যে। এইজন্যই গ্রীক গোত্রের মধ্যে ইরকোয়াস গোত্রের আদিম বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল না; সমষ্টি-বিবাহের ছাপ সেখানে বহুলাংশে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। মাতৃ-অধিকারের জায়গায় পিতৃ-অধিকার এসেছিল; এর মধ্যে দিয়ে উদীয়মান ব্যক্তিগত সম্পদ গোত্র-প্রথায় প্রথম ভাঙন আনল। দ্বিতীয় আর একটি ভাঙন স্বাভাবিকভাবেই প্রথমটির পিছু পিছু এল : পিতৃ-অধিকার প্রবর্তনের পরে ধনী উত্তরাধিকারিণীর সম্পত্তি বিবাহের ফলে তার স্বামীতে অর্সায় অর্থাৎ অন্য গোত্রের হাতে যায়, এবং তাই গোত্র-সংগঠনের সমস্ত আইন কানুনের ভিত্তিটাই ভাঙা হলো এবং এইরকম ক্ষেত্রে যাতে গোত্রের মধ্যেই সম্পত্তি থাকে তাই পাত্রীকে শুধু অনুমতি দেওয়া নয়, পরন্তু বাধ্য করা হয় নিজের গোত্রের মধ্যেই বিবাহ করবার জন্য।

গ্রোট রচিত 'গ্রীসের ইতিহাস' অনুসারে বিশেষ করে এথেনীয় গোত্রের সংহতি নিম্নলিখিতভাবে রক্ষা করা হতো :

১। সাধারণ ধর্মোৎসব এবং বিশেষ একটি দেবতার পূজারী পুরোহিতদের বিশেষ অধিকারসমূহ, এই দেবতাকে গোত্রের আদিম জনক মনে করা হতো এবং এই হিসাবে তাঁর একটি বিশেষ নাম ছিল।

২। একটি সাধারণ সমাধিস্থান (জেমোসথেনাসের 'এভবুলিডাস'[৪১] তুলনীয়)।

৩। পারস্পরিক উত্তরাধিকার।

৪। বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য, রক্ষা ও সমর্থনের বাধ্যবাধকতা।

৫। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গোত্রের মধ্যেই বিবাহ করার পারস্পরিক অধিকার ও বাধ্যবাধকতা, মাতৃপিতৃহীনা বা ধনী পাত্রীদের সম্পর্কে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

৪১. এভবুলিডাসের বিরুদ্ধে ডেমোসথেনাসের অভিশংসক ভাষণের কথা বলা হচ্ছে। এই বক্তৃতায় গোত্রের সমাধিস্তূপে কেবল সেই গোত্রের লোকেদের সমাধিদানের প্রাচীন রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। –সম্পাঃ

৬। অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পত্তি, এবং একজন archon (প্রধান) ও নিজস্ব খাজাঞ্চী।

কয়েকটি গোত্র নিয়ে এক একটি ফ্রাত্রী, কিন্তু তত ঘনিষ্ঠ নয়, তবু এখানেও আমরা একই ধরনের পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব দেখতে পাই, বিশেষত কয়েকটি ধর্মাচরণের ব্যাপারে মিলিত কাজকর্ম ও ফ্রাত্রীর কোনো লোক নিহত হলে তার শাস্তিদানের অধিকার। অধিকন্তু একটি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ফ্রাত্রী একজন প্রধানের সভাপতিত্বে নিয়মিতভাবে কয়েকটি সাধারণ ধর্মোৎসব করত, ঐ প্রধানকে বলা হতো ফিলবাসিলিউস এবং তাকে বাছাই করা হতো অভিজাতদের (ইউপেট্রাইডিস) মধ্য থেকে।

এই কথা বলেছিলেন গ্রোট মার্কস তার সঙ্গে যোগ করেছেন, 'কিন্তু গ্রীক গোত্রের মধ্যেও বন্যকে (যেমন ইরকোয়াস) স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়।' আমাদের অনুসন্ধান আরও একটু চালালেই আরও স্পষ্টভাবে সে ধরা পড়ে।

কারণ, গ্রীক গোত্রগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যও ছিল :

৭। পিতৃ-অধিকার অনুযায়ী বংশপরম্পরা।

৮। উত্তরাধিকারিণীর ক্ষেত্রে ছাড়া গোত্রের মধ্যে বিবাহের নিষেধ। এই ব্যতিক্রম এবং এর জন্য বিধানের সৃষ্টি পরিষ্কারভাবে পুরানো নিয়মের অস্তিত্বই প্রমাণ করে। আর একটি সর্বজনমান্য নিয়ম থেকেও এটি প্রমাণ হয়, যখন একজন নারী বিবাহ করে, তখন সে তার নিজের গোত্রের ধর্মীয় আচার ছেড়ে স্বামীর গোত্রের আচার গ্রহণ করে এবং স্বামীর ফ্রাত্রীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ব্যাপার থেকে এবং ডিসিয়ার্কাসের একটি বিখ্যাত অনুচ্ছেদ থেকে প্রমাণ হয় যে, গোত্রের বাইরে বিবাহই ছিল নিয়ম। 'চারিক্লিসে' বেকার সরাসরি ধরে নিয়েছেন যে, কাউকেই নিজের গোত্রের মধ্যে বিবাহ করতে দেওয়া হতো না।

৯। গোত্রে বাইরের লোক গ্রহণ করবার অধিকার; সেটা করা হতো পরিবারের মধ্যে পোষ্য নিয়ে, কিন্তু প্রকাশ্য অনুষ্ঠান করতে হতো এবং এটা ব্যতিক্রম হিসাবেই হতো।

১০। প্রধানদের নির্বাচন ও বাতিল করার অধিকার। আমরা জানি যে, প্রত্যেক গোত্রেই প্রধান থাকত, কিন্তু কোথাও শোনা যায় না যে, এই পদ গুটিকয়েক পরিবারের মধ্যে বংশানুক্রমে চলত। বর্বরতার যুগ শেষ পর্যন্ত সম্ভাবনা বংশানুক্রমিক পদের বিরুদ্ধেই, গোত্রের মধ্যে যেখানে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে একেবারে সমান অধিকারপ্রাপ্ত সে অবস্থার সঙ্গে তা একেবারে খাপ খেত না।

শুধু গ্রোটই নন, উপরন্তু নিয়েবুর, মম্‌সেন ও অপর সমস্ত প্রাচীন যুগের ইতিহাসবিদরা গোত্রের সমস্যা সমাধান করতে ব্যর্থ হন। যদিও তাঁরা যথাযথভাবে এর অনেক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিয়েছেন, তবু তাঁরা সর্বদাই একে কয়েকটি পরিবারের সমষ্টিমাত্র ভেবেছেন এবং এইজন্যই গোত্রের প্রকৃতি ও উৎপত্তি বোঝা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়। গোত্র-প্রথায় পরিবার কখনই সংগঠনের একক ছিল না এবং তা হওয়া সম্ভবও ছিল না, কারণ স্বামী ও স্ত্রী অনিবার্যভাবেই দুটি পৃথক গোত্রের লোক হতো। গোত্র ছিল সমগ্রভাবে ফ্রাত্রীর অন্তর্ভুক্ত এবং ফ্রাত্রী ছিল উপজাতির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু

পরিবারের বেলায় অর্ধেক ছিল স্বামীর গোত্রে, বাকি অর্ধেক স্ত্রীর গোত্রে। রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্রে (Public law) পরিবারকে স্বীকার করে না, আজ পর্যন্ত নাগরিক আইন (Civil law) কেবল এর অস্তিত্ব মানে। অথচ আজ পর্যন্ত আমাদের সমস্ত লিখিত ইতিহাস এই অসম্ভব ধারণা নিয়েই শুরু করেছে যে, – আঠার শতকে তা হয়ে ওঠে অলঙ্ঘ্য– একপতি পত্নী ব্যক্তিগত পরিবার, যা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সভ্যতার চেয়ে বিশেষ প্রাচীন নয়, তাকে কেন্দ্র করেই নাকি ক্রমে সমাজ ও রাষ্ট্র দানা বেঁধেছে।

মার্কস মন্তব্য করেছেন, 'শ্রী গ্রোট অনুগ্রহ করে খেয়াল রাখুন যে, গ্রীকরা পুরাণের মধ্যে গোত্রের উৎপত্তির কারণ খুঁজলেও গোত্রগুলিই ছিল তাদের নিজেদেরই সৃষ্ট দেবতা ও অর্ধদেবতা সম্বলিত পুরাণের চেয়ে প্রাচীন।'

একজন প্রামাণিক ও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হিসাবে গ্রোট থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া পছন্দ করতেন মর্গান। গ্রোট বর্ণনা করেছেন যে, এথেন্সের প্রত্যেকটি গোত্রে তথাকথিত পূর্বপুরুষ অনুযায়ী একটি নাম থাকত; সোলনের যুগের আগে পর্যন্ত সাধারণ নিয়ম হিসাবেই এবং পরে উইল না করে কেউ মারা গেলে তার গোত্রের লোকেরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো; এবং কোনো একজন নিহত হলে, প্রথমে তার আত্মীয়দের বা তারপর তার গোত্রের লোকেদের এবং শেষে নিহত ব্যক্তির ফ্রাত্রীর লোকেদের অধিকার ও কর্তব্য হতো হত্যাকারীকে আদালতে অভিযুক্ত করা, 'সর্বাধিক প্রাচীন এথেনীয় আইন বিষয়ে আমরা যা কিছু শুনেছি তা গোত্র ও ফ্রাত্রীতে বিভাগের ভিত্তিতেই গড়া।'

'স্কুল পঠিত কূপমণ্ডুকদের' (মার্কসের কথায়) কাছে একই পূর্বপুরুষ থেকে গোত্রের উৎপত্তি এব অবোধ্য ধাঁধা হয়ে ওঠে। না হয়ে উপায় কী, কারণ তাঁরা পূর্বপুরুষদের নিছক পুরাকথা বলে মনে করায় আদিতে সম্পূর্ণ অনাত্মীয় পৃথক ও স্বতন্ত্র পরিবারগুলি থেকে গোত্রের উৎপত্তি কীভাবে হলো, তার কোন ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ। তবু অন্তত গোত্রগুলির অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার জন্যও এই ধাঁধার সমাধান তাঁদের করতেই হবে। তাঁরা কথার ঘূর্ণিতে পাক খেতে লাগলেন এবং এই প্রতিপাদ্য ছাড়িয়ে যেতে পারলেন না : বংশতত্ত্ব অবশ্যই নিতান্ত উপকথা, কিন্তু গোত্র হচ্ছে বাস্তব। এবং শেষ পর্যন্ত গ্রোট বলছেন (বন্ধনীর মধ্যের মন্তব্যগুলি মার্কসের) : 'এই বংশপরম্পরার কথা আমরা কদাচিৎ শুনতে পাই, কারণ কয়েকটি অতিখ্যাত ও গুরুগম্ভীর ক্ষেত্রেই মাত্র এই কথা প্রকাশ্যে তুলে ধরা হয়। কিন্তু বিখ্যাত গোত্রগুলির মতোই কম প্রসিদ্ধ গোত্রগুলিরও সাধারণ পূজানুষ্ঠান ছিল (আশ্চর্য নয় কি শ্রী গ্রোট!) এবং তাদেরও সাধারণ অতিমানবিক পূর্বপুরুষ ও বংশপরম্পরা থাকত (এটাও কি আশ্চর্য নয় শ্রী গ্রোট কম প্রসিদ্ধ গোত্রগুলিরও!); প্রধান ছক ও আদর্শ ভিত্তি (হায় পণ্ডিতপ্রবর, আদর্শ নয়, রক্তমাংসের ভিত্তি, germanice[৪২], fleischlich!) সকলের বেলায় এক ছিল।'

এই বক্তব্যের জবাবে মর্গানের উক্তিকে মার্কস সংক্ষেপে এইভাবে রেখেছেন, 'গোত্রের আদিম রূপ অনুযায়ী আত্মীয়তাবিধি – অন্যসব নশ্বরদের মতো গ্রীকদেরও এককালে এ জিনিস ছিল – এর মধ্যেই গোত্রের সকল সদস্যের পরস্পর-সম্পর্কের জ্ঞান বেঁচে থেকেছে। তাদের পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বের এই ব্যাপারটি তারা শৈশব থেকে আচার

৪২. সোজা জার্মানে। – সম্পাঃ

ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে শিখত। একপতিপত্নী পরিবার দেখা দেবার পর এই জিনিস বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে গেল। গোত্রের নাম এমন একটি বংশধারা সৃষ্টি করেছিল যার সঙ্গে আলাদা পরিবারের বংশধারাকে তুচ্ছ মনে করে। এই গোত্রের নামে এবার নামধারীদের একই সাধারণ আদি পুরুষের নিশ্চয়তা থাকে, কিন্তু গোত্রের বংশকাণ্ড এতদূর অতীতের মধ্যে প্রসারিত যে, এর অন্তর্ভুক্ত সভ্যরা তাদের পরস্পর আত্মীয়তার প্রমাণ আর দিতে পারত না, ব্যতিক্রম হলো সেই কয়েকটি ক্ষেত্র যেখানে পরবর্তীকালের সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিল। নামই ছিল একবংশজাত হবার প্রমাণ এবং কেবলমাত্র বাইরের লোককে পোষ্যগ্রহণের ক্ষেত্র ছাড়া এইটাই ছিল চূড়ান্ত প্রমাণ। গোত্রের সদস্যদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক কার্যত অস্বীকার করায়– যেমনটি গ্রোট ও নিয়েবুর করেছেন – গোত্রকে একটি অলীক কপোল-কল্পনায় পরিণত করা হয়। এই রূপ কাজ কিন্তু 'ভাববাদী' বিজ্ঞানীদের অর্থাৎ কূনো গ্রন্থকীটদেরই সাজে। যেহেতু বিশেষত একপতিপত্নীত্ব আসবার পর থেকে বংশক্রমের যোগাযোগ দূরে পড়ে যায় এবং অতীতের বাস্তবতা পুরাণকথার উদ্ভট কল্পনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, সেইজন্যই ভালোমানুষ কূপমণ্ডূকেরা সিদ্ধান্ত করলেন এবং এখনও করছেন যে, কল্পিত বংশ পরম্পরা বাস্তব গোত্রগুলিকে সৃষ্টি করল।'

আমেরিকানদের মতো এখানেও ফ্রাত্রীই গোত্র-জননী, এটিই খণ্ডিত হয়ে কয়েকটি গোত্র সন্ততি হয়। সেইসঙ্গে এই গোত্র-জননী তাদের ঐক্যও বজায় রাখে এবং প্রায়ই একই আদিম জনক থেকে তাদের সকলের সম্পর্ক টানত। যেমন, গ্রোটের কথায়, 'হেকাটিউস ফ্রাত্রীর সমস্ত সমসাময়িক সদস্যেরা একই দেবতাকে ষোল পুরুষ আগের আদিম জনক বলে মনে করত', তাই এই ফ্রাত্রীর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গোত্র হলো আক্ষরিকভাবে ভ্রাতৃগোত্র। হোমার পর্যন্ত ফ্রাত্রীকে সামরিক একক বলে উল্লেখ করেছেন সেই বিখ্যাত অনুচ্ছেদটিতে, যেখানে নেষ্টর আগামেম্‌নসকে উপদেশ দিচ্ছেন, 'ফ্রাত্রী ও উপজাতি হিসাবে সৈন্য সাজাও যাতে ফ্রাত্রী ফ্রাত্রীকে এবং উপজাতি উপজাতিকে সাহায্য করতে পারে।' ফ্রাত্রীর আর একটি অধিকার ও কর্তব্য হচ্ছে যে কোনো সদস্যের হত্যাকারীর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করা, এ থেকে বোঝা যায়, অতীতে এর রক্তের বদলা দায়িত্বও ছিল। অতিকন্তু এর ছিল সাধারণ পবিত্র স্থানগুলি এবং উৎসব; আর্যদের ঐতিহ্যগত প্রাচীন প্রকৃতিপূজা থেকে প্রাপ্ত গ্রীকদের সমগ্র পুরাণের বিকাশ ঘটেছিল মূলতঃ গোত্র ও ফ্রাত্রীর জন্য এবং তার ভেতরেই এটা চলল। ফ্রাত্রীর থাকত একজন প্রধান (ফ্রাত্রীয়ার্কস) এবং দ্য'কুলাঁজের মতে, বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত করবার অধিকারসম্পন্ন সভা, ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসন। এমনকি পরবর্তী কালের রাষ্ট্র গোত্রকে গ্রাহ্য না করলেও ফ্রাত্রীর হাতে প্রশাসনের কয়েকটি সামাজিক কাজ রেখে দিয়েছিল।

কয়েকটি আত্মীয় ফ্রাত্রী মিলে একটি উপজাতি হতো। অ্যাটিকাতে প্রতি উপজাতিতে তিনটি করে ফ্রাত্রী নিয়ে চারটি উপজাতি ছিল এবং এক একটি ফ্রাত্রীতে ত্রিশটি করে গোত্র ছিল। এইরকম নিখুঁত ভাগাভাগি দেখে ধরে নিতে হয় যে, সমাজ ব্যবস্থার স্বতঃস্ফূর্ত ধারাকে একটি সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে নিয়মিত করা হয়েছিল। কেমন করে, কখন ও কেন এই ব্যাপারটি করা হয়, তার কোনো সন্ধান গ্রীক ইতিহাসে

মেলে না, কারণ গ্রীকরা প্রাকবীর যুগের স্মৃতি রক্ষা করেনি।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে ঘন বসতির মধ্যে বাস করায় গ্রীকদের মধ্যে উপভাষার পার্থক্য ততটা সুস্পষ্ট হয়নি, যতটা আমেরিকার বিস্তীর্ণ বনভূমিতে দেখা দিয়েছিল। তবু এখানেও আমরা দেখি যে, একই প্রধান উপভাষা ব্যবহার করে এমন উপজাতিগুলিই কেবল বৃহত্তর জনসমষ্টিতে একত্রিত হয়; এবং ক্ষুদ্র অ্যাটিকার পর্যন্ত নিজস্ব উপভাষা ছিল ও সেইটিই পরে গ্রীক গদ্যের সাধারণ ভাষা হয়ে ওঠে।

হোমারের মহাকাব্যে আমরা সাধারণত দেখি যে, গ্রীক উপজাতিগুলি তখনই মিলিত হয়ে ছোট ছোট জাতিসত্তা সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু সেই জাতির অভ্যন্তরে গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতিগুলির পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন ছিল। ইতিমধ্যেই তারা প্রাচীর-বেষ্টিত নগরে বাস করছে। পশুযূথগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি, ক্ষেত্র-কর্ষণ বিস্তারে এবং হস্তশিল্পের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। এই সঙ্গে সম্পদের পার্থক্য বেড়ে উঠল এবং এর ফলে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা প্রাচীন গণতন্ত্রের মধ্যে একটা আভিজাতিক উপাদান দেখা দেয়। বিভিন্ন ছোট ছোট জাতিগুলি উত্তম ভূমি দখলের জন্য এবং সামরিক লুণ্ঠনের জন্যও অবিরত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকত। ইতিমধ্যেই যুদ্ধবন্দীদের দাসে পরিণত করা একটি স্বীকৃত প্রথায় পরিণত হয়েছিল।

এইসব উপজাতি ও জাতিসত্তাগুলির সংবিধান ছিল নিম্নরূপ :

১। **স্থায়ী কর্তৃপক্ষ ছিল পরিষদ** (bule)। সূচনায় এটি খুব সম্ভব গোত্র প্রধানদের নিয়ে গঠিত হতো, কিন্তু পরে তাদের সংখ্যা খুব বেড়ে যাওয়ার ফলে এদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করা হতো এবং এতে আভিজাতিক উপাদানটির বিকাশ ও শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ ঘটে। ডায়োনিসিউস স্পষ্টত বলেছেন যে, বীর যুগের পরিষদগুলি অভিজাতদের (kratistoi) নিয়ে গঠিত হতো। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এই পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এস্কাইলাসের রচনায় দেখি যে, থিবিসের পরিষদ সেই ক্ষেত্রে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করল যে, ইটিয়োক্লিসের দেহ পূর্ণ সম্মানের সঙ্গে কবরস্থ করা হবে এবং পলিনিসিসের দেহ কুকুরদের ভোজ্য হিসাবে ফেলে দেওয়া হবে। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিষদ সেনেটে রূপান্তরিত হয়।

২। **জনসভা** (agora) ইরকোয়াসদের মধ্যে আমরা দেখেছি যে, স্ত্রী পুরুষ পরিষদের অধিবেশনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকত, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করত এবং তার মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করত। হোমারের গ্রীকদের মধ্যে, সাবেকী জার্মান আইনের ভাষায় এই ঘিরে দাঁড়ানো (Umstand) একটি পুরোপুরি জনসভায় পরিণত হয়; প্রাচীন জার্মানদের মধ্যেও একই ব্যাপার ঘটে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য পরিষদ এই জনসভা আহ্বান করত; প্রত্যেক পুরুষেরই বলবার অধিকার থাকত এবং সিদ্ধান্ত হতো হাত তুলে (এস্কাইলাস তাঁর 'প্রার্থিনী' রচনায় তা লিখেছেন) অথবা ধ্বনি দিয়ে। এই সিদ্ধান্ত হতো সার্বভৌম ও চূড়ান্ত, কারণ শ্যেমান তার 'গ্রীসের প্রাচীন কথা'য়[৪৩] যেমন বলেছেন : 'যেক্ষেত্রে এমন কোন বিষয়ে আলোচনা হতো যা কার্যকরী করতে হলে জনগণের সহযোগিতা দরকার, সে সব ক্ষেত্রে হোমার

৪৩.G. F Schomann, Griechische Alterthumer,m Bd,. I-II, Berlem 1855-59. - সম্পাঃ

আমাদের কাছে এমন কোনো ইঙ্গিত রেখে যাননি যাতে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জনগণকে জোর করে তা করানো হতো।' এই সময়ে যখন উপজাতিটির প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই যোদ্ধা, তখন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সামাজিক কর্তৃপক্ষ ছিল না যা জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যায়। আদিম গণতন্ত্রের তখন পূর্ণবিকাশের যুগ এবং পরিষদ ও basileus এর প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতার বিচার করতে গেলে এই কথাটা থেকেই শুরু করতে হবে।

৩। **সমরনায়ক** (basileus)। এই বিষয়ে মার্কস নিচের মন্তব্যটি করেছেন, 'ইউরোপীয় পণ্ডিতকুল যাঁদের অধিকাংশই আজন্ম রাজারাজড়াদের ভৃত্য, তাঁরা বাসিলিয়ুসকে আধুনিক অর্থের রাজায় রূপান্তরিত করেন। ইয়াঙ্কি-প্রজাতন্ত্রী মর্গান এতে আপত্তি করেছেন। তীব্র বিদ্রুপের সঙ্গে কিন্তু যথার্থভাবেই তিনি তৈলাক্ত গ্ল্যাডস্টোন সাহেব ও তাঁর 'জগতের যৌবনের'[৪৪] কথা বলেছেন, 'শ্রী গ্ল্যাডস্টোন যিনি পাঠকদের কাছে বীর যুগের গ্রীক নায়কদের রাজা মহারাজা হিসাবে উপস্থিত করতে চেয়েছেন এবং তার সঙ্গে জেন্টলম্যানের গুণ জুড়ে দিয়েছেন, তিনিও মানতে বাধ্য হয়েছেন যে, মোটের উপর যে জ্যেষ্ঠাধিকার রীতি বা আইনটা পাই তা যথেষ্টরূপে হলেও অতি সুস্পষ্টরূপে যেন নির্দিষ্ট নয়।' বস্তু শ্রী গ্ল্যাডস্টোনের নিজেরই কাছে এটা বোঝার কথা যে যথেষ্টরূপে হলেও অতি সুস্পষ্টরূপে যা নির্দিষ্ট নয় তেমন একটা আপতিক জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথার মূল্য নেই বললেই চলে।

ইরকোয়াস ও অন্যান্য ইন্ডিয়ানদের মধ্যে প্রধানদের পদের বেলায় বংশানুক্রমিকতার ব্যাপারটা ঠিক কী ছিল তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। যেহেতু সমস্ত পদাধিকারীই নির্বাচিত হতেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোত্রের মধ্যে থেকেই, তাই সেই পরিমাণে পদগুলি গোত্রের মধ্যে বংশানুক্রমিক ছিল। ক্রমে ক্রমে শূন্যস্থান পূর্ণ করবার জন্য প্রাক্তন পদাধিকারীর নিকটতম আত্মীয় – তার ভাই অথবা ভাগিনেয়কেই অগ্রাধিকার দেওয়া হতো, যদি না তাকে বাদ দেবার কোনো বিশেষ কারণ থাকত। পিতৃ-অধিকারের আমলে গ্রীসে বাসিলিয়ুসের পদ সাধারণতঃ বাপ থেকে ছেলেতে বা ছেলেদের একজনের উপর অর্সাত, এই ঘটনা শুধু এই ইঙ্গিত করে যে, সামাজিক নির্বাচন মারফত পদাধিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলের অনুকূলে হতো, সামাজিক নির্বাচন ছাড়াই বৈধ উত্তরাধিকার তা মোটেই বোঝায় না। এখানেই আমরা লক্ষ্য করি যে, ইরকোয়াস ও গ্রীকদের মধ্যে গোত্রের ভিতর বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারগুলির প্রাথমিক ভ্রূণ দেখা দিচ্ছে এবং গ্রীকদের ক্ষেত্রে তাছাড়া ভবিষ্যতের বংশানুক্রমিক প্রধান বা রাজার সূচনাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অতএব অনুমান করা চলে যে, গ্রীকদের মধ্যে বাসিলিয়ুস হয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতো অথবা তার পদগ্রহণে জনগণের স্বীকৃত সংস্থা – পরিষদ অথবা আগোরার সম্মতি দরকার হতো, যেমনটি হতো রোমকদের 'রাজার' (rex) ক্ষেত্রে।

'ইলিয়ডে' নরশাসক আগামেম্‌নসকে গ্রীকদের মহারাজা রূপে দেখতে পাই না,

৪৪ W.E. Gladstone, Juventus Mundi, The Gods And Men of the Heroic Age, London, 1869. – সম্পা:

তাঁকে দেখি একটি অবরুদ্ধ নগরীর সামনে সম্মিলিত সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি রূপে। যখন গ্রীকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল, তখন অডিসিউস তাঁর এই গুণেরই উল্লেখ করেছেন সেই বিখ্যাত অনুচ্ছেদে : অনেক সেনাপতি ভালো নয়, একটিমাত্র সর্বাধিনায়ক দরকার ইত্যাদি (তারপর রাজদণ্ড বিষয়ক জনপ্রিয় শ্লোক আছে, কিন্তু সেটা যুক্ত হয়েছে পরে)। 'এখানে অডিসিউস সরকারের রূপ নিয়ে বক্তৃতা করেননি, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়কের কাছে অধীনতার দাবি জানিয়েছেন। ট্রয় নগরীর সামনে যে গ্রীকরা এসেছে কেবল সৈন্যবাহিনী হিসাবে, তাদের আগোরা যথেষ্ট গণতান্ত্রিক। উপহার অর্থাৎ লুণ্ঠিত সম্পদের বণ্টনের কথা বলবার সময় আকিলিস কখনও আগামেম্নস অথবা অপর কোনো বাসিলিয়ুসকে বণ্টনকর্তা বলেননি, সর্বদাই তিনি উল্লেখ করছেন 'এখিয়াসদের পুত্রগণ' অর্থাৎ জনগণ। 'জিউস পুত্র', 'জিউস কর্তৃক লালিত' প্রভৃতি বিশেষণগুলি কোনো কিছুই প্রমাণ করে না, কারণ প্রত্যেকটি গোত্রই কোনো না কোনো দেবতার বংশোদ্ভূত এবং উপজাতির প্রধানের গোত্র আবার একটি 'প্রধান' দেবতা, এ ক্ষেত্রে জিউসের বংশোদ্ভুত। এমনকি 'অডিসিতে' সুতরাং 'ইলিয়ডের' অনেক পরের যুগেও শূকরপালক ইউমেন প্রভৃতি গোলামেরাও 'দিব্য' জন (dioi বা theioi)। একইভাবে আমরা 'অডিসিতে' দূত মুলিয়স ও অন্ধ চারণ ডেমোডোকাসকেও বীর আখ্যায় ভূষিত দেখি। সংক্ষেপে বলা যায় যে, basileia এই যে শব্দটি গ্রীক লেখকরা হোমারের তথাকথিত রাজক্ষমতার অর্থে ব্যবহার করে যদিও তার পাশাপাশি পরিষদ ও জনসভা আছে, এটির মানে মাত্র সামরিক গণতন্ত্র (যেহেতু সামরিক নেতৃত্বই এর মূল বৈশিষ্ট্য)' (মার্কস)।

সামরিক কার্যকলাপ ছাড়াও বাসিলিয়ুসের পুরোহিতের ও বিচারকদের দায়িত্ব ছিল; এই শেষোক্ত দায়িত্ব স্পষ্ট করে নির্দিষ্ট করা নেই, কিন্তু প্রথমটি তিনি উপজাতি অথবা উপজাতি সমামেলের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি হিসাবে পালন করতেন। কোথাও বেসামরিক প্রশাসনিক অধিকারের উল্লেখও দেখা যায় না, কিন্তু তিনি পদাধিকারবলে সম্ভবত পরিষদের সভ্য। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে তাই 'বাসিলিয়ুসকে' অনুবাদে জার্মান শব্দ Konig বলা খুবই নির্ভুল, কারণ Konig (Kuning) কথাটা এসেছে Kuni, Kunne থেকে এবং তাতে বোঝায় 'গোত্রের প্রধান'। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক শব্দ বাসিলিয়ুস কোনক্রমেই আধুনিক অর্থে Konig (রাজা) শব্দের কিছুতেই সমার্থজ্ঞাপক নয়। থুসিডাইডিস স্পষ্টই পুরাতন basileia-কে partike বলেছেন, অর্থাৎ গোত্র থেকে উদ্ভূত এবং তিনি বলছেন যে, এর নির্দিষ্ট সুতরাং সীমাবদ্ধ অধিকার ছিল। আর আরিস্টটল বলেছেন যে, বীর যুগের basileia হচ্ছে স্বাধীন মানুষদের একটা নেতৃত্ব এবং বাসিলিয়ুস হলেন সমরনায়ক, বিচারক ও প্রধান পুরোহিত; অতএব পরবর্তী কালের অর্থে বাসিলিয়ুসের কোনো শাসনক্ষমতা ছিল না।[৪৫]

৪৫ . গ্রীক বাসিলিয়ুসের মতো আজটেক সমরনায়ককে ভুল করে আধুনিক অর্থে রাজা হিসাবে দেখান হয়েছিল।
স্পেনীয়রা প্রথমে ভুল বুঝে ও অতিশয়োক্তি করে এবং পরে ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ঘটিয়ে যে বিবরণ দেয় তার প্রথম ইতিহাসগত সমালোচনা করে মর্গান দেখান যে, মেক্সিকানরা বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তরে ছিল, কিন্তু নিউ মেক্সিকোর পুয়েব্লো ইন্ডিয়ানদের চেয়ে কিছুটা উন্নত পর্যায়ে এবং বিকৃত বিবরণগুলি থেকে যতটা বোঝা যায়, তাদের সামাজিক পদ্ধতিও ছিল সেইরকম : তিনটি উপজাতির সমামেল - এদের অধীন কয়েকটি করদ উপজাতি ছিল; শাসন চালাত একটি সমামেলের পরিষদ আর একজন সমামেলের সমরনায়ক যাকে স্পেনীয়রা 'সম্রাট' রূপান্তরিত করেছিল।' (এঙ্গেলসের টীকা।)

এইভাবে আমরা বীর যুগের গ্রীকদের সংবিধানে দেখি যে, প্রাচীন গোত্র-সংগঠন তখনও পূর্ণ উদ্যমে চলছে; কিন্তু আমরা তার বিলুপ্তির সূত্রপাতও দেখতে পাই; পিতৃ-অধিকার এবং সন্তানসন্ততি কর্তৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার, যার ফলে পরিবারের মধ্যে সম্পদ সঞ্চয়ে সাহায্য হলো এবং গোত্রের বিরুদ্ধে পরিবারকে শক্তি যোগাল; ধনের অসমতা, বংশানুক্রমিক অভিজাতকুল ও রাজতন্ত্রের প্রাথমিক ভ্রূণ সৃষ্টি করে যা সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করল; দাসপ্রথা, যা প্রথমে যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই উপজাতির অন্যান্য ব্যক্তি, এমনকি গোত্রের সদস্যদেরও দাসত্ববন্ধনের পথ করছিল, আন্তউপজাতি যুদ্ধ থেকে গবাদি পশু, দাস ও সম্পদ লুট করে নিয়মিত জীবিকানির্বাহের উপায় হিসাবে স্থলে জলে নিয়মিত হানায় অধঃপতন; সংক্ষেপে – ধনের প্রশস্তি শুরু হলো ও তাকেই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ বলে সম্মান করা হলো এবং গোত্রের সাবেকী বিধি বিধানকে বিকৃত করা হলো বলপূর্বক ধন লুণ্ঠন সমর্থনের জন্য। কেবলমাত্র একটি জিনিসের তখনও অভাব ছিল : একটি প্রতিষ্ঠান যা নবলব্ধ ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে গোত্র-ব্যবস্থার সাম্যতন্ত্রী ঐতিহ্য থেকে শুধু যে বাঁচবে তাই নয়, এতদিন যাকে হেয় জ্ঞান করা হতো সেই ব্যক্তিগত মালিকানাকে পবিত্র করবে, সেই পবিত্রকরণকে মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলে ঘোষণা করবে শুধু তাই নয়, অধিকন্তু সম্পত্তি আহরণের ক্রমবিকাশমান নতুন রূপগুলির উপর এবং সুতরাং ধনবৃদ্ধি ত্বরান্বয়ণের উপর সাধারণ সামাজিক অনুমোদনের ছাপ দিয়ে দেবে; এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার বলে সমাজের উদীয়মান শ্রেণী বিভাগ শুধু নয়, পরন্তু বিত্তশালী শ্রেণী কর্তৃক বিত্তহীন শ্রেণীগুলিকে শোষণ করার অধিকার, বিত্তহীনদের উপর বিত্তবানদের শাসনও চিরস্থায়ী করবে।

এবং সে প্রতিষ্ঠান এল। উদ্ভাবিত হলো রাষ্ট্র।

৫
এথেনীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি

কেমন করে রাষ্ট্র বিকশিত হলো, – নতুন নতুন সংস্থার আগমনে গোত্র প্রথার কোনো কোনো সংস্থা রূপান্তরিত হলো, কোনো কোনো সংস্থা স্থানচ্যুত হলো এবং শেষ পর্যন্ত সবই উৎখাত করল একটা সত্যিকার সরকারী কর্তৃপক্ষ আর গোত্র ফ্রাত্রী ও উপজাতির মাধ্যমে আত্মরক্ষাপরায়ণ আসল 'সশস্ত্র জনগণের' জায়গায় এল সে কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ, সুতরাং জনগণের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য একটি সশস্ত্র 'সরকারী ক্ষমতা', – এসব কিছুই অন্তত প্রাথমিক অবস্থায় প্রাচীন এথেন্সের মতো স্পষ্টভাবে আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই পরিবর্তনের রূপগুলি প্রধানত মর্গানই বিবৃত করেছেন; যেসব অর্থনৈতিক কারণে এটিকে সম্ভব করেছিল সেটা প্রধানত আমিই যোগ দিয়েছি।

বীর-যুগের চারটি এথেনীয় উপজাতি তখনও অ্যাটিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করত। এমনকি যে বারোটি ফ্রাত্রী নিয়ে তারা গঠিত ছিল তারাও কেক্রপ্সের বারোটি নগরে তখনো পৃথকভাবে অধিষ্ঠিত ছিল বলে মনে হয়। এদের সংবিধান ছিল বীরযুগের মতো : জনসভা, জনপরিষদ ও একজন বাসিলিয়ুস। লিখিত ইতিহাস থেকে যতটা পাওয়া যায় তাতে আমরা দেখি যে, ভূমি তখনই বিভক্ত হয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে, – এটি বর্বরতার উচ্চতম স্তরের শেষ দিককার পণ্য-উৎপাদনের অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা এবং তদুপযোগী পণ্য বাণিজ্যের সঙ্গে মেলে। খাদ্যশস্য ছাড়া সুরা ও তৈলও উৎপন্ন হতো। ইজিয়ান সাগরের বাণিজ্য ক্রমেই ফিনিশীয়দের হাত থেকে অ্যাটিক গ্রীকদের হাতে আসে। জমি কেনাবেচা এবং কৃষি ও হস্তশিল্প, বাণিজ্য ও নৌ চালনায় ক্রমবর্ধিত শ্রমবিভাগের জন্য বিভিন্ন গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির সদস্যরা অচিরে মিশ্রিত হয়ে গেল। একটি ফ্রাত্রী বা উপজাতির বাসভূমিতে এমন সব অধিবাসী এল যারা একই দেশের লোক হলেও এদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং সেইজন্য স্বীয় বাসভূমিতেই তারা পরবাসী হয়ে রইল। কেননা শান্তির সময় প্রত্যেকটি ফ্রাত্রী ও উপজাতি এথেন্সের জনপরিষদ অথবা বাসিলিয়ুসের অপেক্ষা না করেই নিজেদের এলাকায় কাজকর্ম চালাত। কিন্তু এলাকার যেসব অধিবাসীরা ফ্রাত্রী বা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা স্বাভাবিক ভাবে শাসনকার্যে অংশ নিতে পারত না।

এর ফলে গোত্র প্রথার সংস্থাগুলির নিয়মিত কাজে এত বিশৃঙ্খলা ঘটল যে, বীর-যুগেই এর প্রতিকার দরকার হয়ে পড়ে। এইজন্য একটি সংবিধান প্রচলিত হলো যা থিসিউসের নামে চলে। এই পরিবর্তনের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এথেন্সে একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ যেসব ব্যাপার এতদিন উপজাতিগুলি স্বাধীনভাবে চালিয়ে

এসেছে তার কতকগুলিকে সাধারণ ব্যাপার ঘোষণা করে এথেন্সে অবস্থিত একটি সাধারণ পরিষদে হস্তান্তরিত হলো। এইভাবে আমেরিকার যে-কোনো আদিম অধিবাসীরা যা করতে পেরেছে তার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেল এথেনীয়রা : প্রতিবেশী উপজাতিগুলির একটি সরল সমামেলের জায়গায় এখানে সমস্ত উপজাতি পরস্পরের মধ্যে বিলীন হয়ে একটিমাত্র জাতি তৈরি হলো। এর ফলে সর্বজনীন এক এথেনীয় আইনের উদ্ভব হলো যার স্থান উপজাতি ও গোত্রগুলির আইনী প্রথার চেয়ে উচ্চে। এতে প্রত্যেক এথেন্সবাসী এমন কতকগুলি আইনের সুবিধা ও সংরক্ষণ পেল যা সে স্বীয় উপজাতির এলাকার বাইরেও ভোগ করবে। কিন্তু এইটাই হচ্ছে গোত্র-প্রথার ভিত্তি হানির প্রথম পদক্ষেপ, কেননা সমস্ত অ্যাটিক উপজাতিদের কাছেই যারা বিজাতীয়, এথেনীয় গোত্র-প্রথার যারা বাইরে ছিল তাদের পরে এর অন্তর্ভুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ এটি। দ্বিতীয় আর একটি কীর্তি যা থিসিউসের নামে প্রচলিত সেটি সমগ্র জনগণকে গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতি নির্বিশেষে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করল : ইউপেট্রাইডিস (eupatrides) অথবা অভিজাত, জিওমোরই (geomoroi) বা জমির চাষী; এবং ডেমিয়ার্গি (demiurgi) বা হস্তশিল্পী এবং কেবল অভিজাতদেরই সরকারী পদের অধিকার দেওয়া হলো। এ কথা সত্য যে, অভিজাতদের পদের অধিকার দেওয়া ছাড়া অন্য বিষয়ে এই শ্রেণী-বিভাগের কোনো ফল হয়নি, কারণ এতে শ্রেণীগুলির মধ্যে অধিকারগত আর কোনও পার্থক্য সৃষ্টি করেনি। কিন্তু এটি গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে, নতুন যেসব সামাজিক উপাদান নীরবে বেড়ে উঠছে তারা এর মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে। এতে দেখতে পাচ্ছি যে, গোত্রের কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সমাজের পদ-বণ্টন প্রচলিত রীতির স্তর ছাড়িয়ে এই পরিবারগুলির বিশেষ অধিকার হয়ে উঠেছে, এবং তার বিরুদ্ধতা প্রায় নেই। এই পরিবারগুলি ইতিমধ্যেই সম্পত্তি সঞ্চয় করে শক্তিশালী হয়েছিল. এখন তারা গোত্রের বাইরে একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীরূপে মিলিত হতে শুরু করল এবং উদীয়মান রাষ্ট্র তাদের এই জবরদখল মেনে নিল। অধিকন্তু, এতে আরও দেখা যাচ্ছে যে, কৃষক ও কুটির শিল্পের মধ্যে শ্রমবিভাগ এত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যে, গোত্র ও উপজাতি নিয়ে পুরানো বিভাগের সামাজিক তাৎপর্য আর গুরুত্বপূর্ণ থাকছে না। সর্বশেষে এতে ঘোষিত হলো যে, গোত্রভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরোধ মিটবার নয়। রাষ্ট্রগঠনের প্রথম চেষ্টাটা হলো প্রতি গোত্রের সভ্যদের সুবিধাভোগী ও অবনত, এবং শেষোক্তদের আবার পেশাগতভাবে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে ও এইভাবে একের বিরুদ্ধে অপরকে লাগিয়ে গোত্র-সম্পর্ক ভাঙা।

সোলনের যুগ পর্যন্ত এথেন্সের পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। বাসিলিয়ুসের পদের ভূমিকা ক্রমেই উঠে যেতে থাকে; অভিজাতদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত প্রধানরা রাষ্ট্রের মাথা হয়ে উঠল। অভিজাতদের ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ অসহ্য হয়ে উঠল। জনস্বাধীনতা দলনের মূল হাতিয়ার ছিল অর্থ ও মহাজনী। অভিজাতেরা সাধারণত এথেন্সের ভিতরে বা কাছাকাছি বসবাস করত এবং সমুদ্রবাহিত বাণিজ্য ও তখনো মাঝে মাঝে অনুসৃত নৌ দস্যুতায় তাদের ধন বাড়ত। এই থেকেই বিকাশমান মুদ্রা ব্যবস্থা ক্ষয়কারী দ্রাবকের মতো

স্বাভাবিক অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য জনসমষ্টিগুলির চিরাচরিত জীবনযাত্রার মধ্যে প্রবেশ করল। গোত্র-প্রথা মুদ্রা ব্যবস্থার সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। অ্যাটিকার ছোট কৃষিজীবিদের যে ধ্বংস হয়, সেটা তাদের রক্ষক সাবেকী গোত্র-বন্ধনের শিথিলতার সঙ্গে মিলে যায়। পাওনাদারের বিল এবং জমিতে বন্ধকী কবুলিয়ত – এথেনীয়রা এই সময় জমিতে বন্ধকী প্রথাও আবিষ্কার করেছিল – গোত্র অথবা ফ্রাত্রী কোন কিছুরই খাতির করত না; কিন্তু সাবেকী গোত্র-প্রথায় মুদ্রা, দাদন বা আর্থিক ঋণ এইসব একেবারে অজ্ঞাত ছিল। তাই অভিজাতদের ক্রমবর্ধমান মুদ্রা-শাসন থেকে দেখা দিল একটা নতুন প্রথাগত আইন (law of custom) যা দেনাদারের বিরুদ্ধে মহাজনকে রক্ষা করত এবং অর্থপতি কর্তৃক ছোট কৃষকের শোষণ মঞ্জুর করত। অ্যাটিকার গ্রাম্য জেলাগুলিতে সর্বত্র বন্ধকী খুঁটি গিজগিজ করত, তাতে বিজ্ঞপ্তি দেখা যেত যে, এটি যে ভূখণ্ডে রয়েছে সেটি অমুকের কাছে এত টাকায় বন্ধক আছে। যেসব ক্ষেত্রে এরকম কোনো চিহ্ন থাকত না, সেগুলির অধিকাংশই অনাদায়ী বন্ধকী ঋণের দরুন অথবা সুদ দিতে না পারায় বিক্রি হয়ে গিয়ে কোনো অভিজাত মহাজনের সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল; প্রজা হিসাবে থাকতে পেলেই কৃষককে খুশি হতে হতো এবং নতুন মালিককে খাজনা হিসাবে উৎপন্ন ফসলের ছয়ভাগের পাঁচভাগ দিয়ে সে বাকি একভাগে জীবনযাপন করত। এতেই শেষ হতো না। যদি জমি বিক্রয়ের টাকা দিয়ে দেনা শোধ না হতো কিংবা যদি দেনা শোধের মতো কোনো বন্ধক না থাকত, তাহলে দেনাদার ছেলেমেয়েদের ক্রীতদাস রূপে বিদেশে বিক্রি করে মহাজনের দাবি মেটাত। পিতা কর্তৃক ছেলেমেয়ে বিক্রি, এই হলো পিতৃ-অধিকার ও একপতিপত্নীত্বের প্রথম ফল! এবং এতেও যদি রক্তচোষাটার তৃপ্তি না হতো, তাহলে দেনাদারকেই সে দাস হিসাবে বিক্রি করতে পারত। এই হলো এথেনীয় জনগণের মধ্যে সভ্যতার আনন্দোজ্জ্বল অরুণোদয়।

আগে যখন জনগণের জীবনযাত্রার অবস্থা গোত্র-প্রথার অনুযায়ী ছিল, তখন এই ধরনের বিপ্লব সম্ভব ছিল না; কিন্তু এখন এই ব্যাপার যে কী করে এসে গেল, কেউ তা জানতে পারেনি। ইরকোয়াসদের দিকে একবার ফিরে দেখা যাক। এথেনীয়দের ওপর যেটা বলা যেতে পারে তাদের কৃতকর্ম ছাড়াই এবং অবশ্যই ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখন তাদের উপর চেপে বসল, তেমনধারা অবস্থা ইরকোয়াসদের কাছে ধারণার অতীত ছিল। সেখানে জীবনোপকরণের যে উৎপাদন-পদ্ধতি বৎসরের পর বৎসর অপরিবর্তিত থাকত তাতে এই ধরনের সংঘর্ষ আসতেই পারত না, যে সংঘর্ষকে বাইরে থেকে আসা মনে হতো; আসতে পারত না এই ধনী ও দরিদ্র, শোষক ও শোষিতের বিরোধ। ইরকোয়াসরা তখন প্রকৃতির শক্তিগুলিকে বশে আনার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল, কিন্তু প্রকৃতি-নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে তারা ছিল নিজেদের উৎপাদনের প্রভু। তাদের ছোট ছোট বাগিচার ফসলহানি, হ্রদও নদীতে মাছ অথবা বনে শিকার দুর্লভ হওয়ার কথা ছেড়ে দিলে তারা আগে থেকে জানত যে তাদের জীবিকার্জন পদ্ধতির ফল কী হবে। ফল হবে জীবনোপকরণ, তা প্রচুর হোক অথবা অপ্রচুর হোক, কিন্তু অচিন্তিত এক সামাজিক ওলটপালট, গোত্রের বন্ধন-ছেদন অথবা গোত্র ও উপজাতির সদস্যরা বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পরস্পর সংগ্রাম করবে এমন ফল কখনো হতে পারত না। খুব সঙ্কীর্ণ গণ্ডির

মধ্যে উৎপাদন চালাতে হতো, কিন্তু উৎপাদকরাই উৎপন্ন জিনিসের উপর দখল রাখতো। বর্বর-যুগের উৎপাদন-প্রণালীর এই অসীম সুবিধাটাই সভ্যতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেল। প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জের উপর মানুষের এখন যে অপরিসীম ক্ষমতা তার ভিত্তিতে এবং বর্তমানে যে স্বাধীন সহযোগিতা সম্ভব হয়ে উঠেছে তার ভিত্তিতে এই সুবিধা আবার ফিরে পাওয়াই হবে পরবর্তী পুরুষদের কর্তব্য।

গ্রীকদের মধ্যে অবস্থা ছিল অন্যরকম। গবাদি পশুযূথ ও বিলাসদ্রব্য নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আর্বিভাবের ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময় প্রচলিত হলো, উৎপন্ন রূপান্তরিত হলো পণ্যে। পরে যে বিপ্লব দেখা দেয় তার মূলটাই এখানে। উৎপাদকরা যেই নিজেদের উৎপন্ন জিনিস আর প্রত্যক্ষভাবে ভোগ না করে বিনিময়ের মধ্যে একে হাতছাড়া করল, অমনি তারা এর উপর দখল হারাল। সে উৎপন্নের কী গতি হবে সেটা তারা আর জানতে পারত না, এবং এমন একটি সম্ভাবনা দেখা দিল যাতে একদিন উৎপাদকদের বিরুদ্ধেই উৎপন্নকে প্রয়োগ করা হবে, তাদের শোষণ ও পীড়নের মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হবে। এইজন্যই কোন সমাজব্যবস্থাই দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের উৎপন্ন জিনিসের প্রভু হয়ে থাকতে ও উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সামাজিক ফলাফল নিয়ন্ত্রাণাধীন রাখতে পারে না যদি না সে সমাজ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়ের অবসান করে।

এথেনীয়রা কিন্তু খুব শীঘ্রই টের পেল যে ব্যক্তিদের মধ্যে বিনিময় শুরু ও উৎপন্ন জিনিস পণ্যে পরিণত হবার পর কত শীঘ্র উৎপাদকদের ওপর পণ্যের প্রভুত্ব শুরু হয়ে যায়। পণ্য-উৎপাদনের সঙ্গেই এল নিজ নিজ কারবার হিসাবে ব্যক্তিগত কৃষকদের জমিচাষ, অল্প পরেই আসে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা। তারপর এল মুদ্রা, এই সার্বজনীন পণ্য যার বিনিময়ে সব পণ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু মুদ্রা আবিষ্কার করার সময় মানুষ ঘূর্ণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে, তারা এমন একটি নতুন সামাজিক শক্তি সৃষ্টি করছে, এমন এক সার্বজনীন শক্তি সৃষ্টি করছে যার কাছে সমগ্র সমাজ মাথা নোয়াতে বাধ্য হবে। স্রষ্টাদের ইচ্ছা ব্যতীতই অজ্ঞাতসারে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এই নতুন শক্তিকেই তার যৌবনসুলভ নিষ্ঠুরতায় এখন এথেনীয়রা উপলব্ধি করল।

এই অবস্থায় কী করা দরকার ছিল? মুদ্রার জয়যাত্রার সামনে সাবেকী গোত্র-প্রথা অক্ষম বলে প্রতিপন্ন হলো শুধু তাই নয়; এর কাঠামোর মধ্যে মুদ্রা, মহাজন, দেনাদার এবং বলপূর্বক ঋণ আদায়ের মতো ব্যাপারগুলির স্থান সঙ্কুলানেও সে ছিল একেবারে অসমর্থ; কিন্তু নতুন সামাজিক শক্তি যে হাজির, এবং কোনো সদিচ্ছা অথবা সাবেকী সুসময়ে ফিরে যাবার কোনো ব্যাকুলতাই মুদ্রা ও মহাজনী প্রথার অস্তিত্ব লোপ করতে অক্ষম। উপরন্তু ইতিমধ্যেই গোত্র-প্রথায় আরো কয়েকটি গৌণ ভাঙন দেখা দিয়েছিল। অ্যাটিকার সর্বত্র, বিশেষ করে এথেন্সে বিভিন্ন গোত্র ও ফ্রাত্রীর লোকেদের যথেচ্ছ মিশ্রণ পুরুষানুক্রমে বাড়তে থাকে, যদিও একজন এথেনীয় তার গোত্রের বাইরে চাষের জোত বিক্রি করতে পারলেও তখনো তার বসত বাড়ি বিক্রি করতে পারত না। উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় শ্রমবিভাগ -- কৃষি, হস্তশিল্প, হস্তশিল্পের মধ্যেই আবার বহু রকমের রূপভেদ, বাণিজ্য, নৌচালনা প্রভৃতিতে – শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসারের সঙ্গে অনেক বেশি বিকাশলাভ করে। জনসংখ্যা এখন বিভক্ত হলো পেশা অনুযায়ী কয়েকটি সুনির্দিষ্ট

গ্রুপে, – এদের প্রত্যেকটিরই এমন কতকগুলি নতুন সাধারণ স্বার্থ ছিল গোত্র বা ফ্রাত্রীর মধ্যে যাদের স্থান ছিল না, সুতরাং সেগুলির দেখার জন্য নতুন পদ সৃষ্টির প্রয়োজন হলো। ক্রীতদাসদের সংখ্যা খুবই বেড়ে গিয়েছিল এবং এই আদি অবস্থাতেই তাদের সংখ্যা স্বাধীন এথেনীয়দের চেয়ে নিশ্চয় অনেক বেশি হয়ে থাকবে। গোত্র-প্রথার প্রথম দিকে দাসপ্রথা ছিল না, তাই এত বেশি সংখ্যক দাসকে বশে রাখবার উপায়ও তার অজানা। সর্বশেষে বাণিজ্যের প্রয়োজনে বহু বিদেশী এথেন্সে আকৃষ্ট হয়ে বসবাস শুরু করে, কারণ এখানে টাকা করা সহজসাধ্য ছিল, কিন্তু পুরানো সংবিধান অনুসারে এদেরও কোন অধিকার ছিল না এবং আইন এদের রক্ষাও করত না। তাই ঐতিহ্যগত সহনশীলতা সত্ত্বেও জনগণের মধ্যে এরা একটা ব্যাঘাত করা বিজাতীয় উপাদান হিসাবেই ছিল।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, গোত্র-প্রথা ধ্বংস হতে চলেছিল। সমাজ প্রত্যহ একে ক্রমাগত ছাপিয়ে বেড়ে উঠেছিল; অত্যন্ত পীড়াদায়ক যেসব ত্রুটি চোখের সামনেই জাগছে তাদের উপশম বা প্রতিকার করার ক্ষমতা পর্যন্ত ছিল না। ইতিমধ্যে কিন্তু চুপি চুপি গড়ে উঠেছিল রাষ্ট্র। প্রথমে গ্রাম ও নগরে এবং পরে নগরাঞ্চলে শিল্পের বিভিন্ন শাখায় শ্রমবিভাগের ফলে যে নতুন জনসমষ্টিগুলি দেখা দেয় তারা নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য নতুন নতুন সংস্থা সৃষ্টি করে। রকমারি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের পদ সৃষ্টি হয়। এবং তারপর ছোটখাট যুদ্ধের ক্ষেত্রে অথবা বাণিজ্য-জাহাজ রক্ষাকল্পে তরুণ রাষ্ট্রের সর্বোপরি প্রয়োজন ছিল নিজস্ব যুদ্ধ-বাহিনী, সমুদ্রযাত্রী এথেনীয়দের মধ্যে প্রথমে এই শক্তি কেবল নৌবাহিনী হতে পারত। সোলনের সময়ের আগেই কোনো অনির্দিষ্ট কালে প্রতিষ্ঠিত হয় নৌক্রারি (naucraric) – ছোটো ছোটো আঞ্চলিক জেলা, প্রত্যেক উপজাতিতে বারোটি করে। প্রত্যেকটি নৌক্রারিকে একটি করে যুদ্ধ-জাহাজ লস্কর ও অস্ত্র সমেত পূর্ণভাবে সজ্জিত করতে হতো এবং অধিকন্তু দুজন অশ্বারোহী দিতে হতো। এই ব্যবস্থায় গোত্র প্রথার উপর দুদিক দিয়ে আক্রমণ এল। প্রথমত, এতে একটি সামাজিক শক্তি সৃষ্টি হলো যা আর আগেকার সামগ্রিক সশস্ত্র জনগণের সঙ্গে একাত্মক নয়। দ্বিতীয়ত, এতে সর্বপ্রথম সামাজিক উদ্দেশ্যে জনগণকে আত্মীয়তার ভিত্তিতে নয়, পরন্তু আঞ্চলিকভাবে বাসস্থান অনুযায়ী ভাগ করা হলো। এর তাৎপর্য কী তা পরে দেখা যাবে।

গোত্র-প্রথা যেহেতু শোষিত জনগণকে সাহায্য করতে পারত না, তাই কেবল অভ্যুদয়শীল রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হতে হতো তাদের। এবং রাষ্ট্র এই সাহায্যের জন্য সোলনের সংবিধান উপস্থিত করল এবং পুরাতন প্রথার বিনিময়ে নতুন করে নিজের শক্তি বাড়াল। সোলন – কী প্রণালীতে তিনি ৫৯৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সংস্কার ঘটালেন, তা আমাদের আলোচ্য নয় – মালিকানার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তথাকথিত রাজনৈতিক বিপ্লবগুলি শুরু করলেন। এতাবৎকাল পর্যন্ত একধরনের মালিকানার বিরুদ্ধে আর একধরনের মালিকানা রক্ষা করার জন্যই সমস্ত রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটেছে। এইগুলি একধরনের মালিকানাকে লঙ্ঘন না করে অপর একটি ধরনকে রক্ষা করতে পারে না। মহান ফরাসি বিপ্লবের সামন্ত মালিকানাকে বলি দেওয়া হয়েছিল বুর্জোয়া মালিকানা রক্ষার জন্য; সোলনের বিপ্লবে মহাজনের সম্পত্তি ক্ষুণ্ন করে দেনাদারের সম্পত্তি রক্ষা করার কথা।

দেনা সোজাসুজি বাতিল করা হলো। বিস্তারিত বিবরণ আমরা জানি না, কিন্তু সোলন তাঁর কবিতায় গর্ব প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, বন্ধক দেওয়া ভূখণ্ডগুলি থেকে বন্ধক চিহ্নিত থামগুলি তিনি সরিয়ে দেন এবং যারা পালিয়ে গিয়েছিল অথবা দেনার দায়ে বিদেশে বিক্রি হয়েছিল, তারা আবার ঘরে ফিরতে পারল। কেবলমাত্র প্রকাশ্যভাবে মালিকানার অধিকার লঙ্ঘন করেই এ কাজ করা সম্ভব ছিল। বস্তুত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তথাকথিত রাজনৈতিক বিপ্লবের লক্ষ্যই হচ্ছে এক ধরনের সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য অপর ধরনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, যাকে অপহরণ করাও বলা যায়। এইজন্য একথা সর্বৈব সত্য যে, আড়াই হাজার বছর ধরে ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষা করা গেছে কেবল মালিকানা অধিকার লঙ্ঘন করেই।

কিন্তু এখন এমন একটি উপায় উদ্ভাবনের দরকার হলো যাতে স্বাধীন এথেনীয়দের মধ্যে দাসত্বের পুনরাবৃত্তি ঘটতে না পারে। প্রথমে কয়েকটি সাধারণ ব্যবস্থার দ্বারা এটি করা হলো যেমন, দেনদার নিজে বন্ধক হয় একটি চুক্তি নিষিদ্ধ হলো। তাছাড়া, চাষীর জমির ওপর অভিজাতদের লালসা অন্তত কিছুটা খর্ব করার জন্য ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির উচ্চতম সীমা স্থির করা হলো। তারপর এল সংবিধানগত (Verfassung) সংশোধন, যাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি হচ্ছে আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ :

পরিষদের সদস্য-সংখ্যা চারশো করা হলো, প্রত্যেক উপজাতি থেকে একশো করে। এই ব্যাপারে উপজাতি এখনও ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে। কিন্তু এইটি হচ্ছে পুরনো ব্যবস্থার একমাত্র জিনিস যা নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্থান পেল। অন্যদিকে সোলন নাগরিকদের জমি ও ফসলের পরিমাণ অনুযায়ী চারটি শ্রেণীতে ভাগ করলেন : প্রথম তিন শ্রেণীর ন্যূনতম উৎপাদক ছিল পাঁচশো', তিনশো', ও দেড়শো' মেডিম্নাস শস্য (এক মেডিম্নাস মানে প্রায় ৪১ লিটার); যাদের জমি এর চেয়ে কম বা ভূসম্পত্তি নেই তারা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত। কেবলমাত্র প্রথম তিনটি শ্রেণী পদাধিকারী হতে পারত; উচ্চতম পদগুলি কেবল প্রথমশ্রেণীর লোক দিয়ে পূরণ করা হতো। চতুর্থ শ্রেণী জনসভায় বলতে ও ভোট দিতে শুধু পারত, কিন্তু এই জনসভাতেই সমস্ত পদাধিকারী নির্বাচিত হতো, নিজেদের কাজের জবাবদিহি করতে হতো তাদের, এখানেই সমস্ত আইন তৈরি হতো এবং এইখানে চতুর্থ শ্রেণী ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অভিজাতদের বিশেষ সুবিধাগুলি ধনের বিশেষ সুবিধা হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও জনগণের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা রইল। শ্রেণী চারটি সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনেরও ভিত্তি জোগাল। প্রথম দুটি শ্রেণী অশ্বারোহী বাহিনী দিত, তৃতীয় শ্রেণী করত ভারি পদাতিক সৈন্যের কাজ; চতুর্থ শ্রেণী আসত হালকা পদাতিক অথবা নৌবাহিনী হিসাবে এবং এরা সম্ভবত পারিশ্রমিক পেত।

এইভাবে সংবিধানের মধ্যে একেবারে নতুন একটি উপাদান এসে গেল – ব্যক্তিগত মালিকানা। নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের মাত্রা তাদের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ দিয়ে স্থির হতো; এবং বিত্তশালী শ্রেণীগুলির প্রভাব যত বাড়ল ততই পুরাতন রক্তসম্পর্কযুক্ত জনসমষ্টি আড়ালে পড়ে যেতে লাগল। গোত্র-প্রথার আর একবার পরাজয় হলো।

অবশ্য সম্পত্তির পরিমাপে রাজনৈতিক অধিকারের মাত্রা নির্ণয় রাষ্ট্রের পক্ষে

অপরিহার্য প্রথা নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানের ইতিহাসে এর গুরুত্ব থাকলেও বেশ কিছুসংখ্যক রাষ্ট্র, বলতে কি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিণত রাষ্ট্র, এ জিনিস ছাড়াই চলেছে। এমনকি এথেন্সেও এর ভূমিকা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ছিলো; এরিস্টাইডিসের সময় থেকেই সকল নাগরিকদের জন্যই সমস্ত পদ উন্মুক্ত থাকে।

পরবর্তী আশি বছরে এথেনীয় সমাজ ক্রমশ যে পথ নিল, সেই পথেই পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে তার পরিণতি চলে। সোলনের আগের যুগে যেভাবে জমি নিয়ে মহাজনী কারবারের প্রার্দুভাব ঘটেছিল, এখন তাকে এবং সেই সঙ্গে ভূসম্পত্তির সীমাহীন কেন্দ্রীয়ভবনকে সংযত করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রমবর্ধিত পরিমাণে দাসশ্রমের সাহায্যে পরিচালিত হস্তশিল্প ও কারুশিল্প হয়ে উঠল মূল পেশা। জ্ঞানের চর্চা বাড়তে লাগল। আগের মতো নিজেদের সহনাগরিকদের শোষণ না করে এখন এথেনীয়রা প্রধানত দাস ও বিদেশী ক্রেতাদের শোষণ করতে থাকল। অস্থাবর সম্পত্তি, অর্থ, ক্রীতদাস ও জাহাজ রূপে সম্পদ ক্রমেই বাড়তে থাকল; কিন্তু আগের সীমাবদ্ধতার যুগে এগুলিকে জমি কেনবার উপায় মাত্র মনে করার বদলে এখন এই সঞ্চয়ই লক্ষ্য হয়ে উঠল। এতে একদিকে যেমন পুরাতন অভিজাতদের ক্ষমতার সঙ্গে এক নতুন ধনী শিল্পপতি ও বণিকশ্রেণীর সফল প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব হলো, অপরদিকে এতে পুরাতন গোত্র-প্রথা তার শেষ আশ্রয় হারাল। গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতি-সভ্যরা এখন অ্যাটিকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সকলে একেবারে মিশ্রিতভাবে বসবাস করত, এগুলি তাই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে একেবারে অব্যবহার্য হয়ে পড়েছিল। এথেনীয় নাগরিকদের এক বৃহৎ সংখ্যা কোনো গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল না; এরা বিদেশাগত নাগরিক হিসাবে গৃহীত হলেও রক্তসম্পর্কযুক্ত কোনো সাবেকী গোষ্ঠীর মধ্যে গৃহীত হয় না। এরা ছাড়াও নিতান্ত রক্ষণপ্রাপ্ত বিদেশাগতদের সংখ্যাও কেবলই বেড়ে চলল।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন পার্টির সংগ্রাম চলতে থাকে। অভিজাতরা পুরানো সুবিধা ফিরে পাবার চেষ্টা করে এবং অল্পকালের জন্য প্রাধান্য পায়। পরে ক্লিস্টিনিসের বিপ্লব (৫০৯ খ্রিঃ পূঃ) তাদের চূড়ান্ত পতন ঘটাল এবং এদের পতনের সঙ্গেই গোত্র-প্রথার শেষ কাঠামোও ধ্বসে পড়ল।

ক্লিস্টিনিস তাঁর নতুন সংবিধানে গোত্র ও ফ্রাত্রীর ভিত্তিতে গঠিত পুরানো চারটি উপজাতিকে উপেক্ষা করলেন। তাদের জায়গায় এল সম্পূর্ণ নতুন একটি সংগঠন যাতে নাগরিকদের বাসস্থানের ভিত্তিতে ভাগ করা হলো, ইতিপূর্বে নৌক্রারিতে যার চেষ্টা হয়েছিল। এখন কোনো রক্তসম্পর্কযুক্ত গোষ্ঠীভুক্তি নয়, স্থায়ী বাসস্থানই হলো চূড়ান্ত ব্যাপার। এখন আর জনগণের বিভাগ নয়, পরন্তু ভূখণ্ডের বিভাগ করা হলো; রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়ে অধিবাসীরা হলো ভূখণ্ডসংশ্লিষ্ট মাত্র।

সমগ্র অ্যাটিকাকে একশত স্বায়ত্তশাসনশীল অঞ্চল বা ডেমে (dem) ভাগ করা হলো। এক একটি ডেমের নাগরিকরা (demot) নিজেদের একজন সরকারী প্রধান (demarch), একজন খাজাঞ্চী এবং ছোট ছোট মামলা চালাবার ক্ষমতা সম্বলিত ত্রিশজন বিচারক নির্বাচিত করত। তারা তাদের নিজস্ব একটি মন্দির এবং একজন উপাস্য দেবতা অথবা বীর (heros) রাখত, এর পুরোহিত নির্বাচিত হতেন। ডেমের

সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল ডেমটদের সভার উপর। মর্গান সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে,এটাই হচ্ছে আমেরিকার স্বায়ত্তশাসনশীল মিউনিসিপ্যালিটির আদিরূপ। পূর্ণাঙ্গ পরিণতিতে আধুনিক রাষ্ট্রের শেষ হচ্ছে ঠিক সেই এককে যা নিয়ে এথেন্সের উদীয়মান রাষ্ট্রের শুরু।

এইরকম দশটি একক, ডেম নিয়ে একটি উপজাতি গঠিত হয়; কিন্তু গোত্রভিত্তিক পুরাতন উপজাতি (Geschlechtsstamm) থেকে পার্থক্য করে এটিকে এখন বলা হলো অঞ্চলভিত্তিক উপজাতি (Ortsstamm)। আঞ্চলিক উপজাতি শুধু স্বায়ত্তশাসিত রাজনৈতিক সংস্থাই নয়, এটি আবার সামরিক সংস্থাও বটে। এরা নির্বাচন করত একজন ফাইলার্ক অথবা উপজাতীয় প্রধান, যিনি অশ্বারোহী বাহিনী চালনা করতেন, একজন ট্যাক্সিয়ার্ক যিনি পদাতিক বাহিনী চালনা করতেন এবং একজন স্ট্রাটেগস যিনি উপজাতির এলাকায় সংগঠিত সমগ্র সামরিক শক্তির অধিনায়ক ছিলেন। অধিকন্তু লোকলশ্কর ও কম্যান্ডার সমেত পাঁচখানি করে সজ্জিত জাহাজ অঞ্চলকে দিতে হতো এবং এরা পেত অঞ্চলের রক্ষক-দেবতা হিসাবে একটি অ্যাটিক বীরকে যাঁর নামে এরা পরিচিত হতো। সর্বশেষে এরা এথেন্সের পরিষদের জন্য পঞ্চাশজন সদস্য নির্বাচিত করত।

এর পরিণতি হলো এথেনীয় রাষ্ট্র, যা দশটি উপজাতি থেকে নির্বাচিত পাঁচশ' সদস্যের পরিষদ কর্তৃক, এবং শেষ বিচারে জনসভা কর্তৃক শাসিত, এ জনসভায় প্রত্যেক এথেনীয় নাগরিক উপস্থিত থাকতে ও ভোট দিতে পারত। এর সঙ্গে আর্খন ও অন্যান্য পদাধিকারীরা শাসনকার্যের বিভিন্ন বিভাগ ও আদালতের কাজ চালাতেন। এথেন্সে সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহক কোনো পদাধিকারী ছিল না।

এই নতুন সংবিধানের ফলে এবং অংশত বিদেশাগত ও অংশত মুক্ত দাসদের মধ্যে থেকে এক বৃহৎ সংখ্যার অসমাধিকারী অধিবাসীকে (Schutzverwandter) গ্রহণ করার ফলে সামাজিক ক্ষেত্র থেকে পুরাতন গোত্র সংস্থাগুলো অপসারিত হলো। এগুলি গৌণ সমিতি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্তরে নেমে পড়ল। কিন্তু তাদের নৈতিক প্রভাব, পুরানো গোত্রভিত্তিক যুগের ঐতিহ্যগত ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘদিন টিকে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে সেগুলির বিলুপ্তি ঘটে। তা ফুটে ওঠে পরবর্তী একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানে।

আমরা দেখেছি যে, রাষ্ট্রের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাধারণ জনগণ থেকে স্বতন্ত্র একটি সামাজিক শক্তি। ঐ সময়ে এথেন্সের মাত্র জনবাহিনী ও নৌবাহিনী ছিল যাতে জনগণই সরাসরি লোক ও উপকরণ যোগাত। এ দিয়ে বাইরের শত্রু থেকে আত্মরক্ষা ও দাসদের সংযত রাখা হতো, এই শেষোক্তরা তখনই জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ হয়ে উঠেছিল। নাগরিকদের পক্ষে এই সামাজিক শক্তিটা প্রথমে ছিল কেবল পুলিশবাহিনী রূপে, – এই পুলিশ হচ্ছে রাষ্ট্রের সমবয়সী এবং এইজন্যই অষ্টাদশ শতাব্দীর সাদামাটা সরল ফরাসীরা সভ্য জাতি না বলে পুলিশসম্বলিত জাতি (nations policees) বলত। এইভাবে রাষ্ট্র পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এথেনীয়রা একটি পুলিশবাহিনীও প্রতিষ্ঠা করল, পদাতিক ও অশ্বারোহী তীরন্দাজদের নিয়ে একটি রীতিমতো সান্ত্রীবাহিনী – দক্ষিণ জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে যাকে বলা হয় landjager।

কিন্তু এই সান্ত্রীবাহিনী গঠিত ছিল দাসদের নিয়ে। স্বাধীন নাগরিক পুলিশের কাজকে এতই ঘৃণ্য মনে করত যে, সে নিজে তেমন হেয় কাজ করার চেয়ে একজন সশস্ত্র দাসের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া পছন্দ করত। এটা হলো তখনো সেই সাবেকী গোত্র মনোভাবে একটা অভিব্যক্তি। পুলিশ ছাড়া রাষ্ট্র বাঁচতে পারে না, কিন্তু তখনও রাষ্ট্র নেহাত নতুন এবং তার ততখানি নৈতিক মর্যাদা হয়নি যাতে এই পেশা যা পুরানো গোত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে অবশ্যই জঘন্য মনে হতো তা সম্মানীয় হবে।

এই নতুন রাষ্ট্র যার মূল অঙ্গগুলি এখন সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, এটি এথেনীয় সমাজের নতুন অবস্থার কতখানি উপযোগী হয়েছিল তা বুঝা যায় অর্থসম্পদ, বাণিজ্য ও শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধি থেকে। যে শ্রেণী-বিরোধকে ভিত্তি করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দাঁড়িয়েছিল, সেটি আর অভিজাত ও সাধারণ নাগরিকদের বিরোধ নয়, সেটি হচ্ছে দাস ও স্বাধীন মানুষের মধ্যে, অসমাধিকারী অধিবাসী ও নাগরিকদের মধ্যে বিরোধ। এথেন্সের সর্বাধিক শ্রীবৃদ্ধির সময়ে স্ত্রীলোক ও সন্তানসন্ততি সমেত স্বাধীন নাগরিকদের সংখ্যা ছিল ৯০,০০০-এর কাছাকাছি; স্ত্রীপুরুষ দাসদের সংখ্যা ছিল ৩,৬৫,০০০ এবং অসমাধিকারী অধিবাসীদের সংখ্যা – বিদেশাগত ব্যক্তি ও মুক্ত দাসদের নিয়ে – ছিল ৪৫,০০০। অতএব প্রত্যেক সাবালক পুরুষ নাগরিক পিছু কমপক্ষে আঠার জন দাস ও দুজনের বেশি অসমাধিকারী ছিল। দাসদের বৃহৎ সংখ্যার কারণ ছিল এই যে, তাদের অনেক বড় বড় ঘরে অবস্থিত হস্তশিল্প কারখানায় পরিদর্শকের অধীনে কাজ করত। বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশের সঙ্গে অল্প কয়েকজনের হাতে ধনের সঞ্চয় ও কেন্দ্রীকরণ হলো; স্বাধীন নাগরিকদের ব্যাপক সংখ্যা দরিদ্র হতে থাকল এবং তাদের বেছে নিতে হলো, হয় হস্তশিল্প গ্রহণ ও দাসের সঙ্গে শ্রমের প্রতিযোগিতা যা তখন ঘৃণ্য ও নীচ বলে মনে করা হতো এবং উপরন্তু যার কোনো ভবিষ্যৎ ছিল না, নয়ত একেবারে নিঃস্বতা। তখনকার প্রচলিত অবস্থার মধ্যে এই শেষটাই অনিবার্যভাবে ঘটত এবং এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার ফলে সেই সঙ্গে গোটা এথেনীয় রাষ্ট্রকেই নিচে টানতে থাকল। গণতন্ত্রের জন্য এথেন্সের পতন হয়নি, যদিও রাজরাজড়াদের পদলেহী ইউরোপীয় শিক্ষকেরা আমাদের এই কথা বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন, – পতন হয়েছে দাসপ্রথার ফলে, যে প্রথা স্বাধীন নাগরিকের শ্রমকে অশ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল।

এথেনীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রের উদ্ভব সাধারণভাবে রাষ্ট্রগঠনের একটি টিপিকাল দৃষ্টান্তস্বরূপ; কারণ, একদিকে এটি বাইরের অথবা ভিতরের হিংস্র হস্তক্ষেপ ছাড়াই একটি বিশুদ্ধ রূপ নেয় (পিসিস্ট্রেটাসের অল্পস্থায়ী ক্ষমতাদখল কোন চিহ্ন রেখে যায়নি); অপরদিকে এটি ছিল রাষ্ট্রের একটি অত্যন্ত উন্নত রূপ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যা সরাসরি গোত্রভিত্তিক সমাজ থেকে উদ্ভূত; এবং সর্বশেষে, এই ক্ষেত্রে আমরা সমস্ত মৌলিক খুঁটিনাটির যথেষ্ট বিবরণ পাই।

৬
রোমের গোত্র ও রাষ্ট্র

রোম প্রতিষ্ঠার উপকথা অনুযায়ী একটি উপজাতিতে মিলিতে কয়েকটি ল্যাটিন গোত্র এখানে বসবাসের উদ্যোগ করে (উপকথায় এদের সংখ্যা একশত) এবং তাদের একটু পরেই একটি সাবেলিয়ান উপজাতি আসে, এদেরও গোত্র-সংখ্যা নাকি একশত, এবং সর্বশেষে একটি বিভিন্ন ধরনের জনসমষ্টি নিয়ে গঠিত উপজাতি এদের সঙ্গে যোগ দিল, এই শেষোক্তদেরও গোত্রসংখ্যা একশত। এই গোটা কাহিনী থেকে এক নজরেই প্রকাশ পায় যে, গোত্র ছাড়া অপর কিছুই এখানে স্বাভাবিক জিনিস নয় এবং বহুক্ষেত্রে গোত্রগুলিও হলো পুরাতন বাসভূমিতে তখনও অবস্থিত কোনো আদি মাতৃগোত্রের শাখাপ্রশাখা। উপজাতিগুলি কৃত্রিমভাবে গঠিত হওয়ায় চিহ্ন বহন করত; তবুও সেগুলি আত্মীয় ব্যক্তিবর্গ নিয়েই প্রধানত গড়ে ওঠে এবং তারা পুরানো স্বাভাবিকভাবে বিকশিত উপজাতিগুলির ছাঁচেই গড়া, কোনো কৃত্রিমভাবে নয়; এবং এটা আদৌ অসম্ভব নয় যে, এই তিনটি উপজাতির প্রত্যেকেরই কেন্দ্র ছিল কোনো পুরানো খাঁটি উপজাতি। মধ্যবর্তী যোগসূত্র ফ্রাত্রীতে দশটি করে গোত্র ছিল এবং এর নাম ছিল কিউরিয়া। অতএব এদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ।

রোমক গোত্র যে গ্রীক গোত্রের মতোই অভিন্ন একটা প্রতিষ্ঠান ছিল সেটা স্বীকৃত সত্য; মার্কিন লাল চামড়াদের ক্ষেত্রে যার আদিরূপ দেখা যায়, গ্রীক গোত্র যদি হয় সেই সামাজিক এককেরই অনুবর্তন, তাহলে স্বভাবতই সে কথা সম্পূর্ণভাবে রোমক গোত্রের পক্ষেও খাটে। তাই আলোচনাটা আমরা সংক্ষিপ্ত করতে পারি।

অন্তত নগরের একেবারে আদিকালে রোমক গোত্রের গঠন ছিল নিম্নরূপ :

১। গোত্রের কেউ মারা গেলে তার সম্পত্তির পারস্পরিক উত্তরাধিকার; সম্পত্তি গোত্রের মধ্যেই থাকত। যেহেতু গ্রীক গোত্রের মতো রোমক গোত্রেও পিতৃ-অধিকার ইতিমধ্যে প্রচলিত ছিল, সেইজন্য মেয়েদের সন্তানসন্ততিরা উত্তরাধিকারে বঞ্চিত হতো। আমাদের জানা রোমের প্রাচীনতম লিপিবদ্ধ আইন, দ্বাদশ ফলকের আইন[৪৬] অনুযায়ী সন্তানসন্ততি হতো সম্পত্তির প্রথম উত্তরাধিকারী; কোনো সন্তান না থাকলে এগ্‌নেটরা (পুরুষের দিক দিয়ে নিকটতম জ্ঞাতি) অধিকারী হতো; এবং এদেরও অবর্তমানে

৪৬. দ্বাদশ ফলকের আইন – রোমক আইনের প্রাচীন নিদর্শন। প্যাট্রিশীয়দের বিরুদ্ধে প্লেবদের সংগ্রামের ফলস্বরূপ। এগুলো সূত্রবদ্ধ হয় খ্রিঃ পূঃ ৫ম শতকের মাঝামাঝি, এবং রোমের পূর্বপ্রচলিত প্রথাগত আইন বদলে দেয়। রোম সমাজের সম্পত্তিভেদ, দাসপ্রথার বৃদ্ধি এবং দাসমালিক রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়া প্রতিফলিত হয় এই আইনে। আইনগুলি লিপিবদ্ধ ছিল দ্বাদশটি ফলকে। – সম্পাঃ

গোত্রসদস্যরা। সকলক্ষেত্রেই সম্পত্তি গোত্রের মধ্যেই থাকত। এখানে আমরা গোত্র-সংবিধানের মধ্যে সম্পত্তি বৃদ্ধি ও একপতিপত্নীত্বের ফলে উদ্ভূত নতুন আইনগত ব্যবস্থার ধীরে ধীরে অন্তর্প্রবেশ লক্ষ্য করি। আদিতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে গোত্র-সভ্যদের সমান অধিকারকে প্রথমে সংকুচিত করে কার্যত এগনেটদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হলো, – এটি আগে যা বলেছি সম্ভবত খুব আদিমকালের ব্যাপারে – এবং তারপরে সন্তানসন্ততি আর তাদের পুরুষ ধারার ছেলেমেয়েরা উত্তরাধিকারী হয়। অবশ্য দ্বাদশ ফলকের আইনে এটি উল্টোভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

২। একটি সাধারণ সমাধিস্থান। ক্লাডিয়ার প্যাট্রিশিয়ান গোত্র রেগিলি থেকে এসে রোমে বসবাস করতে শুরু করলে নগরে তাদের জন্য ভূমিখণ্ড ও একটি সাধারণ সমাধিস্থান দেওয়া হলো। এমনকি অগাস্টসের সময়ে ভেরস যখন টিউটোবুর্গের অরণ্যে[৪৭] মারা যান, তখন তাঁর মাথা রোমে এনে গোত্রের সমাধিস্তূপে (gentilitius tumulus) সমাধি দেওয়া হয়; অতএব তাঁর গোত্রের (ক্‌ভিঙ্গটিলিয়া) তখনও নিজস্ব সমাধিস্তূপ ছিল।

৩। সাধারণ ধর্মোৎসব। এই sacra gentilitia সুপরিচিত।

৪। গোত্রের মধ্যে বিবাহ না করবার বাধ্যবাধকতা। রোমে এটি কখনো আইন রূপে লিপিবদ্ধ হয়েছিল বলে মনে হয় না, কিন্তু এই রীতি ছিল। রোমের বিবাহিত দম্পতিদের যে অসংখ্য নাম আজ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে এমন একটি দৃষ্টান্তও নেই যেখানে স্বামী ও স্ত্রী দুজনের গোত্রের নাম একই। উত্তরাধিকার আইনও এই নিয়মই প্রমাণ করে। বিবাহের পরে স্ত্রীলোক তার এগ্‌নেটিক্‌ অধিকার হারাত, নিজের গোত্র পরিত্যাগ করত এবং সে অথবা তার ছেলেমেয়েরা তার বাপ অথবা কাকাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না, কারণ তাহলে বাপের গোত্রকে সম্পত্তি হারাতে হতো। স্ত্রীলোক নিজের গোত্রের কাউকে বিবাহ করতে পারত না, এই কথা মানলে তবে এই নিয়ম বোধগম্য হয়।

৫। জমির যৌথ মালিকানা। আদি যুগে উপজাতির জমির প্রথম ভাগ না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যাপারই দেখা যেত। ল্যাটিন উপজাতিগুলির মধ্যে আমরা দেখি যে, জমি অংশত উপজাতির অধিকারে, অংশত গোত্রের এবং অংশত গৃহস্থালীর দখলে। মনে হয় এই গৃহস্থালী তখনও মোটেই একটি পরিবার নিয়ে হতে পারত না। রমুলাসই প্রথম ব্যক্তিবিশেষ ধরে জমি বন্টন করেছিলেন শোনা যায়, মাথাপিছু এক হেক্টেয়ার (দুই জুগেরা)। তথাপি পরেও গোত্রের সাধারণ দখলে জমি দেখা যায়, রাষ্ট্রের জমির কথা ছেড়েই দিই, যাকে কেন্দ্র করে প্রজাতন্ত্রের সমগ্র আভ্যন্তরীণ ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে।

৬। গোত্রের সভ্যদের পরস্পর সাহায্য ও অন্যায় প্রতীকারের বাধ্যবাধকতা। লিখিত ইতিহাসে এর সামান্য লুপ্তাবশেষ পাওয়া যায়; সূচনা থেকেই রোমক রাষ্ট্রের এতখানি ঊর্ধ্বতন শক্তির প্রকাশ ঘটে যে, অন্যায় প্রতীকারের দায়িত্ব এতেই অর্সায়।

৪৭. টিউটোবুর্গের অরণ্যে রোম বিজেতাদের বিরুদ্ধে উত্থিত জার্মান উপজাতিগুলির সঙ্গে ভেরসের নেতৃত্বাধীন রোমক সৈন্যদের যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে (৯ খ্রিস্টাব্দে)। যুদ্ধে রোমকরা পরাজিত ও সেনানায়ক নিহত হয়। – সম্পাঃ

এ্যাপিয়াস ক্লডিয়াস যখন গ্রেপ্তার হন, তখন তাঁর ব্যক্তিগত শত্রু সমেত তাঁর সমগ্র গোত্র শোক করে। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের[৪৮] সময় গোত্রাধীন বন্দীদের মুক্তিক্রয়ের জন্য গোত্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়; সেনেট এই কাজ নিষিদ্ধ করে।

৭। গোত্র নাম ব্যবহারের অধিকার। এইটি সাম্রাজ্যের যুগের আগে পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। মুক্তদাসেরা প্রাক্তন প্রভুর গোত্র-নাম নিতে পারত, অবশ্য গোত্রের কোন অধিকার পেত না।

৮। বিদেশীদের গোত্রে অন্তর্ভুক্ত করবার অধিকার। এই কাজ সম্পন্ন করা হতো একটি পরিবারে অন্তর্ভুক্ত করে (যেমন রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে) এবং তাহলেই ঐ ব্যক্তি একইসঙ্গে গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হতো।

৯। প্রধানদের নির্বাচন বা পদচ্যুতির অধিকারের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু যেহেতু রোমের অস্তিত্বের প্রথম যুগে নির্বাচিত রাজা থেকে নিচের দিকে সমস্ত সরকারী পদই নির্বাচন অথবা নিয়োগ দ্বারা পূর্ণ করা হতো এবং যেহেতু কিউরিয়াগুলিও তাদের পুরোহিতদের নির্বাচিত করত, সেইজন্য ধরে নেওয়া চলে যে, গোত্র প্রধানের সম্বন্ধেও এই প্রণালীই প্রচলিত ছিল – একই পরিবার থেকে প্রার্থী বাছাই করার রীতি ততদিনে যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হোক না কেন।

রোমক গোত্রের অধিকারগুলি ছিল এইরকম। শুধুমাত্র পরিপূর্ণভাবে পিতৃ-অধিকারে উৎক্রান্তি ছাড়া এটি হচ্ছে ইরকোয়াস গোত্রের কর্তব্য ও অধিকারের যথাযথ প্রতিচ্ছবি। অর্থাৎ এখানেও 'পরিষ্কারভাবে ইরকোয়াসের সাক্ষাৎ মিলছে'।

আমাদের সবচেয়ে প্রামাণ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যেও রোমক গোত্র-প্রথার প্রকৃতি সম্পর্কে যে কত ভুল ধারণা আজও রয়েছে, তা নিচের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় : প্রজাতন্ত্রী এবং অগাস্টেসীয় যুগের রোমকদের নাম সম্পর্কিত রচনায় ('রোম বিষয়ক গবেষণা', বার্লিন, ১৮৬৪, ১ম খন্ড[৪৯]) মমসেন লিখছেন, 'গোত্রের নাম শুধু সকল পুরুষরাই – দাস বাদে কিন্তু পোষ্যরাও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত – ব্যবহার করত না, পরন্তু স্ত্রীলোকেরাও করত ... উপজাতি (Stamm, মমসেন এ ক্ষেত্রে এই বলে gens কথাটির অনুবাদ করেছেন) হচ্ছে ... একই সাধারণ – বাস্তব বা কল্পিত অথবা উদ্ভাবিত – বংশোদ্ভূত একটি জনসমষ্টি এবং এর সাধারণ পূজাপদ্ধতি, সমাধিস্থান ও উত্তরাধিকার দিয়ে একতাবদ্ধ। সমস্ত স্বাধীন ব্যক্তি, অতএব স্ত্রীলোকেরাও এর তালিকাভুক্ত হতে পারত এবং হতে হতো। কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীলোকের গোত্র-গত নাম স্থির করা কিছুটা শক্ত। বস্তুত নিজেদের গোত্রের বাইরে নারীর বিবাহ যখন নিষিদ্ধ ছিল তখন এ জিনিস ছিলই না; এবং একথা স্পষ্ট যে, অনেকদিন পর্যন্ত মেয়েদের পক্ষে নিজের গোত্রের ভিতরে অপেক্ষা বাইরে বিবাহ করা অনেক বেশি শক্ত ছিল। এই অধিকার, অর্থাৎ gentis enuptio[৫০] ষষ্ঠ শতাব্দীতেও ব্যক্তিগত সুবিধা ও পুরস্কার হিসাবে দান করা হতো ... কিন্তু যেখানেই এইরকম বাইরে বিবাহ হতো, সেইখানেই আদিম যুগে স্ত্রীলোককে তার

৪৮. পিউনিক যুদ্ধ– রোমের সঙ্গে পিউনিকদের অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকার ফিনিসীয় উপনিবেশ কার্থেজের অধিবাসীদের যুদ্ধ। এটি চলে খ্রিঃ পূঃ ২৬৪ থেকে ১৪৬ পর্যন্ত। – সম্পাঃ

৪৯. Th. Mommsen, Romische Forschugen, Ausg. 2, Bd. I-II Berlin, 1864-1878. – সম্পাঃ

৫০. ভিন্ন গোত্রে বিবাহ। – সম্পাঃ

স্বামীর উপজাতিতে যেতে হতো মনে হয়। পুরানো ধর্মীয় বিবাহের ফলে স্ত্রীলোককে নিজের গোষ্ঠী ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর আইনগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠীতে যোগ যে দিতে হতো সে কথা নিশ্চয় করে বলা যায়। কার জানা নেই যে, বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা নিজের গোত্রে উত্তরাধিকারের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সমস্ত অধিকার হারায় এবং তার স্বামী, তার ছেলেমেয়ে ও তার স্বামীর জ্ঞাতিদের উত্তরাধিকার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়? এবং তার স্বামী তাকে যখন পোষ্য হিসাবে নিজের পরিবারে আনে, তখন কেমন করে সে স্বামীর গোত্রের বাইরে থাকবে? (পৃঃ ৯–১১।)

এইভাবে মমসেন জোর করে বলছেন যে, কোনো একটি গোত্রের রোমক স্ত্রীলোকেরা গোড়ার দিকে কেবলমাত্র গোত্রের মধ্যেই বিবাহ করতে পারত; অতএব তাঁর মতে রোমক গোত্র ছিল অন্তর্বিবাহিক, বহির্বিবাহিক নয়। এই যে মত অন্য সকল জাতির অভিজ্ঞতার বিরোধী, এটি সম্পূর্ণ না হলেও মুখ্যত লিভিয়াসের রচনার (বুক ৩৯শ, ১৯ পরিচ্ছেদ) একটিমাত্র তর্কাধীন উদ্ধৃতি থেকে করা হয়েছে; এতে বলা হচ্ছে রোম প্রতিষ্ঠার ৫৬৮ বৎসরে অথবা ১৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সেনেট নির্দেশ দেন যে, uti Feceniae Hispallae datio, deminutio, gentis enuptio, tutoris optio item esset quasi ei vir testamento dedisset; utique ei ingenuo nubere liceret, neu quid ei qui eam duxisset, ob id fraudi ignominiaeve esset,– ফেসেনিয়া হিস্পালা তার সম্পত্তির বিলিবন্দোবস্ত করতে পারবে, তাকে হ্রাস করতে পারবে, গোত্রের বাইরে বিবাহ করতে পারবে, অভিভাবক মনোনীত করতে পারবে – যেন উপরোক্ত অধিকারগুলি তার (মৃত) স্বামী উইলে লিখে গিয়েছে; সে যে-কোন স্বাধীন নাগরিককে বিবাহ করতে পারবে এবং যাকে সে বিবাহ করবে সেই ব্যক্তির এজন্য কোন দোষ বা সম্মানহানি হবে না।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ফেসেনিয়া ছিল একজন মুক্তদাসী এবং এখানে সে গোত্রের বাইরে বিবাহ করবার অনুমতি পাচ্ছে। এবং এই বিবরণ অনুযায়ী এ কথাও সমানভাবে নিঃসন্দেহে যে, স্বামী উইল করে তার মৃত্যুর পরে তার স্ত্রীকে গোত্রের বাইরে বিবাহের অধিকার দিতে পারত। কিন্তু কোন গোত্রের বাইরে?

যদি একজন স্ত্রীলোককে নিজের গোত্রের মধ্যেই বিবাহ করতে হতো, যেমন মমসেন ধরে নিয়েছেন, তাহলে সে বিবাহের পরও গোত্রের মধ্যেই থাকে। কিন্তু প্রথমত, এই উক্তিরই প্রমাণ চাই যে, গোত্র ছিল অন্তর্বিবাহিক। দ্বিতীয়ত, স্ত্রীলোক যদি গোত্রের মধ্যে বিবাহ করে, তাহলে পুরুষকেও তাই করতে হয়, কারণ তা না হলে সে পাত্রী পাবে কোথায়? অতএব আমরা এমন একটা অবস্থায় এসে পড়ছি যেখানে একজন পুরুষ উইল করে তার স্ত্রীকে এমন অধিকার দিতে পারত, যে অধিকার তার নিজের উপভোগের ব্যাপারে ছিল না। এতে আইনের দিক দিয়ে একটি উদ্ভটত্বে পৌঁছতে হয়। মমসেনও এই ব্যাপার বোঝেন, তাই অনুমান করেন, সম্ভবত গোত্রের বাইরে বিবাহ করতে হলে শুধুমাত্র অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির আইনগত সম্মতি নয়, উপরন্তু গোত্রের সকলের সম্মতি দরকার হতো' (পৃঃ ১০, টীকা)। প্রথমত, এটি অত্যন্ত দুঃসাহসী অনুমান এবং দ্বিতীয়ত, এটা উদ্ধৃতির সুস্পষ্ট পাঠের বিরোধী। সেনেট স্বামীর প্রতিভূ হিসাবে তাকে এই অধিকার

দিচ্ছে, তার স্বামী তাকে যা দিতে পারত এতে সুস্পষ্টভাবেই তাই দেওয়া হচ্ছে, তার চেয়ে কম নয় এবং বেশি নয়। কিন্তু সে যে অধিকার পেল তা অনপেক্ষ অধিকার যাতে কোন বাধা নিষেধ নেই, যাতে সে যদি একে ব্যবহার করে তাহলে তার নতুন স্বামী এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। সেনেট আবার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কন্সাল ও প্রিটরদের নির্দেশ দেয় যেন এই অধিকার ব্যবহার করতে গিয়ে তার কোন অসুবিধা না হয়। অতএব মমসেনের অনুমান একেবারেই অচল মনে হয়।

তারপরে ধরা যাক যে, একজন স্ত্রীলোক অপর গোত্রের একজন পুরুষকে বিবাহ করল, কিন্তু নিজের গোত্রেই রইল। তাহলে উপরোক্ত উদ্ধৃতি অনুযায়ী স্ত্রীর গোত্রের বাইরে তাকে বিবাহ করতে বলবার অধিকার তার স্বামীর থাকবে। অর্থাৎ স্বামী আদৌ যে গোত্রের সভ্য নয় তারই ব্যাপারে ব্যবস্থা করবার অধিকার তার থাকবে। এ জিনিসটি এত অযৌক্তিক যে, এই বিষয়ে আর আলোচনা না করাই ভাল।

এখন শুধু বাকি রইল এই অনুমান করা যে, স্ত্রীলোকটির প্রথম বিবাহ তার গোত্রের বাইরের কোনো পুরুষের সঙ্গে হয়েছিল এবং সেইজন্য সে নিঃসন্দেহে তার স্বামীর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল; এরকম ক্ষেত্রে মমসেনও যা বাস্তবিক মেনে নিয়েছেন। এখন সব ব্যাপারটির আপনিই ব্যাখ্যা হয়। বিবাহের ফলে নিজের পুরনো গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্ত্রীলোকটির স্বামীর গোত্রে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সেখানে তার বিশেষ একটি অবস্থান রয়েছে। সে এই গোত্রের সদস্য, কিন্তু রক্তসম্পর্কযুক্ত আত্মীয় নয়; যেভাবে সে গোত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাতে এই বিবাহজনিত গোত্রে তার বিবাহের উপর সমস্ত নিষেধ গোড়াতেই নাকচ হয়ে যায়। অধিকন্তু সে এই গোত্রের বিবাহ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার স্বামীর মৃত্যুতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাচ্ছে অর্থাৎ গোত্রের একজন সভ্যের সম্পত্তি পাচ্ছে। ঐ সম্পত্তি যাতে গোত্রের মধ্যেই থাকে তার জন্য তার প্রথম স্বামীর গোত্রের কোনো সদস্যকেই যে সে বিবাহ করতে বাধ্য হবে তার চেয়ে বেশি স্বাভাবিক আর কী হতে পারে? এর যদি কোনো ব্যতিক্রম করতে হয়, তাহলে যে তাকে সম্পত্তি দান করেছে, তার সেই প্রথম স্বামীর চেয়ে এরকম অধিকার দেবার যোগ্যতর ব্যক্তি আর কে হতে পারে? যে সময়ে সে তার সম্পত্তির একাংশ স্ত্রীকে দান করছে, ও যুগপৎ সে স্ত্রীকে বিবাহ দ্বারা অথবা বিবাহের ফলে ঐ সম্পত্তির অন্য গোত্রে হস্তান্তর করবার অনুমতি দিচ্ছে, সে সময় সেই তখনো ঐ সম্পত্তির মালিক, আক্ষরিকভাবে সে তার নিজের সম্পত্তিই বিতরণ করছে। আর স্ত্রীলোকটি এবং স্বামীর গোত্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ধরলে, স্বামীই নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী বিবাহ দ্বারা স্ত্রীকে নিজের গোত্রে এনেছিল। অতএব এটা খুবই স্বাভাবিক যে, সেই আবার অপর একটি বিবাহের দ্বারা স্ত্রীকে তার গোত্র ত্যাগ করবার অধিকার দেবে। সংক্ষেপে বলা যায়, যেই আমরা অন্তর্বিবাহিক রোমক গোত্রের আজগুবি ধারণা পরিত্যাগ করি এবং মর্গানের মতানুযায়ী আদিতে এটি বহির্বিবাহিক ছিল বলে গণ্য করি, অমনি ব্যাপারটা সহজ ও স্বতঃ স্পষ্ট হয়ে যায়।

সর্বশেষে আরও একটি অভিমত আছে এবং তার অনুগামীর সংখ্যা সম্ভবত সর্বাধিক; এতে লিভিয়াসের ঐ উদ্ধৃতির অর্থ ধরা হয় মাত্র এই যে, "মুক্ত ক্রীতদাসীরা (libertae) বিশেষ অনুমতি ছাড়া গোত্রের বাইরে বিবাহ করতে (e gente enubere)

পারত না, অথবা এমন কিছু করতে পারত না যাতে পরিবারের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়ে (capitis deminutio minima) গোত্র-গোষ্ঠী পরিত্যাগের কারণ হয়' (লাঙ্গে, 'রোমের প্রাচীন কথা', বার্লিন ১৮৫৬, ১ম খন্ড[৫১] , পৃঃ ১৯৫ যেখানে লিভিয়াসের উদ্ধৃতি নিয়ে হুশকের লেখার উপর মন্তব্য করা হয়েছে)। এই অনুমান যদি সঠিক হয়, তাহলে উদ্ধৃতিটা স্বাধীন রোমক স্ত্রীলোক সম্পর্কে কিছুই প্রমাণ করে না এবং নিজের গোত্রের মধ্যে বিবাহের বাধ্যবাধকতার কথা বলার যুক্তি একেবারে নেই।

Enuptio gentis বাক্যাংশটি লিভিয়াসের মাত্র এই একটি জায়গাতেই আছে এবং সমগ্র রোমক সাহিত্যের অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। Enubere শব্দটি, যার অর্থ বাইরে বিবাহ করা, এটিও লিভিয়াসে মাত্র তিন জায়গায় পাওয়া যায়, কিন্তু গোত্রের প্রসঙ্গে নয়। রোমক স্ত্রীলোকেরা কেবল গোত্রের মধ্যেই বিবাহ করতে পারে এই আজগুবি ধারণা শুধু এই একটিমাত্র উদ্ধৃতি থেকেই। কিন্তু এই ধারণা দাঁড়াতে পারে না কারণ, হয় উদ্ধৃতিটি মুক্তদাসীদের উপর বিশেষ বিধিনিষেধ সম্পর্কিত যে ক্ষেত্রে স্বাধীন স্ত্রীলোকদের (ingenuae) সম্পর্কে কিছুই প্রমাণিত হচ্ছে না, অথবা যদি এটি স্বাধীন স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হয় তাহলে বরং এতে প্রমাণই হয় যে, তারা নিয়মমতো গোত্রের বাইরেই বিবাহ করত এবং তাদের বিবাহের ফলে তারা স্বামীর গোত্রে চলে যেত। অতএব এই উদ্ধৃতিটি মমসেনের বিরুদ্ধে এবং মর্গানের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

রোমের প্রতিষ্ঠার প্রায় তিনশ' বছর পরেও গোত্রের বন্ধন এত শক্ত ছিল যে, ফেবিয়ান নামে একটি প্যাট্রিকশিয়ান গোত্র সেনেটের অনুমতি নিয়ে নিজেরাই প্রতিবেশী ভেই নগরের বিরুদ্ধে অভিযান করে। কথিত আছে যে, তিনশ' ছজন ফেবিয়ান অভিযানে যায় এবং একটি চোরা আক্রমণে নিহত হয়। একটিমাত্র বালক অবশিষ্ট ছিল এবং তার থেকেই গোত্রের বংশধারা চলে।

আমরা আগেই বলেছি যে, দশটি গোত্র নিয়ে একটি ফ্রাত্রী গঠিত হতো, যাকে এরা বলত 'কিউরিয়া' এবং গ্রীক ফ্রাত্রীর চেয়ে এর অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব ছিল। প্রত্যেক কিউরিয়ার নিজের ধর্মানুষ্ঠান, পূতবস্তু এবং পুরোহিতরা থাকত। সমস্ত পুরোহিত একত্র হয়ে রোমকদের একটি পুরোহিতমণ্ডলী গঠিত হতো। দশটি কিউরিয়া নিয়ে একটি উপজাতি গঠিত হতো যারও সম্ভবত প্রথম দিকে নির্বাচিত প্রধান থাকত – যুদ্ধের নেতা ও প্রধান পুরোহিত যেমন অন্য সব ল্যাটিন উপজাতির ছিল। তিনটি উপজাতি একত্র মিলে হয় রোমক জাতি populus romanus।

অতএব রোমক জাতির সভ্য কেবল তারাই হতে পারত যারা ছিল কোনো গোত্রের সভ্য এবং সেজন্য কোনো একটি কিউরিয়া ও উপজাতির সভ্য। এই জাতির প্রথম সংবিধান ছিল নিম্নরূপ। সামাজিক কাজকর্ম পরিচালনা করত সেনেট যার সম্পর্কে নিয়ে বুরই প্রথমে নির্ভুল বিবরণ দিয়েছেন যে, এটি তিনশ' গোত্র প্রধানদের নিয়ে গঠিত; গোত্রের প্রধান হিসাবে এই ব্যক্তিদের পিতা (patres) বলে সম্ভাষণ করা হতো এবং সমবেতভাবে এদের বলা হতো সেনেট (প্রধানদের পরিষদ, senex কথাটি থেকে, যার মানে বৃদ্ধ)। এখানেও গোত্রের একই পরিবার থেকে প্রধান বাছাই করবার রীতি থেকে

৫১. L. Lange Romische Alterthumer. Bd. I-III. Berlin. 1856-1871. –সম্পাঃ

প্রথম গোত্রের আভিজাত্য এসে পড়ল। এই পরিবারগুলিকে প্যাট্রিশিয়ান আখ্যা দেওয়া হলো এবং সেনেটে আসার বিশেষ অধিকার ও সব সরকারী পদগুলির সর্বের অধিকার তারা দাবি করল। জনগণ যে কালক্রমে এই দাবি মেনে নেয় এবং তার ফলে এটি একটি সত্যকার অধিকার হয়ে দাঁড়ায়, এই ব্যাপারটি এই কিংবদন্তীতে প্রকাশ পেয়েছে যে, রমুলাস আদি সেনেটরগণ ও তাদের বংশধরদের প্যাট্রিশিয়ানদের পদমর্যাদা ও সুবিধাগুলি দান করেন। যেমন এথেনীয় bule তেমনি সেনেটেরও বহু ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করবার ক্ষমতা ছিল এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাগুলির, বিশেষত নতুন আইনের, প্রাথমিক আলোচনা করত। এই আইনগুলো গ্রহণ করত জনসভা, যার নাম ছিল comitia curiata (কিউরিয়াগুলির সভা)। সমবেত জনগণ কিউরিয়া অনুযায়ী স্থান নিত এবং প্রত্যেক কিউরিয়ার সম্ভবত আবার গোত্র হিসাবে; সিদ্ধান্ত নেবার সময়ে ত্রিশটি কিউরিয়ার প্রত্যেকের একটি করে ভোট থাকত। কিউরিয়াদের এই সভা আইন গ্রহণ বা বর্জন করত, rex সমেত (তথাকথিত রাজা) সমস্ত উচ্চতর পদাধিকারীদের নির্বাচিত করত, যুদ্ধ ঘোষণা করত (কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠা করত সেনেট) এবং সর্বোচ্চ আদালতরূপে রোমক নাগরিকদের প্রাণদণ্ডের সমস্ত মামলার সংশ্লিষ্ট পক্ষদের আপিল নিষ্পত্তি করত। সর্বশেষে সেনেট ও জনসভার পাশেই ছিল rex, ঠিক গ্রীকদের বাসিলিয়ুসের অনুরূপ এবং মমসেন যেভাবে দেখিয়েছেন মোটেই তিনি সেরূপ একচ্ছত্র রাজা নন।[৫২] তিনিও যুদ্ধের সেনাপতি, প্রধান পুরোহিত এবং কোনো কোনো বিচারালয়ের সভাপতি ছিলেন। বেসামরিক প্রশাসনে তাঁর কোনো অধিকার ছিল না অথবা নাগরিকদের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির ব্যাপারে তাঁর কোনো ক্ষমতা ছিল না, কেবল যুদ্ধের অধিনায়ক হিসাবে তাঁর শৃঙ্খলাবিধায়ক শক্তি থেকে অথবা আদালতের প্রধান বিচারপতি রূপে রায় কার্যকরী করার শক্তি থেকে যেটুকু অধিকার বর্তাতো তা ছাড়া। রেক্সের পদ বংশগত ছিল না, বরং তাঁকে সম্ভবত বিদায়ী রেক্সের মনোনয়ক্রমে, প্রথমে কিউরিয়াগুলির সভা নির্বাচিত করত, এবং তারপর আবার দ্বিতীয় সভায় তাঁকে বিধিমতো অভিষেক করা হতো। তাঁকে যে পদচ্যুত করা যেত, তা গর্বিত টাক্‌ভিনিয়সের ভাগ্য থেকেই প্রমাণ হয়।

বীর যুগের গ্রীকদের মতোই তথাকথিত রাজাদের সময়কার রোমকেরা একটি সামরিক গণতন্ত্রে বসবাস করত যার ভিত্তি ছিল গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতি, এর থেকেই ঐ গণতন্ত্রের বিকাশ হয়। যদিও কিউরিয়াগুলি ও উপজাতিগুলি অংশত এক কৃত্রিম সংগঠন হয়ে থাকতে পারে, তবু যে সমাজে তাদের উদ্ভব হয় এবং যা তখনো তাদের চারিদিকে ঘিরে ছিল, সেই সমাজেরই খাঁটি ও স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত আদর্শের ছাঁচেই তাদের গড়া হয়। যদিও স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত প্যাট্রিশিয়ান অভিজাতেরা ইতিমধ্যেই

৫২. ল্যাটিন rex শব্দ কেল্টিক-আইরিশ righ (উপজাতির প্রধান) এবং গথদের reiks শব্দের সমার্থজ্ঞাপক। শেষ শব্দটি যে আমাদের Furst এর মতো (ইংরেজী first ও ডেনিশ forste শব্দ) শুরুতে বোঝাত গোত্র বা উপজাতির প্রধান, সেটা স্পষ্ট হয় এই তথ্য থেকে যে, গথেরা চতুর্থ শতাব্দীতে পরবর্তীকালের রাজা, সমগ্র জনগণের সমরনায়ক বুঝাবার জন্য ইতিমধ্যে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করত যথা, thiudans। আলফিলার অনুবাদিত বাইবেলে আর্টাক্সেরক্‌সেস্‌ ও হেরড্‌কে কখনই reiks বলা হয়নি, পরন্তু কেবল thiudans বলা হয়েছে এবং সম্রাট টাইবেরিয়াসের শাসিত দেশকে reiki নয়, পরন্তু thiudinassus বলা হয়েছে। গথদের thiudans অথবা ভুল অনুবাদ করে আমরা যে নাম দিয়েছি সেই রাজা Thiudareiks, Theodorich অর্থাৎ Dietrich দুটো নামই একসঙ্গে মিলে যায়। (এঙ্গেলসের টীকা।)

তাদের পদভূমি পেয়ে গিয়েছিল, এবং রাজারা ক্রমে ক্রমে নিজেদের অধিকার বাড়াবার চেষ্টা করছিল, তাহলেও এতে সংবিধানের আদি মৌলিক চরিত্র বদলে যায় না এবং এইটাই হচ্ছে আসল কথা।

ইতিমধ্যে রোম নগরীর এবং দেশজয়ের ফলে প্রসারিত রোমক প্রদেশের জনসংখ্যাও বাড়তে থাকে, অংশত বহিরাগতদের জন্য এবং অংশত বহিরাগতদের জন্য এবং অংশত বিজিত অঞ্চলগুলি, বিশেষ করে ল্যাটিন জেলাগুলির জনগণ মারফত। এইসব নতুন প্রজারা (এখনকার মতো আমরা আশ্রয়াধীনদের কথা আলোচনা করছি না) পুরাতন গোত্র, কিউরিয়া ও উপজাতির বাহিরের লোক এবং সেইজন্য এরা populus romanus বা যথার্থ রোমক জনসম্প্রদায়ের অন্তর্গত নয়। এরা ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন ছিল, এরা জমির মালিক হতে পারত, এদের খাজনা দিতে হতো এবং যুদ্ধের কাজ করবারও দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তারা সরকারী পদ পেতে পারত না এবং কিউরিয়াগুলির সভায় অংশ নিতে পারত না, কিংবা বিজিত রাষ্ট্রের ভূমি বণ্টনেও অংশগ্রহণ করত না। তারাই হলো প্লেব, সমস্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাদের অবিরাম সংখ্যাবৃদ্ধি এবং তাদের সামরিক শিক্ষা ও অস্ত্রসজ্জার জন্য তারা পুরাতন populus-এর কাছে – যারা এখন বাইরে থেকে সংখ্যাবৃদ্ধির সমস্ত পথ কঠোরভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল – ভয়ের কারণ হয়ে উঠল। উপরন্তু মনে হয় যে, 'পপুলুস' ও প্লেবের মধ্যে জমির মালিকানা একরকম সমভাবেই বণ্টন করা হয়েছিল, কিন্তু বাণিজ্য ও শিল্পজাত সম্পদ তখনও তত প্রচুর না হলেও প্রধানত প্লেবদের হাতেই ছিল।

একেই তো রোমের ঐতিহাসিক সূচনাপর্বের কিংবদন্তীগত উৎপত্তিটা সবই ঘন অন্ধকার আবৃত; তার উপরে আবার তাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে সমস্ত যুক্তিবাদী-প্রয়োগবাদী (rationalistic-pragmatic) চেষ্টা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে আইনগত শিক্ষাপ্রাপ্ত লেখকেরা আমাদের কাছে মূল গ্রন্থস্বরূপ যে সমস্ত রচনা রেখে গেছেন, সে সমস্তের ফলে এই অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়েছে। এই কারণেই কখন, কোন পথে, কী কী কারণে বিপ্লব এসে পুরানো গোত্র-প্রথার অবসান ঘটিয়েছিল সে সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থিত করা অসম্ভব। তবে প্লেব এবং পপুলুস-এর মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষের মধ্যেই যে এই সমস্ত কারণ নিহিত সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত।

রেক্স সার্ভিয়াস টুল্লিয়াসের নামে প্রচলিত নতুন সংবিধান অনেকটা গ্রীক ধাঁচের সঙ্গে, বিশেষত সোলনের সংবিধানের সঙ্গে মেলে; এতে যে নতুন জনসভা সৃষ্টি করা হলো তাতে পপুলুস ও প্লেব সমভাবে অন্তর্ভুক্ত হলো অথবা বাদ পড়ল শুধু এই বিচার করে যে তারা সামরিক কর্তব্য করে কিনা। সামরিক কর্তব্য করতে বাধ্য সমগ্র পুরুষ জনসংখ্যাকে ধনসম্পত্তি অনুযায়ী ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হলো। প্রথম পাঁচটি শ্রেণীর ন্যূনতম সম্পত্তি গুণ ছিল যথাক্রমে : প্রথম – ১,০০,০০০ অ্যাসেস (asses), দ্বিতীয় – ৭৫,০০০ অ্যাসেস, তৃতীয় – ৫০,০০০; চতুর্থ – ২৫,০০০ এবং পঞ্চম – ১১,০০০। দ্যুরো দ্য লা মালের হিসাবে ঐ পরিমাণগুলি যথাক্রমে ছিল ১৪,০০০; ১০,৫০০; ৭,০০০; ৩,৬০০ ও ১,৫৭০ মার্ক। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছিল প্রলেতারীয়রা যাদের ধনসম্পত্তি ছিল আরও কম এবং যাদের সামরিক দায়িত্ব ছিল না ও কর দিতে হতো না।

সেন্টুরিয়াগুলির নতুন সভায় (comitia centuriata) নাগরিকরা সৈন্যদের কায়দায় সঙ্ঘবদ্ধ হতো, একশো লোকের এক একটি বাহিনীতে (সেন্টুরিয়া) এবং প্রত্যেক সেন্টুরিয়ার একটি করে ভোট থাকত। কিন্তু প্রথম শ্রেণী ৮০ সেন্টুরিয়া যোগাত; দ্বিতীয় শ্রেণী –২২টি, তৃতীয় – ২০, চতুর্থ – ২২ ও পঞ্চম – ৩০ এবং ষষ্ঠ শ্রেণী শুধু শোভনতার জন্য একটি। এর সঙ্গে সর্বাপেক্ষা ধনীদের নিয়ে ১৮ সেন্টুরিয়া অশ্বারোহী গঠন করা হতো; সবশুদ্ধ ১৯৩ সেন্টুরিয়া। সংখ্যাধিক্যের জন্য ৯৭ ভোট দরকার এবং কেবল প্রথম শ্রেণী ও অশ্বারোহীদের মিলিয়ে হয় ৯৮ ভোট অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ; তারা একমত হলে অন্য শ্রেণীর মত ছাড়াই তারা বৈধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত।

এই নবগঠিত সেন্টুরিয়ার সভার উপর সেইসব রাজনৈতিক অধিকার অর্সাল যা পূর্বতন কিউরিয়াদের সভার হাত ছিল (নামমাত্র কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া); এর ফলে এথেন্সের মতো এখানে কিউরিয়াগুলি ও তাদের অন্তর্ভুক্ত গোত্রগুলি অবনত হয়ে কেবল ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় সংগঠনে পরিণত হলো এবং সেইভাবে তারা বহুদিন টিকেছিল, আর কিউরিয়াদের সভা শীঘ্রই উঠে গেল। তিনটি পুরানো গোত্রভিত্তিক উপজাতিকেও রাষ্ট্র থেকে বাদ দেবার জন্য চারটি অঞ্চলভিত্তিক উপজাতি গড়া হলো – এরা নগরের এক একটি পাড়ায় বাস করত এবং কিছু কিছু রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করত।

এইভাবে রোমেও ব্যক্তিগত রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থা তথাকথিত রাজপ্রথা অবসানের আগেই ধ্বংস হলো এবং আঞ্চলিক বিভাগ ও ধনসম্পত্তির তারতম্যের ভিত্তিতে একটি নতুন সংবিধান, রীতিমতো একটি রাষ্ট্রীয় সংবিধান তার জায়গা দখল করল। এখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল সৈন্যদলে কাজ করতে বাধ্য নাগরিকদের হাতে, এবং এই ক্ষমতা প্রযুক্ত হতো শুধু দাসদের বিরুদ্ধে নয়, অধিকন্তু তথাকথিত প্রলেতারীয়দের বিরুদ্ধে – যারা সামরিক কাজ করতে পেত না এবং যাদের অস্ত্রবহনের অধিকার ছিল না।

সর্বশেষ রেক্স গর্বিত টার্কুভিনিয়স – যিনি সত্যিকার রাজকীয় ক্ষমতাকে করতলগত করেছিলেন – তাঁকে বহিষ্কার করার পর, রেক্সের স্থলে (ইরকোয়াসদের মতো) সমক্ষমতাসম্পন্ন দুইজন সামরিক অধিনায়কের (কন্সাল) ব্যবস্থা করে নতুন সংবিধান আরো বিকশিত হয়েছিল মাত্র। এই সংবিধানের মধ্য দিয়েই চলেছে রোমক প্রজাতন্ত্রের সমগ্র ইতিহাস – কর্তৃপক্ষীয় পদে প্রবেশলাভ ও সরকারী জমিতে অংশলাভের জন্য প্যাট্রিশিয়ান ও প্লেবদের মধ্যকার সংগ্রাম ও সংঘাত, এবং বড় বড় ভূমিপতি ও অর্থপতিদের নতুন এক শ্রেণীতে শেষপর্যন্ত প্যাট্রিশিয়ান অভিজাততন্ত্রের লয়প্রাপ্তি; এরা সামরিক বৃত্তিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষকদের সমস্ত জমিকে ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করে নিয়েছিল, এইভাবে তৈরি বিরাট বিরাট ভূখণ্ডকে ক্রীতদাসদের সাহায্যে চাষ করবার ব্যবস্থা করেছিল, ইতালিকে জনশূন্য করে দিয়েছিল এবং এইভাবে কেবল সাম্রাজ্যের শাসনের দ্বারই উন্মুক্ত করে দেয়নি, তার অনুগামী জার্মান বর্বরদেরও দ্বার অবারিত করে দিয়েছিল।

৭
কেল্টিক ও জার্মানদের মধ্যে গোত্র

বর্তমান যুগের বিভিন্ন বন্য ও বর্বর জাতিগুলির মধ্যে অল্পাধিক বিশুদ্ধরূপে যে সব গোত্র প্রতিষ্ঠান পাওয়া গিয়েছে, অথবা এশিয়ার সভ্য জাতিগুলির প্রাচীন ইতিহাসে এই ধরনের সংগঠনের যেসব চিহ্ন আছে স্থানাভাবের জন্য তা নিয়ে আলোচনা করা গেল না। কোনো না কোনো গোত্র প্রতিষ্ঠান সর্বত্রই দেখা যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। গোত্রকে যথাযথ চিনতে পারার আগেই যিনি একে প্রাণপণে ভুল বোঝাতে চেয়েছেন সেই ম্যাক-লেনানই তার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন এবং মূল রূপরেখায় সঠিক বিবরণ দেন কালমিক, চার্কেশিয়ান, সাময়েড এবং তিনটি ভারতীয় উপজাতি, ওয়ারালি, মাগার ও মণিপুরীদের মধ্যে। সম্প্রতি মাক্সিম কভালেভস্কি প্শাভ্, খিভ্সুর, সেভানেটিয়ান ও অন্যান্য ককেশীয় উপজাতির মধ্যে একে আবিষ্কার করেন এবং এর বিবরণ দেন। এখানে আমরা কেল্টিক ও জার্মানদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করব।

কেল্টদের সবচেয়ে পুরানো যে আইনগুলি আমাদের কাল পর্যন্ত এসেছে তার মধ্যে গোত্রকে তখনো দেখা যায় পূর্ণ জীবন্ত রূপে। আয়ার্ল্যান্ডে ইংরেজরা বলপূর্বক এই প্রথা নষ্ট করবার পরেও তা অন্তত স্বতঃচেতনা রূপে জনমানসে আজও পর্যন্ত বেঁচে আছে। গত শতাব্দীর মাঝামাঝিতেও স্কটল্যাণ্ডে এটি পূর্ণরূপে প্রকট ছিল এবং এখানেও কেবল ইংরেজদের অস্ত্র, আইনবিধি ও আদালতের সামনেই পরাজিত হতে হয়।

একাদশ শতাব্দীর পরে নয়, ইংরেজদের বিজয়লাভের অনেক শতাব্দী আগে রচিত ওয়েল্সের পুরানো আইনগুলিতে দেখা যায় যে, তখনো গোটা গ্রামে সমবেত কৃষি চলছে, যদিও সেটা ব্যতিক্রম হিসাবে এবং পূর্ববর্তী সর্বজনীন প্রথার লুপ্তাবশেষ রূপে। প্রত্যেক পরিবারের পাঁচ একর নিজস্ব চাষের জোত ছিল; ঐ সঙ্গেই আর একটি ভূখণ্ডে সকলে সমবেতভাবে চাষ করত এবং ফসল ভাগাভাগি করত। আইরিশ ও স্কচ দৃষ্টান্তগুলি বিচার করে দেখলে আর কোন সন্দেহই থাকে না যে, এই গ্রাম্য সমাজগুলি ছিল গোত্র বা গোত্রের অনুবিভাগ, যদিও ওয়েল্সের আইন নিয়ে পুনরনুসন্ধান করলেও – যা সময়াভাবে আমার দ্বারা সম্ভব নয় (আমার নোটগুলি ১৮৬৯ সালের) – অবশ্য এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলবে না। কিন্তু ওয়েল্স্ ও আইরিশদের সূত্রে পাওয়া তথ্য থেকে এই জিনিস প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, একাদশ শতাব্দীতেও কেল্টিকদের মধ্যে জোড়বাঁধা পরিবার তখনও একপতিপত্নী পরিবারকে বিশেষ জায়গা ছেড়ে দেয়নি। ওয়েল্সে বিবাহ সাত বছর উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অচ্ছেদ্য বলে ধরা হতো না অথবা বলা ভালো বিচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া চলত। এমনকি সাত বছর পূর্ণ হতে মাত্র তিন

রাত্রি বাকি থাকলেও বিবাহিত দম্পতি পৃথক হতে পারত। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগাভাগি করত : স্ত্রী ভাগ করত এবং পুরুষ নিজের অংশ বেছে নিত। অত্যন্ত হাস্যকর কতকগুলি নিয়ম অনুযায়ী আসবাবপত্র ভাগ করা হতো। যদি পুরুষের দিক থেকে বিচ্ছেদ হয়, তাহলে স্ত্রীকে বিবাহের যৌতুক ও অন্য কয়েকটি জিনিস তাকে ফেরত দিতে হতো আর স্ত্রী যদি বিচ্ছেদ চাইত, তাহলে সে কিছু কম পেত। সন্তানসন্ততিদের মধ্যে পুরুষ পেত দুটি এবং স্ত্রী একটি, অর্থাৎ মেজো সন্তানটি। যদি বিবাহবিচ্ছেদের পরে স্ত্রীলোকটি আবার বিবাহ করত এবং তার প্রথম স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে আসত, তাহলে স্ত্রীলোক তার প্রথম স্বামীর অনুসরণ করতে বাধ্য, এমনকি সে ইতিমধ্যে তার নতুন স্বামীর ঘরে এক পা বাড়িয়ে থাকলেও। কিন্তু যদি কোনো দুজন সাত বছর একসঙ্গে থাকে, তাহলে আনুষ্ঠানিক কোনো বিবাহের ব্যাপার ছাড়াই তারা স্বামী স্ত্রী বলে বিবেচিত হয়। বিবাহের পূর্বে স্ত্রীলোক মোটেই কড়াকড়িভাবে কৌমার্য রক্ষা করত না এবং এরকম দাবিও করা হতো না; এই বিষয়ের বিধিনিষেধ ছিল একেবারে চপল এবং এটি বুর্জোয়া নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। যখন একটি স্ত্রীলোক অন্য পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করত তখন তার স্বামী তাকে প্রহার করতে পারত – এটি হচ্ছে তিনটি উপলক্ষের একটি যখন স্বামী প্রহার করলেও তার কোনো শাস্তি হতো না – কিন্তু প্রহারের পরে সে অন্য কোনও প্রতিকার দাবি করতে পারত না, কারণ 'একটি অপরাধের জন্য হয় প্রায়শ্চিত্ত নয় প্রতিশোধ, কিন্তু দুইই চলবে না।' যেসব কারণে একজন স্ত্রীলোক বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করলে সম্পত্তি বন্টনের সময়ে তার কোন অধিকার ক্ষুণ্ন হতো না, সেগুলি নানা ধরনেরঃ পুরুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের দুর্গন্ধই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতো। উপজাতির প্রধান অথবা রাজাকে প্রথম রাত্রির অধিকারের বদলে যে মুক্তিপণ (gobr merch, এ থেকে মধ্যযুগীয় প্রতিশব্দ marcheta, ফরাসী – marquette) দিতে হতো, আইনসংহিতায় তার একটি বড় ভূমিকা ছিল। স্ত্রীলোকদের জনসভায় ভোট দেবার অধিকার ছিল। এইসঙ্গেই বলা যায় যে, আয়ার্ল্যান্ডেও অনুরূপ অবস্থা দেখা গেছে। সেখানেও মেয়াদী বিবাহের বেশ প্রথা ছিল, এবং বিচ্ছেদের সময়ে স্ত্রীলোকেরা সুনির্দিষ্ট বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা পেত, এমনকি গার্হস্থ্য কাজের জন্য পারিশ্রমিক পর্যন্ত; অন্যান্য স্ত্রীর সঙ্গে এখানে একজন 'প্রথম স্ত্রী' থাকত এবং মৃতের সম্পত্তিভাগের সময় বৈধ ও অবৈধ সন্তানদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হতো না। এইভাবে আমরা জোড়বাঁধা পরিবারের যে ছবি পাই তার সঙ্গে তুলনায় উত্তর আমেরিকায় প্রচলিত বিবাহ মনে হবে অনেক বেশি কড়া; কিন্তু সিজারের যুগে যাদের মধ্যে সমষ্টি বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাদের মধ্যে একাদশ শতাব্দীতে এই অবস্থা বিশেষ আশ্চর্য নয়।

আইরিশ গোত্রের (sept, এখানে উপজাতিকে বলা হয় clainne, ক্ল্যান) প্রমাণ ও উল্লেখ পাই শুধুমাত্র প্রাচীন আইনের পুস্তকেই নয়, উপরন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ আইনজ্ঞরাও এর বিবরণ দিয়েছেন – ক্ল্যানের জমিগুলিকে ইংল্যান্ডের রাজার দখলে আনবার জন্য এঁদের সমুদ্রপারে পাঠানো হয়েছিল। সর্দাররা ইতিমধ্যেই জমিকে নিজের অধিকারভুক্ত যেখানে করেনি সেখানে এই সময় পর্যন্ত জমি যৌথভাবে ক্ল্যান অথবা গোত্রের সম্পত্তি ছিল। যখন গোত্রের কোনো লোক মারা যেত ও সেইজন্য একটি

গৃহস্থালি বন্ধ হতো, তখন গোত্রের প্রধান (ইংরেজ আইনজ্ঞরা তার নাম দিয়েছেন caput cognationis) বাকি গৃহস্থালিগুলির মধ্যে গোত্রের সমস্ত জমি পুনর্বণ্টন করতেন। সম্ভবত এই পুনর্বণ্টন সাধারণতঃ যে নিয়মে করা হতো তা আমরা জার্মানিতে দেখতে পাই। এখনও আমরা কিছু কিছু গ্রাম পাই – চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে বহু বহু গ্রাম পাওয়া যেত, – যেখানে ক্ষেতগুলি তথাকথিত রান্‌ডেল (rundale) বিধির মধ্যে পড়ে। ইংরেজ বিজয়ীরা গোত্রের যৌথ জমি বেদখল করবার পর থেকে সে জমির কৃষকেরা, স্বতন্ত্র প্রজা হিসাবে তার নিজস্ব জোতের জন্য খাজনা দেয় বটে, কিন্তু সমস্ত আবাদী ও মাঠ জমি একত্র করে গুণ ও অবস্থান বিচার করে ফালি ফালি ভাগ করে বণ্টন করে দেয়, মোসেল নদীর ধারে এই ফালির নাম Gewanne, এবং প্রত্যেকেই এক এক ফালি ভাগে পায়। জলাজমি ও চারণভূমি যৌথভাবে ব্যবহৃত হতো। মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও পুনর্বণ্টন মাঝে মাঝেই, কখনো কখনো বছরে বছরে হতো। এইরকম একটি rundale গ্রামের ছবি মোসেলের তীরে অথবা হোকভাল্ডের জার্মান কৃষক গৃহস্থালি গোষ্ঠীগুলির (gehofersschaft) সঙ্গে হুবহু মেলে। গোত্রগুলি এখন 'ফ্যাক্‌শনের'[৫৩] মধ্যেও টিকে রয়েছে। আইরিশ কৃষকেরা অনেক সময় দলবদ্ধ হয় এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অনুসারে যা মনে হয় যেন একেবারে বিদঘুটে ও অর্থহীন এবং যা ইংরেজদের একবারে অবোধ্য। এইসব দলের একমাত্র উদ্দেশ্য যেন একটি জনপ্রিয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্য জড় হওয়া, যাতে সগাম্ভীর্যে পরস্পরকে পিটিয়ে মারা হয়। এগুলি হলো ধ্বংসপ্রাপ্ত গোত্রের কৃত্রিম পুনরুজ্জীবন ও পরে তার বদলি, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গোত্র প্রবৃত্তির ক্রমানুবর্তন এতে প্রকাশিত হতো তাদের স্বকীয় একটা রূপে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, কোনো কোনো জায়গায় গোত্রের সদস্যরা প্রায় একসঙ্গে তাদের পুরানো এলাকাতে বসবাস করত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিরিশের দশকে মনাখান কাউন্টির অধিকাংশ অধিবাসী তখনও মাত্র চারিটি পারিবারিক নাম ব্যবহার করত, অর্থাৎ সেগুলি চারটি গোত্র অথবা ক্ল্যানের[৫৪] উত্তরাধিকারী।

১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ দমনের সময় থেকেই স্কটল্যান্ডে গোত্র প্রথার পতন দেখা যায়। এই প্রথার মধ্যে স্কচ ক্ল্যানের স্থান ঠিক যে কী তা অনুসন্ধান-সাপেক্ষ, তবে

---

৫৩. দল। – সম্পাঃ

৫৪. আমি আয়র্ল্যান্ডে অল্প কয়েকদিন থাকার সময় আবার উপলব্ধি করি যে, সেখানকার গ্রাম্য জনসংখ্যা তখনও কী পরিমাণে গোত্রের যুগের ধ্যান-ধারণার মধ্যে বাস করছিল। কৃষক যে জমিদারের প্রজা তাকে এখনও ক্ল্যানের প্রধানের মতো মনে করে, যে সকলের স্বার্থে চাষবাস তদারক করে; কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা হিসাবে সে করের অধিকারী, কিন্তু সে আবার আপদে বিপদে কৃষককে সাহায্য করতেও বাধ্য। ঐ একইভাবে প্রত্যেকটি সচ্ছল অবস্থার লোক দরিদ্র প্রতিবেশী বিপন্ন হলে তাকে সাহায্য করতে বাধ্য বলে ধরা হয়। এই সাহায্য মানে ভিক্ষাদান নয়; ধনী সদস্য অথবা ক্ল্যানের প্রধানের কাছ থেকে এটি ক্ল্যানের দরিদ্র সদস্যদের অধিকার বলেই প্রাপ্য। এতেই ব্যাখ্যা হয় কেন অর্থনীতিবিদ ও আইনজ্ঞরা অভিযোগ করেন যে, আইরিশ কৃষকের মাথায় আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তির ধারণা প্রবেশ করানো অসম্ভব। যে মালিকানার শুধু অধিকার আছে, কিন্তু দায়িত্ব নেই, তা বোঝার ক্ষমতা আইরিশ কৃষকের নেই। তাই আশ্চর্য হবার কথা নয় যখন দেখি যে, অনেক আইরিশ তাদের এই ধরনের সরল গোত্র ধারণাবলী নিয়ে সহসা ইংল্যান্ড বা আমেরিকার আধুনিক নগরগুলিতে এসে গিয়ে সেখানকার জনসংখ্যার একেবারে পৃথক নৈতিক ও আইনী মাপকাঠির মধ্যে তাদের নীতি ও ন্যায়-বিচার একেবারে গুলিয়ে ফেলে এবং সমস্ত নির্ভর হারিয়ে ব্যাপকভাবে নীতিহীনতায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। (চতুর্থ সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

নিঃসন্দেহে এইটির বিশেষ স্থান ছিল। ওয়াল্টার স্কটের নভেলগুলি স্কটল্যান্ডের উচ্চভূমির ক্ল্যানের ছবি আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত করে তুলেছে। এই বিষয়ে মর্গান বলছেন যে, 'এ হচ্ছে সংগঠন ও মনোবৃত্তির দিক দিয়ে গোত্রের একটি প্রকৃষ্ট নমুনা, গোত্র সদস্যদের উপর গোত্রবদ্ধ জীবনযাত্রার প্রভাবের একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত.... তাদের কলহ ও রক্তের বদলা, স্থানীয় এলাকায় তাদের অধিষ্ঠান, জমির যৌথ ব্যবহার, ক্ল্যানের প্রধানের প্রতি সভ্যদের আনুগত্য এবং সভ্যদের পরস্পর আনুগত্য, এইগুলির ভিতর আমরা গোত্র-সমাজের দুর্মর বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই ... বংশক্রম ছিল, পুরুষ অনুযায়ী, পুরুষের ছেলেমেয়েরা ক্ল্যানের মধ্যে থাকত এবং নারীর ছেলেমেয়েরা তাদের বাপেদের ক্ল্যানে পড়ত।' আগে স্কটল্যান্ডে মাতৃ-অধিকার যে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পিক্টসদের রাজপরিবারে যেখানে, বেডের কথায়, স্ত্রীলোক মারফত উত্তরাধিকার প্রচলিত ছিল। এমনকি মধ্য যুগ পর্যন্ত স্কচ ও ওয়েল্‌স্‌ পরিবারগুলির মধ্যে পুনালুয়া পরিবারের রেশের প্রমাণ পাই প্রথম রাত্রির অধিকার থেকে, তখন পর্যন্ত ক্ল্যানের প্রধান অথবা রাজা প্রাক্তন যৌথ স্বামীদের সর্বশেষ প্রতিনিধি হিসাবে মুক্তিপণ না পেলে সে অধিকার দাবি করতে পারত প্রত্যেক পাত্রীর কাছে।

****

জনসম্প্রদায়গুলির দেশান্তর-গমন শুরু হবার সময় পর্যন্ত যে জার্মানরা গোত্রে সঙ্ঘবদ্ধ ছিল সে কথা অকাট্য। সম্ভবত তারা আমাদের খ্রিস্টাব্দের মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে ডানিয়ুব, রাইন, ভিস্টুলা ও উত্তরের সাগরগুলির মাঝখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করত; কিমব্রি ও টিউটনরা তখনও পূর্ণমাত্রায় ভ্রাম্যমান এবং সিজারের সময় না আসা পর্যন্ত সুয়োভিরাও স্থায়ী বসত পাতেনি। সিজার স্পষ্টত বলেছেন যে, শেষোক্তরা গোত্র ও আত্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে (gentibus cognationibusque) বাস পেতেছে, এবং জুলিয়া গোত্রের (gens Julia) একজন রোমকের মুখের gentibus কথার যে সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে তার অপব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সমস্ত জার্মানদের সম্পর্কেই এই কথা প্রযোজ্য; এমনকি বিজিত রোমক প্রদেশগুলিতে তাদের বসতি স্থাপনটাও তখন গোত্র হিসাবেই চলেছে বলে মনে হয়। 'আলামান্নিয়ান আইন' প্রমাণ করে যে, ডানিয়ুবের দক্ষিণে দখলীকৃত ভূখণ্ডে জনগণ গোত্ররূপেই (genealogiae) বসবাস করে; genealogia কথাটি ঠিক সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে যে অর্থে পরে ব্যবহৃত হয়েছে 'মার্ক অথবা গ্রাম' গোষ্ঠী। সম্প্রতি কভালেভস্কি মত প্রকাশ করেছেন যে, এই genealogiae ছিল বৃহৎ গৃহস্থালী গোষ্ঠী, যাদের মধ্যে জমি ভাগ করা হতো এবং যা থেকে পরে গ্রাম্য গোষ্ঠীগুলি দেখা দেয়। Fara সম্পর্কেই ঐ একই কথা সম্ভবত খাটে, এই শব্দটি বার্গাণ্ডিয়ান ও লাঙ্গোবার্ডরা – অর্থাৎ একটি গথিক ও একটি হার্মিনোনিয়ান বা উচ্চভূমির জার্মান উপজাতি – একেবারে এক অর্থে না হলেও প্রায় ঠিক সেই জিনিসটাই বোঝাত যাকে 'আলামান্নিয়ান আইনে' বলা হতো genealogia। এই জিনিসটি ঠিক গোত্র অথবা গৃহস্থালী গোষ্ঠী, কোনটিকে বোঝাতো তা আরও অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

ভাষার রেকর্ড থেকে আমাদের সন্দেহ রয়ে যায় যে, জার্মানদের মধ্যে গোত্র বোঝাবার মতো একটিমাত্র সাধারণ প্রতিশব্দ ছিল কিনা এবং থাকলে সে শব্দটি কী। ব্যুৎপত্তির দিক দিয়ে গ্রীক genos, ল্যাটিন gens হলো গথিক kuni, মধ্য উচ্চ অঞ্চলের জার্মান kunne-এর অনুরূপ এবং একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা আবার মাতৃ-অধিকারের যুগের নির্দেশ পাই এই তথ্য থেকে যে, নারী শব্দটিও একই মূল থেকে এসেছে : গ্রীক gyne, স্লাভ zena, গথিক gvino, সাবেকি নর্স kona, kuna। আগেই বলা হয়েছে যে, লাঙ্গোবার্ড ও বার্গান্ডিয়ানদের মধ্যে আমরা fara শব্দটি পাই; গ্রিম অনুমান করেন যে, fara শব্দটির কল্পিত মূল হলো fisan যার অর্থ প্রজনন। আমার অভিমতে এটি এসেছে সুস্পষ্টতর মূল faran থেকে, যার মানে ভ্রমণ করা; এটি যাযাবর দলের একটি সুনির্দিষ্ট অংশকে বোঝাতো যারা নিঃসন্দেহেই আত্মীয় গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হতো, বহু শতাব্দী ধরে প্রথমে পূর্বদিকে ও পরে পশ্চিমে ভ্রমণের পরে এই শব্দটি ক্রমে গোত্র-গোষ্ঠী ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে থাকল। তারপর গথিক শব্দ sibja, অ্যাংলো-স্যাক্সন sib, সাবেকি উচ্চ ভূমির জার্মান sippia, sippa, sippe[৫৫]। পুরাতন নর্স ভাষায় আছে শুধু বহুবচনাত্মক শব্দ sifjar, মানে আত্মীয়স্বজন; একবচন শব্দটি কেবল একটি দেবীর নাম - Sif। সর্বশেষে আর একটি শব্দ 'হিল্ডেব্রান্ড সঙ্গীতে' পাওয়া যায়, যেখানে হিল্ডেব্রান্ড হাদুব্রান্ডকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'এই জনসম্প্রদায়ের পুরুষদের মধ্যে কে তোমার পিতা ... অথবা কী তোমার গোত্র ?' (eddo huelihhes cnuosles du sis)। যদি জার্মান ভাষায় গোত্রের কোন সাধারণ প্রতিশব্দ থেকে থাকে তাহলে সেটি খুব সম্ভব গথিক kuni – এর ইঙ্গিত মিলছে শুধু ঘনিষ্ঠ ভাষাগুলিতে একই সমার্থজ্ঞাপক প্রতিশব্দই থেকেই নয়, এই থেকেও যে kuning (রাজা), আদিতে যা গোত্র বা উপজাতির প্রধানকে বোঝাত – তাও এই শব্দটি থেকেই উদ্ভূত। Sibja (আত্মীয়স্বজন) শব্দ নিয়ে সম্ভবত মাথা ঘামাবার দরকার নেই; অন্তত প্রাচীন নর্স ভাষায় sifjar বলতে শুধু রক্তসম্পর্কযুক্ত আত্মীয় নয়, পরন্তু বৈবাহিক সম্বন্ধযুক্তদেরও বুঝাত; অতএব এতে অন্তত সংশ্লিষ্ট দুটি গোত্রের সদস্য ছিল এবং সেইজন্য sif শব্দটি নিশ্চয়ই গোত্রের প্রতিশব্দ ছিল না।

মেক্সিকান ও গ্রীকদের মতো জার্মানদের মধ্যেও যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারোহীদের এবং কীলকাকারে সন্নিবিষ্ট পদাতিক সৈন্যবাহিনীগুলিকেও গোত্র অনুযায়ী যুদ্ধসারিতে সাজান হতো। ট্যাসিটাস যখন বলেছিলেন : পরিবার ও আত্মীয়তা অনুযায়ী, তখন তাঁর ভাষায় সে অনির্দিষ্টতা থাকছে তার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, তাঁর সময়ে রোমে বহুপূর্বেই জীবন্ত সংগঠন হিসাবে গোত্রের অবসান ঘটেছিল।

ট্যাসিটাসের একটি উদ্ধৃতি চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ যেখানে তিনি বলেছেন : মায়ের ভাই ভাগিনেয়কে নিজের পুত্র মনে করে; কেউ কেউ এও বলেন যে, মামা ও ভাগিনেয়র রক্তসম্পর্ক পিতাপুত্রের রক্তসম্পর্কের চেয়ে বেশি পবিত্র ও ঘনিষ্ঠ, সেইজন্য জামিন রাখতে হলে যে ব্যক্তিকে সর্তবন্দী করা হচ্ছে তার নিজস্ব পুত্রটির চেয়ে তার ভাগিনেয়কেই ভালো জামিন মনে করা হয়। এখানে আমরা মাতৃ-অধিকারের এবং

৫৫. অর্থ আত্মীয়স্বজন। – সম্পাঃ

সেইহেতু আদি গোত্রেরও একটি জীবন্ত চিহ্ন দেখতে পাই, এবং এটি জার্মানদের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।[৫৬] যদি এরকম কোন গোত্রের কোন ব্যক্তি নিজের কোন দায়ের জন্য নিজের ছেলেকে জামিন রাখে এবং বাপের বিশ্বাসভঙ্গের জন্য ছেলেকে আত্মবলি দিতে হয়, তাহলে তা ছিল মাত্র বাপেরই ভাববার ব্যাপার। কিন্তু বোনের ছেলে যদি উৎসর্গীকৃত হয়, তাহলে কিন্তু গোত্রের পবিত্র আইনই লঙ্ঘিত হয়। তার নিকটতম আত্মীয়ের সর্বোপরি দায়িত্ব ছিল ঐ বালক বা যুবককে রক্ষা করা, এখানে সে হচ্ছে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী; তার উচিত ছিল হয় বালকটিকে জামিন রাখতে বিরত হওয়া অথবা চুক্তির শর্ত মিটিয়ে দেওয়া। জার্মানদের মধ্যে গোত্র সংগঠনের আর কোনো চিহ্ন না পেলেও এই একটি উদ্ধৃতিই প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট।

দেবতাদের গোধূলি এবং পৃথিবীর অবসান নিয়ে পুরানো নর্স সঙ্গীতের একটি অনুচ্ছেদ Valuspa আরো গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটা রচিত হয়েছে আরো আটশ' বছর পরে। এই যে 'ভবিষ্য-দর্শিনীর দর্শনে' ব্যঙ্গ ও বুগে সম্প্রতি খ্রিস্টধর্মের বিভিন্ন উপাদানের বিজড়নও আবিষ্কার করেছেন; তাতে আছে প্রলয়ের পূর্ববর্তী সার্বজনীন নীতিবিভ্রাট ও অধঃপতনের বিবরণের নিম্নলিখিত পঙক্তিগুলি :

Broedhr munu berjask	ok at bönum verdask,
munu systrungar	sifjum spilla.

'ভায়েরা পরস্পর যুদ্ধ করবে এবং পরস্পরকে হত্যা করে বোনের ছেলেরা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।' Systrungar মানে মাসীর ছেলে এবং কবির চোখে এই ধরনের রক্তসম্পর্ক লঙ্ঘন করা হচ্ছে ভ্রাতৃহত্যা অপরাধের চরম। শীর্ষ ব্যাপার হলো systrungar, এতে মায়ের দিকের আত্মীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যদি syskina-born অর্থাৎ ভাই ও বোনের ছেলেমেয়েরা অথবা syskina-synir অর্থাৎ ভাই ও বোনের ছেলেরা শব্দটি ব্যবহার করা হতো, তাহলে প্রথম পঙ্‌ক্তির তুলনায় দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি উত্থান না হয়ে একটা দুর্বল পতন হয়ে দাঁড়াত। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এমনকি ভাইকিংদের সময়ে যখন Voluspa রচিত হয়, তখনও স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় মাতৃ-অধিকারের স্মৃতি মুছে যায়নি।

কিন্তু ট্যাসিটাসের সময়ে অন্তত যাদের সঙ্গে তাঁর বেশি পরিচয় ছিল সেই জার্মানদের মধ্যে মাতৃ-অধিকারকে স্থানচ্যুত করে পিতৃ-অধিকার এসে গিয়েছিল : বাপের উত্তরাধিকারী হতো ছেলেমেয়েরা; ছেলেমেয়ে না থাকলে ভায়েরা অথবা কাকা-জেঠা ও মামারা হতো উত্তরাধিকারী। মায়ের ভায়ের উত্তরাধিকার মেনে নেওয়ার পিছনে

৫৬. গ্রীকরা কেবলমাত্র বীর-যুগের পুরাণ থেকেই মামা ও ভাগিনেয়ের সম্পর্কের প্রকৃতিগত বিশেষ ঘনিষ্ঠতার কথা শুনেছে, এটি বহু জাতির মধ্যে মাতৃ-অধিকারের লুপ্তাবশেষ রূপে পাওয়া যায়। ডাইয়োড্রা (চতুর্থ, ৩৪) অনুসারে মিলিয়েগার থিসিউসের পুত্রদের হত্যা করেন, এঁরা তাঁর মা অ্যালথিয়ার ভাই। অ্যালথিয়ার মতে এটি এত জঘন্য অপরাধ যে, তিনি হত্যাকারী নিজের ছেলেকেই অভিশাপ দেন এবং তাঁর মৃত্যু প্রার্থনা করেন। বিবরণে আছে যে, 'দেবতারা তাঁর ইচ্ছাপূরণ করলেন এবং মিলিয়েগারের মৃত্যু হলো।' ঐ একই গ্রন্থকর্তার মতে (ডাইয়োড্রস, ৪র্থ, ৪৪) হেরাক্লিসের নেতৃত্বে আর্গোনটরা থ্রেসে নেমে সেখানে দেখল যে, ফিনিয়ুস তার দ্বিতীয় স্ত্রীর প্ররোচনায় তার পরিত্যক্তা প্রথমা স্ত্রীর দুটি পুত্রের প্রতি নির্লজ্জভাবে নির্মম আচরণ করছিলেন। এই প্রথমা স্ত্রী ক্লিওপেট্রার ভাই– অর্থাৎ নিপীড়িত বালকদের মামা। তাঁরা তৎক্ষণাৎ ভাগিনেয়দের সাহায্যে এগিয়ে আসেন, তাঁদের মুক্ত করেন ও রক্ষীদের মেরে ফেলেন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

পূর্বোল্লিখিত রীতিরই সংরক্ষণ দেখা যায় এবং এতে আরও প্রমাণ হয় যে, তদানীন্তন জার্মানদের মধ্যে তখনও পিতৃ-অধিকার কত সদ্য। এমনকি মধ্যযুগের অনেকটা গত হবার পরও আমরা মাতৃ-অধিকারের চিহ্ন দেখতে পাই। এই যুগে পিতৃত্ব তখনো ছিল অনিশ্চিত, বিশেষত ভূমিদাসদের মধ্যে এবং একজন সামন্ত ভূস্বামী যখন নগরের কাছে পলাতক ভূমিদাস প্রত্যর্পণের দাবি করতেন, তখন দৃষ্টান্তস্বরূপ অগসবার্গে বাসল ও কাইজের্সলাউতের্নে ঐ ব্যক্তি যে ভূমিদাস ছিল তা প্রমাণ করতে হতো কেবলমাত্র মায়ের দিকের ছয়জন সবচেয়ে নিকট রক্তসম্পর্কযুক্ত আত্মীয়ের সাক্ষ্য অনুযায়ী। (মাউরার, 'নাগরিক সংবিধান'[৫৭] ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮১।)

মাতৃ-অধিকারের আর একটি জের যা তখন লুপ্ত হতে চেয়েছিল সেটি হচ্ছে স্ত্রীলোকদের প্রতি জার্মানদের শ্রদ্ধা যা রোমকদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ছিল প্রায় অবোধ্য। অভিজাত পরিবারের কন্যাদেরই জার্মানদের সঙ্গে চুক্তি রক্ষার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ জামিনদার বলে গণ্য হতো। স্ত্রী ও কন্যারা বন্দী হয়ে দাস রূপে বিক্রি হবে, এই ভীষণ চিন্তা যুদ্ধক্ষেত্রে যতখানি সাহস জাগাত, আর কিছুতেই তেমন হতো না। তারা স্ত্রীলোকদের পবিত্র মনে করত, ভাবত একধরনের নবী, এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলিতেও তাদের উপদেশ মানত। গোটা ব্যাটাভিয়ান অভ্যুত্থানে যেখানে সিভিলস জার্মান ও বেলজিয়ানদের নেতা হয়ে গেল প্রদেশে রোমক শাসনের ভিত্তি পর্যন্ত নড়িয়ে দিয়েছিল, তার প্রাণস্বরূপ ছিল লিম্পে নদীর তীরবর্তী ব্রুকতেরিয়ান নারী-পুরোহিত ভেলেদা। বাড়ির ভিতর স্ত্রীলোকদের অখণ্ড প্রতাপ ছিল বলে মনে হয়। ট্যাসিটাস বলেন যে, বৃদ্ধ ও শিশুদের সাহায্যে স্ত্রীলোকদেরই সমস্ত কাজ করতে হতো, কারণ পুরুষেরা শিকারে বেরুত, মদ খেত ও আড্ডা দিত; কিন্তু তিনি অবশ্য বলেননি কারা চাষ করত এবং যেহেতু তার বিবরণ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দাসেরা কেবল কর দিত, কিন্তু কোনো বাধ্যতামূলক পরিশ্রম করত না, সেইজন্য মনে হয় যে সামান্য চাষবাসের প্রয়োজন হতো, তা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের অধিকাংশকেই করতে হতো।

আগেই বলা হয়েছে বিবাহরূপ ছিল জোড়বাঁধা পরিবার যা ক্রমে একপতিপত্নীত্বের দিকে এগোচ্ছিল। তখনও কড়াকড়িভাবে একপতিপত্নীত্ব আসেনি, কারণ অভিজাতদের বহুপত্নী রাখতে দেওয়া হতো। মোটের উপর এরা কন্যাদের মধ্যে কঠোর কৌমার্যরক্ষার উপর জোর দিত (কেল্টিকদের বিপরীতে) ট্যাসিটাস বিশেষ উদ্দীপনার সঙ্গেই জার্মানদের বিবাহ বন্ধনের অচ্ছেদ্যতার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন বিবাহবিচ্ছেদের একটি মাত্র কারণ ছিল স্ত্রীলোকের দিক থেকে ব্যভিচার। কিন্তু এইখানে তাঁর বিবরণে অনেক ফাঁক আছে এবং অধিকন্তু এতে লম্পন রোমকদের সামনে খোলাখুলিই ধর্মের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। অন্তত এইটা নিশ্চিত : নিজেদের অরণ্যের মধ্যে জার্মানরা যদি এমন অসাধারণ নীতিনিষ্ঠার আদর্শ হয়েও থাকে, তাহলেও বাইরের জগতের সঙ্গে একটু সংস্পর্শই তাদের অপরাপর গড়পড়তা ইউরোপীয়দের স্তরে নামিয়ে আনবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। রোমক জীবনের আবর্তে নীতিনিষ্ঠার শেষ চিহ্নও মুছে গেল জার্মান ভাষার

৫৭. G.L. Maurer. Geschichte der Stadteverfassung in Deutschland, Bd. I-IV. Erlangen. 1869-1871. –সম্পাঃ

অবলুপ্তির চেয়েও ঢের তাড়াতাড়ি। এবিষয়ে গ্রিগরি তুর্কীর লেখা পড়লেই হবে। একথা বলা দরকার করে না, রোমে যে মার্জিত লাম্পট্য ছিল, জার্মানীর আদিম অরণ্যে তা থাকা সম্ভব ছিল না এবং তাই সেদিক দিয়েও রোমক জগতের চেয়ে তারা উন্নত ছিল, যদিও তাদের উপর দৈহিক ব্যাপারে সংযম চাপাবার প্রয়োজন করে না – এটা সমগ্রভাবে কোনো জাতির মধ্যেই কোনকালে প্রাধান্য করেনি।

গোত্র-বিধি থেকেই এসেছিল নিজের পিতা ও আত্মীয়দের কাছ থেকে শত্রুতা ও বন্ধুত্ব উত্তরাধিকারের বাধ্যবাধকতা; এবং ভেয়ারগিল্‌দ্‌ প্রথাও, যাতে নিহত বা ক্ষতিগ্রস্ত করলে রক্তাক্ত প্রতিশোধের বদলে জরিমানা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। একপুরুষ আগেও ভেয়ারগিল্‌দ্‌ প্রথাকে একান্তই জার্মান প্রথা বলে মনে করা হতো, কিন্তু তারপরে প্রমাণ হয়েছে যে, শত শত জাতির মধ্যে গোত্র-ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত রক্তাক্ত প্রতিশোধের এই নম্রতর রূপটা আচরিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ, আতিথ্যের বাধ্যবাধকতার মতো আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মধ্যেও এটি দেখা যায়। ট্যাসিটাস অতিথি সৎকারের যে বিবরণ দিয়েছেন ('জার্মানিয়া', পরিচ্ছেদ ২১) তা খুঁটিনাটি ব্যাপারে পর্যন্ত ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে মর্গানের বিবরণের সঙ্গে প্রায় হুবহু মেলে।

ট্যাসিটাসের সময়ে জার্মানরা চাষের জমি চূড়ান্তভাবে ভাগ করে নিয়েছিল কি না এবং সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিগুলিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, তা নিয়ে উত্তপ্ত ও অবিরত বিতর্কটা আজ অতীতের ব্যাপার। সমস্ত জনসম্প্রদায়ের মধ্যেই যে চাষের জমি গোত্র কর্তৃক এবং পরে সাম্যতান্ত্রিক পারিবারিক গোষ্ঠীগুলির দ্বারা যৌথভাবে কর্ষিত হতো – যেটার অস্তিত্ব সিজার সুয়োভিদের মধ্যে তখনো লক্ষ্য করেন; – পরে যে পরিবারগুলির মধ্যে জমি বণ্টিত ও কিছুকাল অন্তর পুনর্বণ্টিত হতো; এবং এই চাষের জমির পর্যায়িক পুনর্বণ্টন যে আজও পর্যন্ত জার্মানির কোনো কোনো অংশে রয়ে গিয়েছে, – এসব প্রমাণিত হয়ে গেছে বলে তা নিয়ে আমাদের সময় নষ্ট করার বিশেষ কিছু নেই। সিজার স্পষ্টভাবে সুয়োভিদের সম্পর্কে বলেছেন, এদের কোনো খণ্ডিত অথবা ব্যক্তিগত জোত নেই, তাই জার্মানরা যদি ১৫০ বছরে এই ধরনের যৌথ কৃষি থেকে ট্যাসিটাসের যুগে জমির বার্ষিক পুনর্বণ্টন ও ব্যক্তিগত কৃষিতে পৌঁছে থাকে তাহলে তাকে যথেষ্ট উন্নতি বলতে হবে; এত অল্পসময়ে এবং বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া যৌথ কৃষি জমির সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানায় আসা একেবারে অসম্ভব মনে হয়। অতএব ট্যাসিটাসের বক্তব্যকে তাঁর কথাগুলি দিয়েই বুঝতে হবে, তারা প্রতি বছর চাষের জমি বদল বা পুনর্বণ্টন করে এবং ঐ প্রণালীতে যথেষ্ট যৌথ জমি বাকি থাকে। এটা হলো কৃষির এবং ভূমি দখলের ঠিক সেই স্তর যা তদানীন্তন জার্মানদের গোত্র-প্রথার সঙ্গে যথাযথ খাপ খায়।

আমি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদটি আগেকার সংস্করণে যা ছিল সেইভাবেই অপরিবর্তিত রাখছি। ইতিমধ্যে প্রশ্নটির আর একটি দিক এসে পড়েছে। যখন কভালেভস্কি দেখিয়ে দিলেন যে, (পূর্বের ৪৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)[৫৮] পিতৃপ্রধান গৃহস্থালী গোষ্ঠী সর্বত্র না হলেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং এইটিই ছিল মাতৃ-অধিকার সংবলিত সাম্যতান্ত্রিক

৫৮. এঙ্গেলস যে পৃষ্ঠার কথা বলছেন সেটি চতুর্থ জার্মান সংস্করণের। এই সংকলনের ৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য– সম্পাঃ

পরিবার ও আধুনিক বিচ্ছিন্ন পরিবারের সংযোগ স্তর, তখন প্রশ্নটি আর এই থাকে না যে, জমি সাধারণ সম্পত্তি ছিল নাকি ব্যক্তিগত সম্পত্তি, মাউরার থেকে ভেইৎস পর্যন্ত যা নিয়ে আলোচনা চলছিল, পরন্তু প্রশ্নটি হয় এই যে সাধারণ সম্পত্তি কি রূপ নিয়েছিল? একথা নিঃসন্দেহে যে, সিজারের যুগে সুয়েভিরা শুধু জমির যৌথ মালিকই ছিল না, পরন্তু তারা সাধারণ স্বার্থে যৌথভাবেও তা চাষ করত। তাদের অর্থনৈতিক ইউনিট গোত্র অথবা গৃহস্থালী গোষ্ঠী অথবা মাঝামাঝি কোন সাম্যতন্ত্রী আত্মীয়মণ্ডলী ছিল নাকি স্থানীয় ভূমি অবস্থার তারতম্যের ফলে এই তিন ধরনই ছিল, এই প্রশ্নগুলি এখনও বহুদিন বিতর্কমূলক থাকবে। কভালেভস্কি বলছেন যে, ট্যাসিটাস বর্ণিত অবস্থার পেছনে মার্ক অথবা গ্রাম্য গোষ্ঠী ছিল না, ছিল গৃহস্থালী গোষ্ঠী এবং এইটিই অনেক পরে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে গ্রাম্য গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে রোমকদের সময় যেসব অঞ্চলে জার্মানরা ছিল এবং যে অঞ্চলগুলি পরে তারা রোমকদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়, সেখানকার বসতিগুলি নিশ্চয় গ্রাম ছিল না, পরন্তু কয়েক পুরুষের লোক নিয়ে বৃহৎ পরিবারভিত্তিক গোষ্ঠী যারা সেইমতই এক বৃহৎ ভূখণ্ডে চাষ আবাদ করত এবং চারিশাশের বুনো জমিটা তাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সাধারণ মার্ক হিসাবে ব্যবহার করত। চাষের জমি পরিবর্তন সম্পর্কে ট্যাসিটাসের উদ্ধৃতিটি তখন সত্যি একটি কৃষিগত তাৎপর্য পায় অর্থাৎ ঐ গোষ্ঠী প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডে চাষ করত এবং আমের বছরের ব্যবহৃত জমি হয় পতিত রাখা হতো নয় একেবারে পরিত্যক্ত হতো। জনসংখ্যার বিরলতার জন্য এত উদ্বৃত্ত অনাবাদী জমি থাকত যে, জমি নিয়ে কলহের কোনো দরকার ছিল না। বহু শতাব্দীর পরেই কেবল যখন গৃহস্থালী গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, প্রচলিত উৎপাদন-প্রণালীতে যৌথ কৃষি অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তখনই গৃহস্থালী গোষ্ঠী ভেঙে পড়ে। আগের যৌথ জমি ও মাঠ তখন থেকে বর্তমানের সুপরিচিত পদ্ধতিতে সম্প্রতি গঠিত বিভিন্ন ব্যক্তিগত পরিবারগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হতো, এইভাগ প্রথমে সাময়িকভাবে এবং পরে স্থায়ীভাবে হতো, কিন্তু বনভূমি, চারণভূমি এবং জলাধার সাধারণ সম্পত্তি থেকে গেল।

রাশিয়ার ক্ষেত্রে বিকাশের এই পদ্ধতি ইতিহাসগতভাবে পুরাপুরি প্রমাণিত হয়েছে। জার্মানি সম্পর্কে এবং গৌণত অন্যান্য জার্মান দেশগুলি সম্পর্কে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বহু বিষয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি মূল উৎসগুলির অনেক ভালো ব্যাখ্যা দেয় এবং ট্যাসিটাসের সময় পর্যন্ত গ্রাম্য গোষ্ঠী টেনে আনার পুরনো ধারণার চেয়ে সহজে সংকট সমাধান করে। সর্বপ্রাচীন দলিলগুলি যথা Codex Laureshamensis[৫৯]– এর মোটামুটি অনেক সহজ ব্যাখ্যা হয় গৃহস্থালী গোষ্ঠী দিয়ে, গ্রাম্য মার্ক গোষ্ঠী দিয়ে ততটা হয় না। অপরপক্ষে এই ব্যাখ্যায় আবার নতুন সমস্যা ও নতুন প্রশ্ন সমাধান করা দরকার হয়ে পড়ে। ভবিষ্যৎ অনুসন্ধান এই ব্যাপারে নিষ্পত্তি করবে। কিন্তু একথা আমি

৫৯. Codex Laureshamensis –ফরাসী রাজ্যে ওর্মস নগরের অনতিদূরে ৮ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিষ্ঠিত দাক্ষিণ পশ্চিম জার্মানির একটি বৃহৎ সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি, মঠ মঠের দানপত্র ও বিশেষাধিকার দলিলগুলির পাঠ-সংকলন; সংকলনটি রচিত হয় ১২শ শতকে; ৮ম-৯ম শতকের কৃষক ও সামন্ত মালিকানার ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল এটি। –সম্পাঃ

অস্বীকার করতে পারি না যে, খুবই সম্ভবত জার্মানি, স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও ইংল্যান্ডেও গৃহস্থালী ছিল মধ্যবর্তী স্তর।

সিজারের যুগে জার্মানরা আংশিকভাবে সদ্য স্থায়ী বসতি গেড়েছে এবং অংশতগাড়তে চাইছে, কিন্তু ট্যাসিটাসের সময় তাদের পূর্ণ এক শতাব্দী স্থায়ী বসবাস হয়ে গিয়েছিল; এর ফলে, জীবনযাত্রার উপকরণ যে প্রগতি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তারা কাঠের বাড়িতে বাস করত, তাদের পোশাক পরিচ্ছদ তখনও আদিম অরণ্যবাসীর মতো – কর্কশ পশমের আলখাল্লা ও পশুচর্ম এবং স্ত্রীলোক ও গণ্যমান্যদের জন্য সুতি অন্তর্বাস। তারা দুধ, মাংস, বুনো ফল এবং প্লিনির বিবরণ অনুযায়ী ওটমিল পরিজ খেত (আজ পর্যন্ত আয়ল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে এটি কেল্টিকদের জাতীয় খাদ্য এই ওট্‌মিল পরিজ)। তাদের সম্পদ ছিল গবাদি পশু তবু এগুলি নিকৃষ্ট জাতের, ছোট আকৃতি, কুৎসিত ও শৃঙ্গহীন ছিল; ঘোড়াগুলো ছিল ছোট টাটু, যারা খুব জোরে দৌড়াতে পারত না। টাকা পয়সা একমাত্র রোমক মুদ্রা, তা ছিল অল্প আর ব্যবহার কদাচিৎ হতো। তারা সোনা বা রূপার তৈজস তৈরি করত না এবং এইসব ধাতুকে তারা বিশেষ মূল্যও দিত না। লোহা দুষ্প্রাপ্য ছিল, অন্তত রাইন ও ডানিয়ুবের তীরবর্তী উপজাতিগুলির মধ্যে মনে হয় এ জিনিস এখানকার আকরিক নিয়ে তৈরি হতো না, সবটাই বাইরে থেকে আসত। রুণিক লিপি (গ্রীক ও ল্যাটিন অক্ষরমালার অনুকরণ) ব্যবহার হতো কেবল গুপ্ত সংকেত হিসাবে, এবং কেবলমাত্র ধর্মীয় যাদুবিদ্যায়। নরবলি তখনও প্রচলিত ছিল। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এরা বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তর থেকে তখন সবেমাত্র উচ্চতন স্তরে পৌঁছেছিল। কিন্তু যখন রোমকদের আশু সংস্পর্শে এসে পড়া উপজাতিগুলির ক্ষেত্রে রোমকদের শিল্পজাত পণ্য সহজে আমদানি হয় এবং তাতে করে তাদের নিজস্ব লৌহ ও বস্ত্রশিল্প গড়ে তোলা ব্যাহত হয়, তখনো কিন্তু উত্তর-পূর্বে, বল্টিক সমুদ্রের তীরবর্তী উপজাতিগুলি নিঃসন্দেহে এইসব শিল্প গড়ে তুলেছিল। শ্লেজভিগের জলাভূমিতে অস্ত্রসজ্জার যে সব টুকরো পাওয়া গিয়েছে – একটি লম্বা লোহার তলোয়ার, একটি ধাতব বর্ম, একটি রুপোর শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি এবং তারই সঙ্গে দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের সময়ের রোমক মুদ্রা তথা দেশান্তরগামী জনসংখ্যার দ্বারা বিক্ষিপ্ত জার্মানদের ধাতব তৈজস স্বকীয় ধরনের সূক্ষ্ম কলাদক্ষতার পরিচয় দেয়, এমনকি রোমক ছাঁচের অনুকরণে নির্মিত জিনিসগুলিও। সভ্য রোমক সাম্রাজ্যে গিয়ে বসবাসের সঙ্গে সঙ্গেই ইংল্যান্ড ছাড়া সবই জার্মান উপজাতিগুলির এই শিল্প নষ্ট হয়ে যায়। এই শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ কত সমভাবে ঘটেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রোঞ্জ কঙ্কণ থেকে। বার্গান্ডি, রুমানিয়া ও আজভ সাগরের উপকূলে যে সব নমুনা পাওয়া গিয়েছে – তা ব্রিটিশ অথবা সুইডিশদেরই কারখানা থেকে উৎপন্ন হতে পারত এবং সমভাবেই তার সন্দেহাতীত উৎস জার্মানিক।

তাদের প্রশাসনের সংবিধানও বর্বরতার উচ্চতন স্তর অনুযায়ী ছিল। ট্যাসিটাসের মতে তাদের মধ্যে সাধারণত প্রধানদের (principles) একটি পরিষদ থাকত যারা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলিতে সিদ্ধান্ত করত এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি জনসভার সামনে উত্থাপনের ব্যবস্থা করত। এই শেষোক্ত সভা বর্বরতার নিম্নতন স্তরে,

অন্ততপক্ষে আমেরিকানদের মতো যেসব ক্ষেত্রে আমরা এর সঙ্গে পরিচিত, সেক্ষেত্রে একটি গোত্রেরই হতো, উপজাতি অথবা উপজাতি সমামেলের ক্ষেত্রে তখনও এ জিনিস পাইনি। তখনও পরিষদের প্রধানরা সর্দার (duces) থেকে ঠিক ইরকোয়াসদের মতোই সুস্পষ্টভাবে আলাদা। প্রথমোক্তরা তখনই অংশত উপজাতির অন্যান্যদের কাছ থেকে গরু, শস্য প্রভৃতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। আমেরিকার মতো এখানেও এরা সাধারণত একই পরিবার থেকে নির্বাচিত হতো। পিতৃ অধিকারে উৎক্রমণের ফলে গ্রীস ও রোমের মতোই ক্রমে ক্রমে নির্বাচিত পদের পক্ষে বংশগত পদ হয়ে ওঠার সুবিধা হলো। এইভাবে প্রত্যেক গোত্রেই অভিজাত পরিবার দেখা দিল। বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের দেশান্তর যাত্রার সময়ে অথবা তার অব্যবহিত পরেই উপজাতিগুলির এই তথাকথিত সাবেকী অভিজাতদের অধিকাংশই লোপ পায়। সামরিক নেতারা শুধু নিজেদের গুণের জন্য এবং বংশ মর্যাদার বিচার বিবেচনা ছাড়াই নির্বাচিত হতো। তাদের ক্ষমতা অল্পই ছিল, নিজেদের দৃষ্টান্ত দেখানোই ছিল তাদের একমাত্র নির্ভর। ট্যাসিটাস স্পষ্টই বলেছেন যে, সৈন্যদলে সত্যিকার শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষমতা ছিল পুরোহিতদের হাতে। জনসভার হাতেই ছিল সত্যিকার ক্ষমতা। রাজা অথবা উপজাতির প্রধান সভাপতিত্ব করতেন এবং জনগণ সিদ্ধান্ত করত : গুঞ্জন দিয়ে ব্যক্ত করা হতো 'না' এবং উচ্চ ধ্বনি ও অস্ত্রের ঝঙ্কার ব্যক্ত করত 'হ্যাঁ'। জনসভা আবার বিচারসভাও ছিল। এখানে অভিযোগ উঠত এবং তার নিষ্পত্তি হতো; মৃত্যুদণ্ডও এখান থেকেই দেওয়া হতো, এটি কেবলমাত্র কাপুরুষতা, বিশ্বাসঘাতকতা অথবা অস্বাভাবিক লাম্পট্যের ক্ষেত্রেই দেওয়া হতো। গোত্র ও অন্যান্য বিভাগগুলিতেও সভাই বিচার করত, গোত্র-প্রধান হতো তার সভাপতি, সমস্ত আদি জার্মান বিচারালয়ের মতো সে শুধু বিচারকার্য পরিচালনা করত এবং প্রশ্ন উত্থাপন করত। জার্মানদের মধ্যে সর্বদা ও সর্বত্র রায় দিত সমগ্র জনসমষ্টি।

সিজারের সময় থেকে উপজাতিগুলির সমামেল দেখা দেয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে তখনই তাদের রাজা ছিল। সর্বোচ্চ সমরাধিনায়ক গ্রীক ও রোমকদের মতো স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী হতে চাইতো, এবং কখন কখন সে এ বিষয়ে সফলকাম হতো। এই সফল ক্ষমতা দখলকারীরা অবশ্য কখনই একচ্ছত্র শাসক ছিল না; তাহলেও তারা গোত্র প্রথার শৃঙ্খল ভাঙতে থাকে। মুক্ত দাসেরা কোনো গোত্রের সভ্য না হওয়ায় তাদের অবস্থা কিছুটা অনুন্নত ছিল বটে, কিন্তু নতুন রাজাদের প্রিয় পাত্র হিসাবে তারা প্রায়ই পদ, ধনসম্পত্তি ও সম্মান লাভ করত। এই একই জিনিস দেখা গেল যখন রোমক সাম্রাজ্যের বিজয়ের পর সামরিক নেতারা বড় বড় দেশের রাজা হয়ে বসলেন। ফ্রাঙ্কদের মধ্যে রাজার দাসেদের ও মুক্ত অনুচরদের প্রথমে রাজদরবারে এবং পরে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা ছিল এবং নতুন অভিজাতদের বেশিরভাগ অংশ ছিল এদেরই বংশজাত।

একটি প্রতিষ্ঠান ছিল রাজতন্ত্রের অভ্যুদয়ের বিশেষ অনুকূল : যোদ্ধৃবাহিনী। আমেরিকার লাল মানুষদের মধ্যে আমরা আগে দেখেছি, কীভাবে গোত্রের পাশাপাশি শুধু নিজেদের উদ্যোগে যুদ্ধ চালাবার জন্য ব্যক্তিগত সংগঠন গড়ে উঠত। জার্মানদের মধ্যে এই ব্যক্তিগত সংগঠনগুলি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। যে যুদ্ধনায়ক খ্যাতি লাভ করত, তাকে ঘিরে লুণ্ঠনকামী একদল তরুণ যোদ্ধা একত্র হতো যারা ব্যক্তিগত আনুগত্যে তার

কাছে দায়ী ছিল যেমন সেও দায়ী থাকত তাদের কাছে। সে তাদের ভরণপোষণ করত, দান দিত এবং ধাপে ধাপে তাদের সংঘবদ্ধ করত: ছোটখাট আক্রমণে শরীররক্ষী দল আর যুদ্ধের জন্য সর্বদা তৈরি একটি বাহিনী, বৃহত্তর অভিযানের জন্য শিক্ষিত অফিসারদল। এই যোদ্ধৃবাহিনী দুর্বল হতে বাধ্য ছিল, পরে, যথা ইতালিতে অডোয়েকারের সেনাপত্যে তা বস্তুত প্রমাণ হয়, তবু তাদের মধ্যে জনগণের পুরাতন স্বাধীনতা ধ্বংসের ভ্রূণ ছিল এবং জনসম্প্রদায়গুলির দেশান্তর যাত্রার সময় ও পরে তারা এই ভূমিকাই নেয়। কারণ প্রথমত, তারা রাজশক্তির অভ্যুদয়ের অনুকূলে অবস্থা সৃষ্টি করে; দ্বিতীয়ত ট্যাসিটাস যে ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছিলেন, এই যোদ্ধৃবাহিনীকে অবিরাম যুদ্ধ ও লুণ্ঠনমূলক অভিযান দ্বারাই ধরে রাখা যেত। লুঠ হয়ে উঠল উদ্দেশ্য। দলপতি কাছাকাছি কিছু করবার না পেলে তার বাহিনী নিয়ে যেত অন্য দেশে, যেখানে যুদ্ধ চলত ও লুটপাটের সুযোগ মিলত। যেসব জার্মান সাহায্য বাহিনী রোমক পতাকার অধীনে এমনকি বহুলাংশে জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াই করত তারা অংশত ছিল এই ধরনের যোদ্ধৃবাহিনী। তারাই ছিল সেই ভাড়াটে সৈন্য ব্যবস্থার বীজ যা জার্মানদের লজ্জা ও অভিশাপ। রোমক সাম্রাজ্য জয় করবার পরে রাজাদের এই যোদ্ধৃবাহিনী, রোমের গোলাম ও দরবারী চাকরদের সঙ্গে পরবর্তী যুগের অভিজাতদের দ্বিতীয় মূল অঙ্গ হয়ে ওঠে।

অতএব জার্মান উপজাতিগুলির মিলনে যখন জনসম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, তখন সাধারণভাবে তাদের ঠিক একই সংবিধান ছিল যা গ্রীকদের মধ্যে বীর যুগে এবং রোমকদের মধ্যে তথাকথিত রাজাদের সময়ে ছিল : জনসভা, গোত্র-প্রধানদের পরিষদ এবং যুদ্ধনায়ক, যে ইতিমধ্যেই সত্যিকার রাজকীয় ক্ষমতা পাবার অভিলাষী হয়ে উঠেছিল। গোত্র-ব্যবস্থার মধ্যে যা সম্ভব তার মধ্যে এইটিই ছিল সর্বোচ্চ বিকশিত সংবিধান, বর্বরতার উচ্চতন স্তরের এইটাই ছিল আদর্শ সংবিধান। যে গণ্ডি পর্যন্ত এই সংবিধান চলত সমাজ যেই তা ছাড়িয়ে উঠল, অমনি গোত্র-ব্যবস্থার শেষ হলো; সে ব্যবস্থা ফেটে গেল, তার স্থান নিল রাষ্ট্র।

৮
জার্মানদের মধ্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি

ট্যাসিটাসের মতে জার্মানরা ছিল জনবহুল সম্প্রদায়। বিভিন্ন জার্মান জনসম্প্রদায়ের জনসংখ্যার একটা মোটামুটি হিসাব সিজার দিয়েছেন : যারা রাইন নদীর বাম তীরে এসে দেখা দিয়েছিল, সেই উসিপেটান ও টেংক্‌টেরানদের জনসংখ্যা স্ত্রীলোক ও শিশুদের নিয়ে তাঁর মতে ছিল ১,৮০,০০০। অর্থাৎ একটি জনসম্প্রদায়েই প্রায় এক লক্ষ লোক[৬০], এটি ইরকোয়াসদের সর্বাধিক উন্নতির যুগের চেয়ে অনেক বেশি – শেষোক্তরা কুড়ি হাজারের কম লোক গ্রেট লেকস থেকে অহাইয়ো এবং পটোমাক পর্যন্ত গোটা দেশের ভীতি হয়ে উঠেছিল। রাইন অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগুলিকে যদি আমরা একটি মানচিত্রে দেখাবার চেষ্টা করি – বিবরণ থেকে এদের কথাই ভালো জানা যায় – তাহলে আমরা দেখব যে, গড়ে এক একটি জাতি বর্তমান প্রুশিয়ার একটি প্রশাসনিক জেলার মতো আয়তনে অর্থাৎ প্রায় ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার অথবা ১৮২ ভৌগোলিক বর্গমাইল জুড়ে ছিল। কিন্তু রোমকদের Germania Magna [৬১] ভিস্টুলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আয়তনে পাঁচ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। গড়ে একটি জনসম্প্রদায়ের জনসংখ্যা এক লক্ষ ধরলে বৃহত্তর জার্মানির সমগ্র জনসংখ্যা হতো পঞ্চাশ লক্ষ – বর্বর-গোষ্ঠীর জনসম্প্রদায়গুলির মধ্যে এই সংখ্যাকে বৃহৎ বলতে হয় যদিও প্রত্যেক বর্গ কিলোমিটারে ১০ জন অধিবাসী অথবা প্রত্যেক ভৌগোলিক বর্গমাইলে ৫৫০ জন বর্তমান যুগের তুলনায় নগণ্য। কিন্তু এই সংখ্যার মধ্যে তখনকার দিনের সমস্ত জার্মানদের ধরা হয়নি। আমরা জানি যে, কার্পেথিয়ান পর্বতমালা থেকে ডানিয়ুবের মোহানা পর্যন্ত অঞ্চলে বাস্তারনিয়ান, পিউকিনিয়ান ও অন্যান্য গথ বংশজাত জার্মান জাতিগুলি বাস করত। এগুলি এত জনবহুল ছিল যে, প্লিনি তাদের আখ্যা দিয়েছেন জার্মানদের পঞ্চম প্রধান উপজাতি; খ্রিস্টপূর্ব ১৮০ সালে তারা তখনই ম্যাসিডোনের রাজা পেরসিয়সের ভাড়াটে সৈন্যের কাজ করত এবং অগাস্টের রাজত্বের গোড়ার দিকে তারা এ্যাড্রিয়ানোপ্‌ল্‌ নগরীর কাছাকাছি পর্যন্ত ঠেলে গিয়েছিল। যদি আমরা ধরে নিই যে, তাদের সংখ্যা দশ লক্ষ মাত্র

---

৬০. এখানে যে সংখ্যাটা ধরা হয়েছে তা গলের কেল্টিকদের সম্পর্কে ডিওডোরাসের একটি অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রমাণিত হয় : 'গল অঞ্চলে অসমান জনসংখ্যার বহু জনসম্প্রদায় বাস করে। তাদের মধ্যে বৃহত্তম জনসম্প্রদায়ের জনসংখ্যা প্রায় দু-লক্ষ এবং ক্ষুদ্রতমের পঞ্চাশ হাজার' (Diodorus Siculus, v, 25)। এর থেকে গড়-সংখ্যা হয় সওয়া লক্ষ। গলের আলাদা জনসম্প্রদায়গুলি অধিকতর উন্নত হওয়ায় তাদের সংখ্যা জার্মানদের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি ছিল। (এঙ্গেলসের টীকা)।

৬১. বৃহত্তর জার্মানি। –সম্পাঃ

ছিল, তাহলে খ্রিস্টীয় যুগের সূচনায় জার্মানদের সংখ্যা সম্ভবত ষাট লক্ষের নিচে ছিল না।

জার্মানিতেও বসত পাতার পর জনসংখ্যা নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। আগে যে শিল্পোন্নতির উল্লেখ করা হয়েছে তার থেকেই এটি বেশ প্রমাণিত হয়। শ্লেজভিগের জলাভূমিতে যে জিনিসগুলি পাওয়া যায় তাদের মধ্যে রোমক মুদ্রাগুলি দিয়ে বিচার করলে তারিখ দাঁড়ায় তৃতীয় শতাব্দী। অতএব ঐ সময়ে বল্টিক অঞ্চলে ধাতু ও বস্ত্রশিল্প যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল, রোমক সাম্রাজ্যের সঙ্গে রীতিমতো ব্যবসা-বাণিজ্য চলত এবং বিত্তশালী শ্রেণীর লোকেরা কিছুটা বিলাসের মধ্যে থাকত – এইসবই হচ্ছে বেশি ঘন জনসংখ্যার সাক্ষ্য। এইসময়েই জার্মানরা রাইন নদীর সমগ্র রেখা, রোমক সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রাচীর এবং ডানিয়ুব বরাবর, অর্থাৎ উত্তর সমুদ্র থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত রেখা বরাবর তাদের সাধারণ আক্রমণ শুরু করে – এটি হচ্ছে বাইরে ছড়িয়ে পড়বার জন্য সচেষ্ট ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তিন শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামে গথিক জনসম্প্রদায়গুলির প্রায় সমগ্র মূল অংশটা (স্ক্যান্ডিনেভিয়ার গথ এবং বার্গান্ডিয়ানরা বাদে) দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয় এবং বহুবিস্তীর্ণ আক্রমণ রেখার বাম ভাগ গঠন করে; এই রেখার কেন্দ্রে উচ্চভূমির জার্মানরা (হার্মিনোনিয়ান) ডানিয়ুব নদীর ঊর্ধ্ব দিকে প্রবেশ করে এবং ইস্তিভোনিয়ানরা যাদের বর্তমানে ফ্রাঙ্ক বলা হয় তারা দক্ষিণ পার্শ্বে রাইন নদী ধরে এগোতে থাকে। ইঙ্গিভোনিয়ানদের ভাগ্যে পড়ে ব্রিটেন জয়ের কাজ। পঞ্চম শতাব্দীর শেষে ক্লান্ত, রক্তহীন ও অসহায় রোম সাম্রাজ্য আক্রমণকারী জার্মানদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতার শৈশব দেখেছি। এখন আমরা তার অন্তিমে উপস্থিত। রোমকদের পৃথিবীব্যাপী আধিপত্য ভূমধ্যসাগরের তীরে সমস্ত দেশগুলিকে বহুশতাব্দী ধরে সমপর্যায়ভুক্ত করে চলেছিল। যেখানে গ্রীক ভাষার কোনো প্রতিরোধ ছিল না, সেখানে সমস্ত জাতীয় ভাষা পথ ছেড়ে দিয়েছিল একধরনের বিকৃত ল্যাটিনের কাছে; এখন আর জাতিগত কোনো পার্থক্য ছিল না, কেউই আর গল, আইবিরিয়ান, লিগুরিয়ান, নরিকান ছিল না; সকলেই হয়েছিল রোমক। রোমক শাসন এবং রোমক আইন সর্বত্রই পুরাতন গোত্র-সমামেল ভেঙে দিয়েছিল এবং এইদিক দিয়ে স্থানীয় ও জাতীয় আত্মপ্রকাশের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত ধ্বংস করেছিল। নবজাত রোমক সত্তা এই ক্ষতিপূরণ করতে পারেনি; কারণ এতে কোনো জাতীয়তা প্রকাশ পেত না, প্রকাশ পেত শুধু জাতীয়তার অভাব। সর্বত্রই নতুন নতুন জাতির উপাদান ছিল। বিভিন্ন প্রদেশের ল্যাটিন উপভাষা ক্রমেই বেশি বেশি তফাত হতে থাকে; যে স্বাভাবিক সীমানাগুলি আগেকার দিনে ইতালি, গল, স্পেন ও আফ্রিকাকে স্বতন্ত্র অঞ্চল করেছিল সেগুলি তখনও ছিল, ও তাদের অস্তিত্ব তখনো অনুভূত হতো। কিন্তু কোথাও এমন শক্তি ছিল না যে এইসব উপাদানগুলিকে একত্র করে নতুন নতুন জাতি গড়ে তুলবে; কোথাও বিকাশের কোনো ক্ষমতা তথা প্রতিরোধের কোনো শক্তির, সৃজনশীল শক্তির কথা ছেড়েই দিলাম, চিহ্নমাত্র ছিল না। এই সুবৃহৎ ভূখণ্ডে অগণিত জনসংখ্যাকে একটিমাত্র বন্ধন ধরে রেখেছিল রোমক রাষ্ট্র; এবং কালক্রমে এইটিই হয়ে উঠেছিল তাদের জঘন্য

শত্রু ও উৎপীড়ক। প্রদেশগুলি রোমকে সর্বস্বান্ত করেছিল; রোম নিজেও অপর নগরগুলির মতো একটি প্রাদেশিক নগর হয়ে পড়ে, তার কিছু সুযোগ-সুবিধা ছিল, কিন্তু শাসনদণ্ড আর ছিল না। সে আর পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল না, সম্রাট ও তাদের শাসনকর্তাদের রাজধানীও ছিল না, কারণ তারা তখন কনস্টানটিনোপল, ট্রিভস এবং মিলানে থাকছে। কেবলমাত্র প্রজাদের শোষণের জন্য পরিকল্পিত এক বিরাট জটিল যন্ত্র হয়ে উঠেছিল রোমক রাষ্ট্র। খাজনা, রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক সেবা এবং বিভিন্ন ধরনের আদায় জনসাধারণকে গভীরতম দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিল। শাসক, ট্যাক্স আদায়কারী এবং সৈন্যদের শোষণমূলক আচরণ সে চাপটাকে অসহ্য করেছিল। পৃথিবীব্যাপী আধিপত্য নিয়ে রোমক রাষ্ট্র এই অবস্থা করে তুলেছিল : এর অস্তিত্বের যে অধিকার তার ভিত্তি ছিল দেশের ভিতরে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বাইরের বর্বরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। কিন্তু সে শৃঙ্খলা ছিল সর্বনিকৃষ্ট বিশৃঙ্খলার চেয়েও খারাপ এবং যে বর্বরদের হাত থেকে এই রাষ্ট্র নাগরিকদের রক্ষা করবার দাবি করত তাদেরই রক্ষাকর্তা বলে এই নাগরিকেরা অভিনন্দন জানাল।

সামাজিক অবস্থাও কম চরমে পৌছায়নি। প্রজাতন্ত্রের শেষ বছরগুলিতেই রোমক শাসনের ভিত্তি হয়ে উঠেছিল বিজিত প্রদেশগুলির নির্মম শোষণ। সাম্রাজ্য এই শোষণ তুলে দেয়নি, পরন্তু এইটিকেই নিয়ম করে তুলেছিল। সাম্রাজ্যের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্স এবং বাধ্যতামূলক সেবার মাত্রা বাড়াতে থাকে এবং সরকারী কর্মচারীরা আরো নির্লজ্জভাবে জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন ও অপহরণ করে চলে। বিভিন্ন জাতিগুলির উপর কর্তৃত্ব করত রোমকরা, কখনই তারা শিল্প ও বাণিজ্যের কাজ করত না। কেবল মহাজনীতেই তারা তাদের পুরোবর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে সেরা ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য যা কোনক্রমে কিছু কাল টিকে ছিল তাও সরকারী জবরদস্তি আদায়ের ফলে ধ্বংস পায়; যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেটা সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশে, গ্রীসে চলতে থাকে, কিন্তু এ কথা এখন আমাদের আলোচ্য নয়। সার্বজনীন দারিদ্র্য, ব্যবসা, হস্তশিল্প, চারুকলার অবনতি, জনসংখ্যার হ্রাস; নগরগুলির অবক্ষয়; নিম্নতর স্তরে কৃষির অধঃপতন – এই হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী রোমক আধিপত্যের চূড়ান্ত ফল।

সমগ্র প্রাচীন যুগ জুড়ে উৎপাদনের নির্ধারক শাখা ছিল কৃষি, এখন তা হয়ে উঠল আরো বেশি নির্ধারক। ইতালিতে বৃহদাকার মহালগুলি (ল্যাটিফান্ডিয়া) যেগুলি প্রজাতন্ত্রের অবসান কাল থেকে দেশের প্রায় সমগ্র ভূখণ্ড ছেয়ে ফেলেছিল, সেগুলিকে দুভাবে কাজে লাগান হতো : হয় চারণভূমি হিসাবে যেখানে জনসংখ্যাকে সরিয়ে তার স্থান নিয়েছিল ভেড়া ও গরু এবং যাদের দেখাশুনা করবার জন্য অল্প কয়েকজন ক্রীতদাসই যথেষ্ট ছিল; অথবা মহাল হিসাবে যেখানে বহুসংখ্যক দাসের সাহায্যে বৃহৎ আকারে ফলের চাষ চলত, অংশত মালিকদের বিলাসের উপকরণ যোগাবার জন্য এবং অংশত শহরের বাজারে বিক্রয়ের জন্য। বড় বড় চারণভূমি সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল, এমনকি সম্ভবতঃ তাদের আরও প্রসার করা হয়েছিল। কিন্তু মহাল ও সেখানকার বাগানও মালিকদের দারিদ্র্য ও শহরগুলির ক্ষয়িষ্ণুতার জন্য ধ্বংস পেতে থাকে। ক্রীতদাসদের পরিশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত ল্যাটিফান্ডিয়ার অর্থনীতি আর লাভজনক ছিল

না; কিন্তু তখনকার দিনে এইটেই ছিল বৃহদাকার কৃষির একমাত্র সম্ভবপর রূপ। ছোট হারে কৃষি আবার হয়ে উঠল কৃষির একমাত্র লাভজনক রূপ। মহালের পর মহাল খণ্ড খণ্ড করে ছোট জোত হিসাবে বিলি-ব্যবস্থা করা হলো বংশানুক্রমিক প্রজাদের মধ্যে যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিত অথবা দেওয়া হলো partiarii-দের, প্রজা নয় যাদের বলা ভালো জোত পরিচালক। এরা তাদের কাজের জন্য বার্ষিক ফসলের ষষ্ঠাংশ, এমনকি নবমাংশ মাত্র পেত। মূলতঃ কিন্তু এই ছোট জোতগুলি বিলি হতো কলোনিদের (coloni) মধ্যে যারা বৎসরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিত; জমির সঙ্গে বাঁধা থাকত এবং জমির সঙ্গে তাদেরও বিক্রি করা চলত। এরা দাস ছিল না বটে, কিন্তু স্বাধীনও ছিল না, এরা স্বাধীন নাগরিকদের বিবাহ করতে পারত না এবং এদের নিজেদের মধ্যে বিবাহকেও বৈধ বিবাহ মনে করা হতো না, যেমন দাসদের ক্ষেত্রে তেমনই এখানেও একে শুধুমাত্র সহবাস (contubernium) মনে করা হতো। এরা হচ্ছে মধ্যযুগের ভূমিদাসদের পূর্বসূরী।

প্রাচীনযুগের দাসপ্রথা অচল হয়ে উঠল। গ্রামাঞ্চলে বৃহদায়তন কৃষিতে অথবা শহরের কারখানাতে কোনোক্ষেত্রেই এ প্রথা আর মালিককে লাভ যোগাত না – এদের উৎপন্ন জিনিসের বাজারই লোপ পেয়েছিল। সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির যুগের বৃহদায়তন উৎপাদন এখন যেখানে নেমে এসেছিল সেই ছোট হারে কৃষি এবং ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পের মধ্যে অসংখ্য ক্রীতদাসের কোনো স্থান ছিল না। এখন ক্রীতদাসের স্থান রইল কেবল ধনীদের গার্হস্থ্য কাজ ও বিলাস জীবনের সেবায়। কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু দাসপ্রথার এখনও যতখানি প্রাণশক্তি ছিল তাতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমস্ত শ্রমকেই গোলামের কাজ মনে হতো, যে কাজ স্বাধীন রোমকদের মানমর্যাদার অনুপযোগী – এবং এখন সকলেই হয়ে উঠেছিল স্বাধীন রোমক। এইজন্য একদিকে যেমন অপ্রয়োজনীয় ক্রীতদাসরা বোঝার মতো হয়ে ওঠায় তাদের মুক্ত করে দিয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের সংখ্যা বেড়ে উঠল, তেমনই অপরপক্ষে কলোনির সংখ্যা এবং নিঃস্ব হয়ে পড়া স্বাধীন নাগরিকের সংখ্যা (আমেরিকায় প্রাক্তন দাস স্টেটগুলির গরিব শ্বেতজাতি লোকদের মতো) বাড়তে থাকে। প্রাচীন দাসপ্রথার এই ক্রমশঃ ধ্বংসের জন্য খ্রিস্টধর্মের কোনো কৃতিত্ব নেই। রোমক সাম্রাজ্যে বহু শতাব্দী ধরে খ্রিস্টধর্ম দাসপ্রথার ফল ভোগ করেছে এবং পরবর্তীকালে তারা খ্রিস্টানদের দাস ব্যবসা বন্ধ করবার কোনো চেষ্টাই করেনি, তা উত্তরে জার্মানদের দাসব্যবসা অথবা ভূমধ্যসাগরের তীরে ভেনিশিয়ান দাসব্যবসা অথবা আরও অনেক পরে নিগ্রোদের নিয়ে দাসব্যবসা[৬২] – কোনোক্ষেত্রেই নয়। দাসপ্রথা স্বাধীন মানুষের পক্ষে উৎপাদনী পরিশ্রম করাকে হেয় বলে চিহ্নিত করে সমাজে তার বিষাক্ত দংশন রেখে গেল। রোমক জগৎ এই কানাগলির মধ্যেই আটকে যায়; দাসপ্রথা অর্থনীতির দিকে দিয়ে অসম্ভব, কিন্তু স্বাধীন মানুষের পরিশ্রম আবার নীতির দিক দিয়ে ঘৃণ্য। প্রথমটি আর সামাজিক উৎপাদনের মূল রূপ হিসাবে টিকতে পারছিল না এবং দ্বিতীয়টি তখনও মূল

৬২. ক্রিমোনার বিশপ লুইতপ্রান্দের কথায় দশম শতাব্দীতে ভেরদে-এ অর্থাৎ পবিত্র জার্মান সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রধান শিল্প ছিল খোজা তৈরি করা, স্পেন দেশে মূরদের হারেমের জন্য খুব লাভ রেখে এদের চালান দেওয়া হতো। (এঙ্গেলসের টীকা)

রূপ হয়ে উঠতে পারে না। একটি আমূল বিপ্লবই কেবল এখানে কাজ করতে পারত।

প্রদেশগুলিতে অবস্থা এর চেয়ে ভাল ছিল না। বেশিরভাগ বিবরণ যা আমরা পেয়েছি তা হচ্ছে গল সম্পর্ক। কলোনিদের পাশাপাশি তখনও সেখানে স্বাধীন ছোট কৃষক ছিল। সরকারী কর্মচারী, বিচারক ও মহাজনদের অত্যাচার থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য এরা প্রায়ই ক্ষমতাশালী লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও আশ্রয় চাইত; এবং তারা একা একা নয়, পরন্তু গোটা গোষ্ঠী এই কাজ করত, তার জন্য চতুর্থ শতাব্দীর সম্রাটেরা বারবারই এই ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করে হুকুম জারি করত। আশ্রয় চেয়ে এদের কী সুবিধা হতো? রক্ষাকর্তা শর্ত হিসাবে জমির দখলী স্বত্ব নিজে নিতেন এবং প্রতিদানে তিনি কৃষককে আজীবন জমি চাষের নিরাপদ অধিকার দিতেন। হোলি চার্চ এই কৌশলটি স্মরণ করে নবম ও দশম শতাব্দীতে অবাধে তার অনুকরণ করে ভগবানের গৌরব ও নিজেদের জমিদারী বাড়াবার জন্য। এসময় কিন্তু, আনুমানিক ৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে, মার্সাইয়ের বিশপ সালভিয়েনস এই দস্যুবৃত্তির তীব্র নিন্দা করেন এবং তাঁর বিবরণে বলেন যে, রোমক কর্মচারী ও বড় জমিদারদের অত্যাচার এতই অসহ্য হয়ে ওঠে যে, অনেক 'রোমক' বর্বরদের দখলী অঞ্চলে পালিয়ে যায় এবং সেখানে বসতকারী রোমকরা ফের রোমক শাসনে কবলিত হওয়ার চেয়ে আর কিছুকেই বেশি ভয় করত না। গরীব পিতামাতারা যে ঐ সময়ে প্রায় তাদের ছেলেমেয়েদের দাস হিসাবে বিক্রি করত তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি আইন থেকে, যাতে ঐ কাজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

রোমকদের নিজেদের রাষ্ট্রের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার বিনিময়ে জার্মান বর্বররা তাদের সমস্ত জমির তিন ভাগের দু-ভাগ দখল করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। এই ভাগ হলো গোত্র-প্রথা অনুযায়ী; বিজেতারা সংখ্যায় আপেক্ষিকভাবে কম ছিল বলে বৃহৎ বৃহৎ ভূখণ্ড অবিভক্ত রয়ে গেল; এটি অংশত সমগ্র জনসম্প্রদায় ভোগদখল করত এবং অংশত উপজাতি অথবা গোত্রের সম্পত্তি ছিল। প্রত্যেক গোত্রে চাষের জমি ও চারণভূমি বিভিন্ন গৃহস্থালীর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হতো। ঐ সময়ে বারবার পুনর্বণ্টন হতো কিনা আমরা জানি না; অন্তত রোমক প্রদেশগুলিতে এই ব্যবস্থা শীঘ্রই পরিত্যক্ত হয় এবং ব্যক্তিগত অংশগুলি হস্তান্তরযোগ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি (allodium) হয়ে ওঠে। বনভূমি ও চারণভূমি সাধারণ ব্যবহারের জন্য অবিভক্ত থাকে; এরই ব্যবহার ও বিভক্ত জমি চাষের ধরন প্রাচীন রীতিনীতি এবং সমগ্র গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হতো। গোত্রগুলি যত বেশি দিন নিজের গ্রামে থাকত এবং কালক্রমে যত বেশি বেশি জার্মান ও রোমকরা মিশে যেত, ততই আত্মীয়তার বন্ধনের জায়গায় এসে যেত আঞ্চলিক বন্ধন। গোত্র বিলুপ্ত হয়ে আসছিল মার্ক, যেখানে অবশ্য তার উৎপত্তি হিসাবে সভ্যদের আদিম আত্মীয়তার যথেষ্ট চিহ্ন দেখা যেত। এইভাবে, অন্ততঃপক্ষে যেসব দেশগুলিতে মার্ক বেঁচে রইল – ফ্রান্সের উত্তরে, ইংল্যান্ডে, জার্মানি ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় – সেখানে গোত্রের সংবিধান অলক্ষ্যে আঞ্চলিক সংবিধানে রূপান্তরিত হয় এবং এইভাবে রাষ্ট্রের মধ্যে গ্রথিত হবার যোগ্যতা পায়। তথাপি সমগ্র গোত্র-প্রথার যা বৈশিষ্ট্য, সেই স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক চরিত্র এর মধ্যে ছিল এবং পরবর্তীকালে তার উপর চাপানো অবনতির মধ্যেও গোত্র-সংবিধানের একটা টুকরো এতে থেকে যায়; এর ফলে

নিপীড়িতদের হাতে এই হাতিয়ারটি আধুনিক যুগে ব্যবহারের জন্যও রয়ে গিয়েছে।

গোত্রের রক্তসম্পর্কের দ্রুত বিলোপের কারণ হচ্ছে এই যে, বিজয়লাভের ফলে উপজাতি ও সমগ্র জনসম্প্রদায়ের মধ্যে গোত্র-সংস্থাগুলিরও অধঃপতন ঘটে। আমরা জানি গোত্র-প্রথার সঙ্গে পরাধীন জাতির উপর শাসন মোটেই খাপ খায় না। এখানে এই জিনিসটি বৃহদাকারে দেখা যায়। জার্মান জনসম্প্রদায় রোমক প্রদেশগুলি দখল করার পর তাদের জয়লাভকে সংহত করা দরকার ছিল; কিন্তু রোমক জনগণকে গোত্র-সংগঠনের মধ্যে নিয়ে নেওয়াও যেমন সম্ভব ছিল না তেমনই গোত্র-সংস্থার সাহায্যে তাদের শাসন করাও অসম্ভব ছিল। প্রথমে রোমকদের আঞ্চলিক শাসনের যে সংস্থাগুলি বহুলাংশেই কাজ চালিয়ে যেতে থাকে তাদের শীর্ষে রোমক রাষ্ট্রের বদলে অন্য কোনো শক্তি প্রতিষ্ঠা করা দরকার ছিল এবং সেই শক্তি শুধুমাত্র অন্য একটি রাষ্ট্রই হতে পারে। এইভাবে গোত্র-সংবিধানের প্রশাসন-সংস্থাগুলিকে রাষ্ট্র-সংস্থায় রূপান্তরিত করতে হতো এবং অবস্থার চাপে এই কাজ করতে হতো খুব তাড়াতাড়ি। বিজয়ী জাতির প্রথম প্রতিনিধি কিন্তু ছিল তার যুদ্ধনায়ক। বিজিত এলাকার ভিতরের ও বাইরের নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধনায়কের ক্ষমতা বাড়াবার দরকার হয়ে পড়ে। তাই সমরনায়ককে রাজায় রূপান্তরিত করার সময় এসে গেল। সেটি করাও হলো।

ফ্রাঙ্কদের রাজত্ব ধরা যাক। এখানে শুধু রোমক রাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ জমি নয়, পরন্তু আরও যে সব বৃহৎ ভূখণ্ড বড় ও ছোট প্রদেশ ও মার্ক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়নি সেগুলি, বিশেষতঃ সমস্ত বৃহৎ বনভূমি, বিজয়ী সালিয়ান ফ্রাঙ্কদের নিরঙ্কুশ অধিকারে এল। সাধারণ সেনাপতি থেকে খাঁটি রাজায় রূপান্তরিত হবার পর ফ্রাঙ্কদের রাজা প্রথমে যে কাজটি করলেন তা হচ্ছে জাতির এই সম্পত্তিকে রাজকীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা, জনগণের কাছ থেকে এই সম্পত্তি হরণ করে তাঁর যোদ্ধবাহিনীর মধ্যে এটি দান করা, অথবা চাকরান দেওয়া। এই যোদ্ধবাহিনীতে প্রথম ছিল শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সামরিক রক্ষীরা এবং সৈন্যবাহিনীর বাকি উপনায়কেরা, অচিরেই তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হলো শুধু রোমকদের নিয়ে, অর্থাৎ রোমান-সংস্কৃতিসম্পন্ন গলদের নিয়ে নয়–যারা শীঘ্রই নিজেদের লেখাপড়া, বিদ্যাবত্তা, রোমান কথ্য ভাষা ও সাহিত্যিক ল্যাটিনএবংদেশের আইন-কানুনের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য তাঁর কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠল,–সংখ্যায় বৃদ্ধি করা হলো পরন্তু ক্রীতদাস, ভূমিদাস ও মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়েও, এরাই গড়েতুললতাঁর রাজ-দরবার, তাদের মধ্যে থেকেই তিনি প্রিয় পাত্র বাছাই করতেন। প্রথমে এদের সকলকেই জাতীয় জমির অংশ দেওয়া হলো প্রধানতঃ দান হিসাবে এবং পরে বেনিফিসিয়া[৬৩]

৬৩. বেনিফিসিয়া– beneficium (আক্ষরিক অর্থে 'দান')– ৮ম শতকের প্রথমার্ধে ফ্রাঙ্ক রাষ্ট্রে ব্যাপক প্রচলিত ভূমি পুরস্কারের রূপ। বেনিফিসিয়া রূপে প্রদত্ত ভূমি তথাধিবাসী অধীন কৃষকগণসহ প্রাপকের যাবজ্জীবন ব্যবহারে তুলে দেওয়া হতো কতকগুলি সুনির্দিষ্ট শর্তে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুদ্ধ সেবার শর্তে। পুরস্কারদাতা বা বেনিফিসিয়ারির মৃত্যু হলে অথবা শেষোক্ত জন তার দায় পূরণ না করলে বা তার মহাল অবহেলিত হতে থাকলে বেনিফিসিয়া ফিরে আসত মালিক বা তার উত্তরাধিকারীর হাতে, বেনিফিসিয়া পুনরায় দান করতে হলে পুরস্কার প্রদান ক্রিয়ার পুনরানুষ্ঠান প্রয়োজন হতো। বেনিফিসিয়া দান করার অধিকার শুধু রাজক্ষমতা নয়, গির্জা এবং বৃহৎ ভূস্বামীদেরও ছিল। বেনি-ফিসিয়া প্রথায় সামন্তশ্রেণী, বিশেষ করে ছোটো ও মাঝারি অভিজাত সৃষ্টি, কৃষকদের ভূমিদাসে পরিণতি, অনুসামন্ত সম্পর্ক, সামন্ততান্ত্রিক সোপানতন্ত্রের বিকশ সুগম হয়। পরে বেনিফিসিয়া পরিণত হয় উত্তরাধিকাররূপে প্রাপ্ত লেনায় বা ফিয়োদানে (সামন্ত সম্পত্তিতে)। –সম্পাঃ

রূপে– গোড়ার দিকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজার জীবদ্দশার জন্য – এবং এইভাবে জনসাধারণের ঘাড় ভেঙে একটি নতুন আভিজাত্যের ভিত্তি স্থাপিত হলো।

কিন্তু এইতেই শেষ নয়। পুরানো গোত্র-প্রথা দিয়ে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করা যায় না। প্রধানদের পরিষদ অনেক আগেই অচল হয়ে না পড়লেও এখন আর তার সভা ডাকা যায়না এবং শীঘ্রই এর জায়গায় এল রাজার স্থায়ী পারিষদবর্গ। পুরাতন জনসভাকে তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল, কিন্তু ক্রমশঃই এটি হয়ে উঠল সেনাদলের উপনায়ক ও নতুন উদীয়মান অভিজাতদের সভা। জমির মালিক স্বাধীন কৃষকগণ যারা ছিল ফ্রাঙ্ক জাতির বহুলাংশ তারা তখন অবিরাম অন্তর্যুদ্ধ ও দেশজয়ের যুদ্ধের ফলে, বিশেষতঃ শার্লেমিনির আমলে, অবসন্ন ও নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল, – ঠিক যেমন প্রজাতন্ত্রের শেষদিকে রোমের কৃষকদের অবস্থা হয়েছিল। এই কৃষকগণ যাদের নিয়ে প্রথমে গোটা সৈন্যবাহিনী গঠিত হয় এবং ফ্রাঙ্ক দেশের ভূখণ্ড জয়ের পরে যারা ছিল সৈন্যবাহিনীর কেন্দ্র, তারা নবম শতাব্দীর সূচনায় এত দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, পাঁচজনের মধ্যে একজনের পক্ষেও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম জোটানো মুস্কিল হয়। স্বাধীন কৃষকদের নিয়ে পূর্বতন সৈন্যবাহিনী যা প্রত্যক্ষভাবে রাজার আহ্বানে এগিয়ে আসত তাদের জায়গায় এল সদ্যোত্থিত অভিজাতদের বশংবদদের নিয়ে গড়া একটি বাহিনী। এই বশংবদদের মধ্যে পরাধীন কৃষকও ছিল, এরা সেইসব কৃষকদের বংশধর যারা আগে রাজা ছাড়া কোনো মনিব মানত না এবং আরও আগে তারা কোনও মনিবকেই এমনকি রাজাকেও মানত না। শার্লেমেনির উত্তরাধিকারীদের আমলে ফ্রাঙ্ক কৃষকদের সর্বনাশ পরিপূর্ণ হয় অন্তর্যুদ্ধ, রাজকীয় শক্তির দুর্বলতায় এবং সেইসঙ্গে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জবরদখলে – এদের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে শার্লেমেনির প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক কাউন্টারা, যারা নিজেদের পদাধিকার বংশানুক্রমিক করবার জন্য ব্যগ্র, এবং সর্বশেষে নর্মানদের হামলার ফলে। শার্লেমেনির মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্য নর্মানদের পদতলে তেমনই অসহায় হয়ে পড়ল চারশ' বছর আগে রোমক সাম্রাজ্য যেমন পড়েছিল ফ্রাঙ্কদের সামনে।

শুধু বাইরের দিকের অক্ষমতাই নয়, পরন্তু সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা বা বলা ভালো অব্যবস্থাও ছিল প্রায় একই ধরনের। স্বাধীন ফ্রাঙ্ক কৃষকদের ঠিক সেই হাল হলো, যা হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী রোমক কলোনিদের। যুদ্ধ ও লুণ্ঠনে সর্বস্বান্ত হয়ে তাদের সদ্যোত্থিত অভিজাতদের অথবা গির্জায় আশ্রয় নিতে হতো, কারণ রাজকীয় শক্তি তাদের রক্ষা করবার পক্ষে বড় বেশি দুর্বল ছিল; এই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের খুব বেশি দাম দিতে হয়। তাদের পূর্ববর্তী গলের কৃষকদের মতোই নিজেদের জমিজমার অধিকার রক্ষাকারীদের হাতে তুলে দিতে হলো এবং সেই জমি তারা বিভিন্ন পরিবর্তনশীল রূপের প্রজা হিসাবে ফিরে পেল, কিন্তু সর্বদাই সেবা ও কর দেবার শর্ত থাকত। এই ধরনের অধীনতার মধ্যে একবার গিয়ে পড়ায় তারা ক্রমে ক্রমে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারায়; কয়েক পুরুষ পরে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ভূমিদাস হয়ে পড়ে। কত তাড়াতাড়ি স্বাধীন কৃষকদের অবলুপ্তি হয় তার নমুনা দেখা যায় সাঁ-জার্ম্যাঁ দ্য প্রে-এর

মঠের জমিসংক্রান্ত ইর্মিনো-র নথিপত্র থেকে: তখন ঐ জায়গাটি প্যারিসের কাছে ছিল, এখন ঐটি প্যারিসের মধ্যে। এমনকি শার্লেমেনির জীবিতকালেই এই মঠের বহুদূর বিস্তৃত ভূসম্পত্তির মধ্যে ২,৭৮৮টি গৃহস্থালী ছিল, তাদের সকলেই হচ্ছে জার্মান নামওয়ালা ফ্রাঙ্ক; তাদের মধ্যে ২,০৮০ টি ছিল কলোনি, ৩৫ টি লিটি, ২২০ টি দাস এবং কেবল ৮ টি মাত্র স্বাধীন জোতের মালিক। যে পদ্ধতিতে রক্ষক কৃষকের জমি নিজে দখল করে তাকে শুধু আজীবন ব্যবহারের অধিকার দেয়, যে পদ্ধতিকে সালভিয়েনস ঈশ্বরবিরোধী বলে নিন্দা করেছিলেন সেইটিই এখন কৃষকদের ক্ষেত্রে গির্জা সর্বত্রই আচরিত করেছে। বেগার খাটুনি যা এখন ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হয়ে পড়ল, এটি যেমন রোমক 'আঙ্গেরী' (angariae) অর্থাৎ রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক সেবার আদর্শে গঠিত, তেমনি জার্মান মার্কের সদস্যরা পুল, রাস্তা নির্মাণ ও অন্যান্য গোষ্ঠীর কাজে যে পরিশ্রম করত তার ছাঁচেও গড়া। অতএব দেখায় যেন চারশ' বছর পরে সাধারণ মানুষ যেখান থেকে শুরু করেছিল, সেইখানেই আবার ফিরে এসেছে।

এতে কিন্তু মাত্র দুটি জিনিস প্রমাণ হয় : প্রথমত, রোমক সাম্রাজ্যের অবনতির সময়ে সমাজের স্তরবিভাগ ও সম্পত্তির বণ্টন ছিল কৃষি ও শিল্পে প্রচলিত উৎপাদনের স্তরের সম্পূর্ণ উপযোগী, অতএব তা ছিল অপরিহার্য; দ্বিতীয়ত, পরবর্তী চারশ' বছরে এই স্তর থেকে উৎপাদনের তেমন কিছু উন্নতি বা অবনতি হয়নি এবং সেইজন্য তেমনি অবশ্যম্ভাবীভাবে এতে একই ধরনের সম্পত্তির বণ্টন এবং জনসংখ্যার মধ্যে একইরকম শ্রেণী-বিভাগ দেখা দেয়। রোমক সাম্রাজ্যের শেষ কয়েক শতাব্দীতে গ্রামাঞ্চলের উপর নগরের পুরাতন আধিপত্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং জার্মান শাসনের প্রথম শতাব্দীগুলিতে এটি ফিরে আসেনি। এতে ধরে নিতে হয় কৃষি এবং সেই সঙ্গে শিল্প বিকাশের এক নিম্নস্তর। এরকম সাধারণ অবস্থায় অনিবার্যভাবে দেখা দেয় বড় বড় শাসক জমিদার এবং তাদের অধীনে ছোট ছোট কৃষক। এরকম সমাজের ক্রীতদাসের পরিশ্রম দ্বারা চালিত রোমক ল্যাটিফান্ডিয়ার অর্থনীতি অথবা ভূমিদাসের পরিশ্রমে পরিচালিত নতুনতর বৃহদাকার ব্যবস্থা জুড়ে দেওয়া যে কি রকম অসম্ভব ছিল তার প্রমাণ মেলে শার্লেমেনির সুবিদিত রাজকীয় মহাল নিয়ে তার অত্যন্ত ব্যাপক পরীক্ষামূলক চেষ্টার মধ্যে, যা প্রায় কোনো চিহ্ন না রেখেই লোপ পেয়েছে। পরে কেবল মঠগুলিতেই এই পরীক্ষা চলে এবং এগুলি কেবল তাদের পক্ষেই ফলপ্রসূ হয়; কিন্তু মঠগুলি ছিল ব্রহ্মচর্যের ভিত্তিতে গঠিত অস্বাভাবিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তারা এই ব্যতিক্রান্ত ফল ঘটাতে পেরেছিল, কিন্তু সেই কারণেই তাদের নিজেদেরও ব্যতিক্রম হয়েই থাকতে হয়।

তথাপি এই চারশ' বছরে অগ্রগতি দেখা যায়। যদিও সূচনায় যাদের দেখেছিলাম প্রায় হুবহু সেই প্রধান শ্রেণীগুলিকেই যুগের শেষেও দেখতে পাই, তথাপি এই শ্রেণীগুলির ভিতরের মানুষ বদলে গিয়েছিল। প্রাচীন দাসপ্রথা লুপ্ত হয়েছিল; গরিব হয়ে পড়ে যেসব স্বাধীন মানুষ পরিশ্রম করাকে দাসকর্মের মতো ঘৃণা করত, তারাও লোপ পেয়েছিল। রোমক কলোনি এবং নতুন ভূমিদাস – এই দুয়ের মাঝামাঝি ছিল স্বাধীন ফ্রাঙ্ক কৃষক। ক্ষয়িষ্ণু রোমক জগতের প্রয়োজনহীন স্মৃতি এবং নিষ্ফল সংঘাত' তখন মৃত ও সমাধিস্থ। নবম শতাব্দীর সামাজিক শ্রেণিগুলি কোনো ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার বদ্ধজলায় জন্ম

নেয়নি, নিয়েছে নতুন সভ্যতার গর্ভযন্ত্রণার মধ্যে। পূর্ববর্তী রোমকদের তুলনায় নতুন জাতি তার প্রভু ও ভৃত্য নিয়ে ছিল একটি তাগড়াই জাতি। শক্তিশালী জমিদার ও তার কাছে অধীন কৃষকগণের যে সম্পর্কটা রোমে ছিল প্রাচীন দুনিয়ার আশাহীন পতনের একটা পথ, সেইটাই এখন হলো একটা নতুন বিকাশের সূত্রপাত। উপরন্তু, এই চারশ' বছর যতই নিষ্ফল বলে মনে হোক না কেন তবু এই বছরগুলি রেখে গেল এক মহৎ ফল, তা হলো আধুনিক জাতিসত্তাসমূহ, আসন্ন ইতিহাসের জন্য পশ্চিম ইউরোপের মানুষদের নতুন করে সংবিন্যাস ও সন্নিবেশ। বস্তুত, জার্মানরা ইউরোপের মধ্যে নতুন জীবন সঞ্চয় করল; এবং সেইজন্যই জার্মান যুগে রাষ্ট্রের ভাঙনের পরিণামে নর্স সরোসেনদের বিজয় আসেনি, এল benefices ও অভিভাবক সম্পর্ক (commendation)[৬৪] থেকে সামন্ততন্ত্রে বিকাশ এবং জনসংখ্যার এমন প্রচণ্ড একটা বৃদ্ধি যে, নিতান্ত দু-শতাব্দী পরে ক্রুশেডে-এর রক্তক্ষয়ও বিনা ক্ষতিতেই তা সহ্য করতে পারে।

মুমূর্ষ ইউরোপের মধ্যে কী রহস্যময় যাদু দিয়ে জার্মানরা নতুন প্রাণ সঞ্চার করল? যে কথা আমাদের উগ্রজাতিবাদী ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন, এটা কি জার্মান জাতির তেমন কোনো সহজাত যাদুশক্তি? আদৌ না। জার্মানরা ছিল বিশেষতঃ সেই সময় একটি অতি গুণবান আর্য উপজাতি, যাদের তখন সতেজ বিকাশ চলছে। কিন্তু তাদের কোনো বিশেষ জাতিগত গুণ ইউরোপকে নবজীবন দেয়নি, এটা ঘটিয়েছে নিতান্তই তাদের বর্বরতা, তাদের গোত্র-সংবিধান।

তাদের ব্যক্তিগত গুণ ও সাহস, স্বাধীনতার প্রতি তাদের ভালোবাসা এবং তাদের গণতান্ত্রিক প্রবৃত্তি যাতে সমস্ত সামাজিক ব্যাপারকে নিজের ব্যাপার বলে ধরা হতো, সংক্ষেপে সেই গুণগুলি যা রোমকরা হারিয়ে ফেলেছিল এবং কেবলমাত্র যেগুলি রোমক দুনিয়ার পাঁক থেকে নতুন রাষ্ট্র গঠন করতে এবং নতুন জাতিসত্তাগুলিকে টেনে তুলতে পারত – এগুলি উচ্চতন স্তরের বর্বরদের বৈশিষ্ট্য, তাদের গোত্র-সংবিধানের ফল ছাড়া আর কী ?

যদি জার্মানরা একপতিপত্নীর প্রাচীন রূপকে পরিবর্তিত করে থাকে, পরিবারের মধ্যে পুরুষের আধিপত্যকে সংযত করে নারীর এমন একটি উচ্চতর মর্যাদা দিয়ে থাকে যা প্রাচীন জগতে কখনও জানা ছিল না, তবে সেটা তাদের বর্বরতা, তাদের গোত্র-প্রথা, তাদের মধ্যে মাতৃ-অধিকার যুগের তখনও জীবন্ত উত্তরাধিকার ছাড়া আর কীসের জোরে তারা করতে পেরেছিল?

যদি তারা অন্তত তিনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দেশে – জার্মানি, উত্তর ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে – মার্ক গোষ্ঠী হিসাবে সত্যিকার গোত্র-প্রথার একটা টুকরো বাঁচিয়ে

৬৪. Commendation –নির্দিষ্ট কতকগুলি শর্তে (অভিভাবকদের' জন্য সমর-সেবা ও অন্যান্য সেবা, তার হাতে নিজের জমি তুলে দিয়ে শর্তবন্দী ভোগস্বত্ব হিসাবে তা ফিরে নেওয়া) কৃষকদের সামন্ত অভিভাবকত্বে অথবা ছোটো সামন্তদের বড়ো সামন্তদের অভিভাবকত্বে আনয়নের একটি প্রথা যা ৮ম-৯ম শতক থেকে ইউরোপে প্রচলিত হয়। এই চুক্তিতে কৃষকদের অসতে বাধ্য করা হতো প্রায়শই জোরজবরদস্তি করে, তাদের কাছে একটির অর্থ ছিল স্বাধীনতা লোপ এবং ছোটো সামন্তদের কাছে এর অর্থ ছিল বড়োদের সঙ্গে অনুকূলতম সম্পর্ক। ফলে Commendation একদিক থেকে কৃষকদের ভূমিদাসে পরিণতি এবং অন্য দিক থেকে সামন্ত সোপানতন্ত্রের সংহতিতে সাহায্য করে। –সম্পাঃ

সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে পৌঁছে দিতে পেরে থাকে এবং এইভাবে মধ্যযুগের ভূমিদাসপ্রথার নিদারুণ নির্মমতার মধ্যেও শোষিত শ্রেণীদের, কৃষকদের স্থানীয় ঐক্য ও প্রতিরোধের উপায় দিয়ে দেয় যা প্রাচীনকালের ক্রীতদাসরা অথবা বর্তমানের প্রলেতারীয়শ্রেণী হাতের কাছে তৈরি জিনিস হিসাবে পায়নি – তবে বর্বরতা ছাড়া, গোত্র অনুযায়ী বসতি স্থাপন করার একান্ত বর্বরযুগীয় তাদের এই পদ্ধতি ছাড়া তার আর কী কারণ?

এবং সর্বশেষে তারা যদি তাদের নিজেদের মধ্যে প্রচলিত পরাধীনতার একটি নম্রতর রূপ বিকশিত ও সর্বত্র তার প্রবর্তন করে থাকে, যেটি ক্রমে ক্রমে রোমক সাম্রাজ্যেও দাসত্বপ্রথার জায়গা নেয় – এমন একটি রূপ যার প্রসঙ্গ ফুরিয়ে সর্বপ্রথম বলেন যে, এইটি শ্রেণীগতভাবে নিপীড়িতদের ক্রমশঃ মুক্তিলাভের একটি উপায় তুলে দেয়, (fournit aus cultivateurs des moyens d'affranchissement collectifet progressif), –এবং এইজন্য যেটি দাসত্বপ্রথার চেয়ে বহুগুণে ভাল, কারণ দাসপ্রথায় মুক্তি হতে পারত শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে এবং মধ্যবর্তী কোনো স্তর ছাড়াই (প্রাচীনযুগে সফল বিদ্রোহের দ্বারা দাসপ্রথা অবসানের কোনো দৃষ্টান্ত নেই), অপরপক্ষে মধ্যযুগের ভূমিদাসেরা ধাপে ধাপে সত্যিই শ্রেণীগতভাবে মুক্তিলাভ করেছে – তবে এই জিনিসটার কারণ তাদের বর্বরতা ছাড়া আর কী যার কল্যাণে তাদের মধ্যে তখনও পূর্ণমাত্রায় দাসপ্রথা দেখা দেয়নি, প্রাচীনযুগের শ্রম দাসত্বও নয় অথবা প্রাচ্যের গার্হস্থ্য দাসত্বও নয় ?

জার্মানরা রোমক জগতে প্রাণবান ও সঞ্জীবনী যা কিছুর সঞ্চার করল, তা হলো এই বর্বরতা। বস্তুত, মুমূর্ষ এক সভ্যতার মৃত্যু যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট এক জগতে নবজীবন সঞ্চার করবার ক্ষমতা ধরে কেবল বর্বররাই। এবং জাতিসমূহের দেশান্তর যাত্রার প্রাক্কালে জার্মানরা বর্বরতার যে উচ্চতন স্তরে উঠেছিল, ঠিক সেই স্তরটাই হলো এ প্রক্রিয়ার পক্ষে সর্বাধিক অনুকূল। এতেই সবকিছুর ব্যাখ্যা হয়।

৯
বর্বরতা ও সভ্যতা

আমরা তিনটি বড় বড় পৃথক দৃষ্টান্ত নিয়ে গোত্র-প্রথার ধ্বংসের প্রণালী দেখেছি : গ্রীক, রোমক এবং জার্মান। কোন কোন সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা বর্বরতার উচ্চতন স্তরেই সমাজের গোত্র-সংগঠনকে দুর্বল করে দেয় এবং সভ্যতার আর্বিভাবের সঙ্গে একেবারে এর বিলোপ ঘটায় সেটা উপসংহারে আমরা সন্ধান করে দেখব। এর জন্য মর্গানের রচনায় মতো মার্কসের 'পুজি'ও দরকার।

বন্য অবস্থার মধ্যবর্তী স্তর থেকে উচ্চতন স্তরে আরো বিকশিত হয়ে গোত্র-প্রথা, যতদূর আমরা প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে বিচার করতে পারি, বর্বরতার নিম্নতন স্তরে পরিণতির শীর্ষে উঠে। তাই এই স্তর থেকেই আমরা অনুসন্ধান শুরু করব।

এই স্তরের জন্য আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের আমাদের দৃষ্টান্ত ধরতে হবে, – এই স্তরে গোত্র-প্রথার পূর্ণ পরিণতি হয়েছিল। একটি উপজাতি কয়েকটি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুটি গোত্রে বিভক্ত হতো; জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এই মূল গোত্রগুলি আবার কয়েকটি সন্তান-গোত্রে বিভক্ত হতো যাদের সঙ্গে মাতৃ-গোত্রের সম্পর্ক দেখাত ফ্রাত্রীর মতো; উপজাতিও বিভক্ত হয়ে কয়েকটি উপজাতি হতো যাদের প্রত্যেকের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফের পুরানো গোত্রগুলিকে দেখা যেত। অন্ততঃ কোনো কোনো ক্ষেত্রে আত্মীয় উপজাতিগুলি মিলিত হয়ে সমামেল গঠন করত। এই সরল সংগঠন যে সামাজিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত, ঠিক তার উপযোগী ছিল। এটা একটা বিশেষ ধরণের স্বাভাবিক জোটবন্ধনের বেশি কিছু নয়, যা এইভাবে সংগঠিত সমাজে যেসব আভ্যন্তরীণ বিরোধ হতে পারে তার সমাধান করতে সমর্থ। বাইরের ক্ষেত্রে বিরোধের নিষ্পত্তি হতো যুদ্ধ করে, যার পরিণতিতে একটি উপজাতির ধ্বংস হতে পারে কিন্তু বশ্যতা কদাচ নয়। গোত্র-ব্যবস্থার মহিমা এবং সেইসঙ্গে তার সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে, এতে শাসক ও শাসিত কারো স্থান ছিল না। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে তখনও কোনো পার্থক্য ছিল না; সামাজিক ব্যাপারে অংশগ্রহণ, রক্তের বদলা অথবা ক্ষতিপূরণ অধিকার নাকি কর্তব্য, ইন্ডিয়ানদের কাছে এ প্রশ্ন কখনো ছিল না; আহার, নিদ্রা বা শিকার করা অধিকার না কর্তব্য ঠিক এই প্রশ্নের মতো সেটা তাদের কাছে অবাস্তব মনে হতো। তেমনি কোনো উপজাতি অথবা গোত্র বিভিন্নশ্রেণীতেও বিভক্ত হতে পারত না। এখান থেকে আমরা এই অবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রশ্নে গিয়ে পৌঁছাই।

জনসংখ্যা ছিল অত্যন্ত বিরল, উপজাতির বসতি অঞ্চলেই কেবল তার সংখ্যা বেশি ছিল, তার চারদিকে থাকত শিকারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং তারপরে আরও নিরপেক্ষ

অরণ্যের রক্ষাবেষ্টনী যা দিয়ে অন্যান্য উপজাতি থেকে তাদের পৃথক রাখা হতো। শ্রমবিভাগ ছিল নিতান্তই প্রাকৃতিক চরিত্রের। এটি ছিল কেবলমাত্র নারীপুরুষের শ্রমবিভাগ। পুরুষমানুষ যুদ্ধে যেত, শিকার করত, মাছ ধরত, খাদ্য যোগাড় করত এবং এইসব আহরণের উপযোগী হাতিয়ার জোগাত। মেয়েরা গৃহস্থালী দেখত এবং খাদ্য ও বস্ত্র তৈরি করত; তারা রাঁধত, কাপড় বুনত এবং সেলাই করত। নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই কর্তা – পুরুষেরা জঙ্গলে, মেয়েরা ঘরে। পুরুষ বা স্ত্রী যে যা হাতিয়ার তৈরি ও ব্যবহার করত সে তার মালিক ছিল : পুরুষদের মালিকানায় ছিল অস্ত্রশস্ত্র এবং শিকার ও মাছ ধরার হাতিয়ারগুলি, স্ত্রীলোকদের মালিকানায় ছিল ঘরের জিনিসপত্র ও তৈজসপত্র। গৃহস্থালী ছিল সাম্যভিত্তিক, একই গৃহে কয়েকটি এবং প্রায়ই বহু পরিবার থাকত।[৬৫] যা কিছু সমবেতভাবে উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হতো তাই ছিল সাধারণ সম্পত্তি : বাড়ি, বাগান, নৌকো। এখানে এবং কেবলমাত্র এখানেই আমরা সেই 'নিজের শ্রমে অর্জিত সম্পত্তি' দেখতে পাই যাকে আইনজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদরা মিথ্যা করে সভ্য সমাজের উপর চাপিয়েছেন – আইনগত এই শেষ মিথ্যা অজুহাতের উপরই আধুনিক পুঁজিবাদী মালিকানা দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু মানুষ সর্বত্রই এই স্তরে থেমে থাকেনি। এশিয়ায় সে এমন পশুর খোঁজ পেল যাদের পোষ-মানানো যায় এবং বন্দী অবস্থায় যাদের প্রজনন করা যায়। বন্য স্ত্রী-মহিষকে শিকার করতে হয়, পোষা পশু বছরে একটি করে বাচ্চা দেয় এবং তার উপর দুধ দেয়। সবচেয়ে অগ্রগামী কয়েকটি উপজাতি – আর্যরা, সেমিটিকরা, সম্ভবত তুরানিরাও – বন্য পশু পোষ-মানানো এবং পরে গবাদি পশুর প্রজনন ও প্রতিপালন তাদের মূল পেশা করে তোলে। পশুপালক উপজাতিগুলি সাধারণ বর্বরদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে : এই হচ্ছে প্রথম বিরাটাকার সামাজিক শ্রমবিভাগ। এই পশুপালক উপজাতিগুলি বাকি বর্বরদের চেয়ে শুধু অধিক পরিমাণে খাদ্যই উৎপাদন করত না, তারা বেশি বৈচিত্র্যের খাদ্য তৈরি করত। অপরদের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে তাদের শুধু দুধ, দুগ্ধজাত সামগ্রী এবং মাংসই ছিল না, পরন্তু ছিল চামড়া, পশম, ছাগলের লোম এবং ক্রমবর্ধমান কাঁচামালের ফলে অধিকতর পরিমাণে প্রচলিত তন্তুবস্ত্র। এটাই সর্বপ্রথম নিয়মিত বিনিময় সম্ভব করল। পূর্ববর্তী স্তরগুলিতে বিনিময় হতো কালেভদ্রে; অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি নির্মাণে অসাধারণ নিপুণতার জন্য সাময়িক শ্রমবিভাগ দেখা দিয়ে থাকতে পারে। এইভাবে নবপ্রস্তরযুগে পাথরের হাতিয়ারসমূহের কারখানার অবিসংবাদিত চিহ্নও বহু জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। এইসব কারখানায় যাদের নৈপুণ্য গড়ে ওঠে সেই কারিগরেরা খুব সম্ভবত সমগ্র জনসমাজের প্রতিপালনে কাজ করত, যেমন আজ পর্যন্ত গোত্রভিত্তিক ভারতীয় গোষ্ঠীগুলির স্থায়ী কারিগরেরা এখনও করে থাকে। সে যাই হোক, ঐ স্তরে উপজাতির মধ্যেই আভ্যন্তরীণ বিনিময় এবং স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর উত্তরোত্তর বিকাশ ও সংহতির অনুকূল অবস্থা দেখা দেয়। সূচনায়

৬৫. বিশেষ করে আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে– ব্যানক্রফট দ্রষ্টব্য। কুইন শার্লট দ্বীপের হাইদাদের মধ্যে কোনো কোনো চালার নিচে সাতশজন পর্যন্ত লোক জুটত। নুটকাদের মধ্যে গোটা উপজাতিই থাকত একই চালার নিচে। (এঙ্গেলসের টীকা)

নিজের নিজের গোত্র-প্রধানদের মারফত একটি উপজাতি অপর একটির সঙ্গে বিনিময় চালাত। কিন্তু যখন পশুযূথগুলি স্বতন্ত্র সম্পত্তিতে পরিণত হতে লাগল, তখন থেকে ব্যক্তিদের মধ্যে বিনিময় ক্রমশ : বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এটাই হয়ে উঠল একমাত্র ধরন। পশুপালক জাতিগুলি বিনিময়ের জন্য প্রতিবেশির কাছে যে প্রধান জিনিসটি আনতো, সেটি হচ্ছে গবাদি পশু; গবাদি পশু হয়ে উঠল এমন একটি পণ্য যা দিয়ে অপর সব পণ্যের মূল্য মাপা হতো এবং সর্বত্র এর বিনিময় সহজেই অপরাপর পণ্য পাওয়া যেত – সংক্ষেপে, গবাদি পশু মুদ্রার কাজ করতে শুরু করল এবং সেই স্তর থেকেই মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হলো। পণ্য-বিনিময়ের একেবারে সূচনাতেই মুদ্রা পণ্যের চাহিদা বাড়তে থাকল এই প্রয়োজনীয়তায় এবং এই দ্রুততায়।

সম্ভবত নিম্নতন স্তরে এশিয়াবাসী বর্বরদের মধ্যে বাগিচার চাষ, অজানা ছিল, এটি তাদের মধ্যে অন্তত বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তরে ক্ষেত্রকর্ষণের পুরোগামী হিসাবে দেখা দেয়। তুরানের মালভূমির জলবায়ুতে পশুপালন সম্ভব হতো না যদি না দীর্ঘস্থায়ী কঠোর শীতকালের জন্য পশুখাদ্যের যথেষ্ট যোগান থাকত। এইজন্যই মাঠ চাষ ও খাদ্যশস্য চাষ এখানে অপরিহার্য ছিল। কৃষ্ণসাগরের উত্তরদিকের তৃণভূমি সম্পর্কেও এই একই কথা খাটে। শস্য দানা পশুর জন্য উৎপাদন হবার পরে শীঘ্রই মানুষের খাদ্য হয়ে ওঠে। চাষের জমি তখনও উপজাতির সম্পত্তি ছিল এবং প্রথমে তা বরাদ্দ হয় গোত্রের জন্য, পরে গৃহস্থালী গোষ্ঠীগুলির ব্যবহারের জন্য এবং সর্বশেষে আলাদা আলাদা ব্যক্তিদের জন্য; এদের কিছু কিছু দখলীস্বত্ব থেকে থাকতে পারে কিন্তু তার বেশি নয়।

শিল্পের ক্ষেত্রে এই স্তরের দুটি কৃতিত্ব হচ্ছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি হচ্ছে বুনবার তাঁত, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ধাতু আকরিকের গালাই ও ধাতু কর্ম। তামা, টিন এবং তাদের সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাতু; ব্রোঞ্জ দিয়ে প্রয়োজনীয় হাতিয়ারপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র হতো, কিন্তু এটি তখনও পাথরের উপকরণকে হটিয়ে দিতে পারেনি। কেবল লোহাই এই কাজটি করতে পারত, কিন্তু তখনও লোহার উৎপাদন অজ্ঞাত ছিল। সোনা ও রুপা অলঙ্কার ও সাজসজ্জা হিসাবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল এবং ইতিমধ্যে মনে হয় এদের মূল্য তামা ও ব্রোঞ্জ থেকে অনেক বেশি ছিল।

পশুপালন, কৃষি, গার্হস্থ্য শিল্প – সমস্ত শাখায় উৎপাদনের বৃদ্ধিতে মানুষের শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি জিনিস উৎপন্ন করা সম্ভব হলো। ঐ একই সময়ে এতে গোত্র অথবা গৃহস্থালী গোষ্ঠী অথবা একক পরিবারের সমস্ত সদস্যের দৈনিক কাজের পরিমাণ বাড়ল। আরও শ্রমশক্তির জোগান বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ল। এটি জোগাল যুদ্ধ; যুদ্ধ-বন্দীদের দাস করা হলো। ঐ বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় প্রথম বৃহৎ সামাজিক শ্রমবিভাগ শ্রমের উৎপাদিকা বাড়িয়ে শ্রমবিভাগ উৎপাদনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে তার পিছু পিছু অনিবার্যভাবেই দাসপ্রথাকে টেনে আনল। প্রথম বৃহৎ সামাজিক থেকে এল দুটি শ্রেণীতে প্রথম বৃহৎ সামাজিক বিভাগ – মালিক ও ক্রীতদাস, শোষক ও শোষিত।

কী করে এবং কবে যে পশুযূথগুলি উপজাতি বা গোত্রের যৌথ সম্পত্তি থেকে বিভিন্ন পরিবারের প্রধানদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হলো তা আজও আমরা জানি

না। কিন্তু প্রধানতঃ এই ঘটনা এই স্তরেই ঘটে থাকবে। পশুযূথ ও অন্যান্য নতুন নতুন ধনসামগ্রী পরিবারের ভিতর একটি বিপ্লব আনল। জীবিকা অর্জন সবসময়েই ছিল পুরুষের কাজ; সেইজন্য সে জীবিকার উপকরণগুলি তৈরি করত ও দখল রাখত। পশুযূথগুলি এখন হয়ে উঠল জীবিকার নতুন উপায় এবং গোড়ায় তাদের পোষমানানো ও পরে প্রতিপালন হলো তার কাজ। এইজন্য গবাদি পশু এবং তাদের বিনিময়ে যেসব পণ্য ও ক্রীতদাস পাওয়া যেত সেইসবের মালিক হলো পুরুষ। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমস্ত উদ্বৃত্তই পুরুষের ভাগে গেল; স্ত্রীলোকেরা ছিল শুধুমাত্র তার ভোগের অংশীদার, কিন্তু মালিকানার অংশীদার আর নয়। 'বন্য', যোদ্ধা ও শিকারী ঘরের মধ্যে গৌণ ভূমিকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত এবং স্ত্রীলোকের প্রাধান্য মানত। 'অপেক্ষাকৃত নম্র' পশুপালক তার সম্পত্তির জোরে প্রথম স্থান দখল করল এবং স্ত্রীলোককে গৌণ ভূমিকা নিতে বাধ্য করল। এবং এতে স্ত্রীলোকের অভিযোগ করার কিছু ছিল না। পরিবারের মধ্যে শ্রমবিভাগই পুরুষ ও নারীর মধ্যে সম্পত্তির বণ্টন নিয়ন্ত্রিত করত। এই শ্রমবিভাগ পরিবর্তিত হলো না, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন এতে আগেকার পারিবারিক সম্পর্কের ওলটপালট হলো শুধু এইজন্য যে, পরিবারের বাইরে শ্রমবিভাগের ধরন বদলে গিয়েছিল। ঠিক যে কারণে আগেকার দিনে স্ত্রীলোক সংসারের মধ্যে সর্বেসর্বা হয়েছিল, অর্থাৎ তাকে ঘরের কাজ করতে হতো বলে, এখন ঠিক সেই কারণেই সংসারের মধ্যে পুরুষের আধিপত্য সুনিশ্চিত হলো; স্ত্রীলোকের ঘরের কাজ জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে পুরুষের কাজের তুলনায় তাৎপর্য হারাল; এই দ্বিতীয় কাজটিই ছিল সব, প্রথমটার অবদান ছিল তুচ্ছ। এখানেই আমরা দেখতে পাই যে, স্ত্রীলোকের মুক্তি এবং পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার হচ্ছে অসম্ভব এবং ততদিন অসম্ভব থাকবে যতদিন স্ত্রীলোক সামাজিক উৎপাদনের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে গৃহস্থালীর ব্যক্তিগত কাজে। নারীর মুক্তি তখনই সম্ভব যখন সে বৃহদাকারে, সামাজিক আকারে উৎপাদনে অংশ নিতে পারছে এবং যখন গৃহস্থালী কাজের প্রয়োজন হচ্ছে গৌণ মাত্রায়। এবং কেবল আধুনিক বৃহৎ শিল্পের ফলেই এই জিনিসটি সম্ভব হয়েছে, এতে বিপুল সংখ্যায় নারীর পক্ষে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করা চলে শুধু তাই নয়, আসলে সেইটাই আবশ্যক হয়ে পড়ে এবং উপরন্তু গৃহস্থালীর ব্যক্তিগত কাজকেও একটা সামাজিক শিল্পে পরিণত করার উত্তরোত্তর চেষ্টা হয়।

সংসারের মধ্যে বাস্তব আধিপত্য লাভই পুরুষের স্বৈরাচারের শেষ প্রতিবন্ধক দূর করে। মাতৃ-অধিকারের পরাজয়, পিতৃ-অধিকারের প্রবর্তন এবং জোড়বাঁধা পরিবার থেকে একপতিপত্নীত্বে ক্রমপরিণতির ফলে এই স্বৈরাচার সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী হয়। এতে প্রাচীন গোত্র-ব্যবস্থায় ভাঙন ধরল : একক পরিবার পরিণত হলো একটা শক্তিতে এবং গোত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াল শত্রুর মতো।

পরের ধাপে আমরা বর্বরতার উচ্চতন স্তরে এসে পৌঁছাই, যে পর্বে সমস্ত সভ্য জাতি তাদের বীর-যুগের মধ্যে দিয়ে যায় : এটি লোহার তরবারির যুগ, সেই সঙ্গে লোহার লাঙ্গল ও কুঠারেরও যুগ। লোহা হলো মানুষের ভৃত্য, ইতিহাসে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে এমন সমস্ত কাঁচামালের মধ্যে এটি হচ্ছে সর্বশেষ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ

কাঁচামাল, সর্বশেষ, যদি আলুর কথা বাদ দিই। লোহা বৃহত্তর আকারে ক্ষেতচাষ এবং কর্ষণের জন্য বৃহৎ বনভূমি সাফ করা সম্ভব করল; কারিগরের হাতে লোহা এমন শক্ত ও ধারাল একটি হাতিয়ার তুলে দিল যার কাছে কোনো পাথর বা অন্য কোনো পরিচিত ধাতুই হার মানত। এসব ঘটে ক্রমে ক্রমে, প্রথম প্রস্তুত লোহা প্রায়ই ছিল ব্রোঞ্জের চেয়েও নরম। এইভাবে পাথরের হাতিয়ার লোপ পেল কিন্তু আস্তে আস্তে; 'হিল্ডেব্রান্ড সঙ্গীতেই' শুধু নয়, ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংসের যুদ্ধেও[৬৬] পাথরের কুঠার ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রগতি এবার হলো অপ্রতিরোধ্য, কম ব্যাহত এবং অধিক দ্রুত। মিনার ও পাথরের দেওয়ালের বেষ্টনীর মধ্যে পাথর অথবা ইটের বাড়ি সমেত নগরই হয়ে উঠল উপজাতি বা উপজাতিসমূহের সমামেলের কেন্দ্রীয় পীঠ। এতে গৃহ-নির্মাণকলার দ্রুত উন্নতি সূচিত হলো; কিন্তু সেই সঙ্গে বিপদবৃদ্ধি ও আত্মরক্ষার আবশ্যকতারও লক্ষণ সেটা। ধনসম্পত্তির দ্রুত বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সে হলো স্বতন্ত্র ব্যক্তির ধনসম্পত্তি। বয়ন, ধাতুর কাজ অন্যান্য যেসব কারুশিল্প এখন ক্রমেই বেশি করে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল তাদের উৎপাদনে বেশি বৈচিত্র্য ও শিল্পসূক্ষ্মতা দেখা গেল; কৃষি থেকে এখন শুধু খাদ্যশস্য, ডাল ও ফল নয়, তেল ও মদও মিলছিল, তার উৎপাদন পদ্ধতি জানা হয়ে গিয়েছিল। এত বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম একই ব্যক্তির দ্বারা চালানো আর সম্ভব ছিল না; দ্বিতীয় বিরাট শ্রমবিভাগ দেখা দিল; কুটিরশিল্প কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন হলো। উৎপাদনের অবিরাম প্রসার এবং তার সঙ্গে শ্রমের অধিকতর উৎপাদনশীলতার ফলে মানুষের শ্রমশক্তির মূল্য বাড়ল। পূর্ববর্তী স্তরে যা ছিল একটা সদ্যোজাত ও আপতিক ব্যাপার, সেই দাসপ্রথা এখন সামাজিক ব্যবস্থার একটি মূল অঙ্গ হয়ে উঠল। দাসরা এখন আর মাত্র সাহায্যকারী থাকল না, পরন্তু তাদের দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে ক্ষেতে ও কারখানায় কাজ করানো হতে থাকল। উৎপাদনকে দুটি প্রধান শাখায়, কৃষি ও হস্তশিল্পে ভাগ করার ফলে বিনিময়ের জন্যই উৎপাদন, পণ্যের উৎপাদন শুরু হলো; এবং এর সঙ্গে এল বাণিজ্য, শুধু উপজাতির অভ্যন্তরে এবং তার সীমানা বরাবর নয়, পরন্তু সমুদ্রপারেও। এইসবই তখনো খুব অপরিণত ছিল; সর্বজনীন মুদ্রা-পণ্য হিসাবে মূল্যবান ধাতুগুলির সমাদর হলো, কিন্তু তখনও মুদ্রা তৈরি হয়নি এবং বিনিময় হতো কেবল ওজন দেখে।

এখন স্বাধীন মানুষ ও দাসের মধ্যে বৈষম্যের সঙ্গে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য যোগ হলো – নতুন শ্রমবিভাগের সঙ্গে এল বিভিন্নশ্রেণীতে সমাজের নতুন বিভাগ। বিভিন্ন পরিবারের প্রধানদের ধনসম্পদে অসাম্যের ফলে তখনও যে পুরানো সাম্যতান্ত্রিক গৃহস্থালী গোষ্ঠীগুলি টিকে ছিল তারা ভেঙে পড়ল; এবং এতে গোষ্ঠীর জন্য জমির যৌথ চাষ বন্ধ হয়ে গেল। কর্ষিত জমি বিভিন্ন পরিবারে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট হলো, প্রথমে সাময়িকভাবে এবং পরে চিরস্থায়ীভাবে; পরিপূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানায় উত্তরণ ঘটে ক্রমে ক্রমে এবং জোড়বাঁধা পরিবার থেকে একপতিপত্নীত্বে উত্তরণের সমান্তরালে। এক একটি পরিবারই সমাজের অর্থনৈতিক একক হয়ে উঠতে লাগল।

---

৬৬. ১০৬৬ সালে হেস্টিংসে লড়াই হয় ইংল্যান্ড অভিযানী নর্ম্যান্ডির ডিউক উইলিয়মের সৈন্যদের সঙ্গে অ্যাঙলোস্যাক্সন সৈন্যেরা। এদের সৈন্য সংগঠনের মধ্যে গোষ্ঠী ব্যবস্থার জের বর্তমান ছিল এবং অস্ত্রশস্ত্র ছিল আদিম ধরনের; পরাজিত হয় এরা। ইংরেজদের রাজা হ্যারল্ড যুদ্ধে নিহত হন, এবং বিজয়ী উইলিয়ম, প্রথম এই নামে উইলিয়ম ইংল্যান্ডের রাজা হন। –সম্পাঃ

জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়ার জন্য ভিতরে ও বাইরে নিবিড়তর ঐক্যের প্রয়োজন হলো। সর্বত্রই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল আত্মীয় উপজাতিগুলির সমামেল এবং তার কিছু পরেই তাদের মিশ্রণ আর তাতে করে একটি জনসম্প্রদায়ের একক ভূখণ্ডে বিভিন্ন উপজাতির পৃথক পৃথক ভূখণ্ডের মিলন। জনগণের সামরিক নেতা – rex, basileus, thiudans হলেন এক প্রয়োজনীয় ও স্থায়ী পদাধিকারী। জনগণের সভা যেখানে ছিল না সেখানে তা প্রতিষ্ঠিত হলো। সামরিক নেতা, পরিষদ এবং জনসভা – এরাই হলো গোত্র-প্রথা থেকে বিকশিত সামরিক গণতন্ত্রের সংস্থা। সামরিক গণতন্ত্র এইজন্য যে, এখন জনগণের জীবনে যুদ্ধ ও যুদ্ধের সংগঠন নিয়মিত ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। প্রতিবেশীর ধনসম্পত্তি দেখে অপরাপর জনসম্প্রদায়ের লোভ হতো, এরা ধন সংগ্রহকেই জীবনের অন্যতম মূল লক্ষ্য বলে ভাবতে শুরু করল। এরা ছিল বর্বর : উৎপাদনমূলক কাজকর্মের চেয়ে লুণ্ঠনই এদের কাছে সহজ, এমনকি অধিকতর সম্মানজনক মনে হলো। একদা যুদ্ধ করা হতো শুধু আক্রমণের প্রতিশোধে অথবা নিজেদের ভূখণ্ড ছোট হলে তাকে বাড়াবার জন্য; এখন শুধু লুঠের জন্য যুদ্ধ চালানো হলো এবং এটি একটি নিয়মিত পেশা হয়ে উঠল। নতুন সংরক্ষিত নগরের চারপাশে দুর্ভেদ্য দেওয়াল অকারণে তোলানো হয়নি : তাদের প্রসারিত পরিখাগুলি হলো গোত্র-প্রথার কবর এবং তাদের মিনারগুলি ইতিমধ্যেই সভ্যতা স্পর্শ করেছিল। সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও অনুরূপ পরিবর্তন হলো। লুণ্ঠনমূলক যুদ্ধগুলি সর্বপ্রধান সামরিক অধিনায়ক ও উপনায়কদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলল। একই পরিবার থেকে পদাধিকারী নির্বাচনের প্রথা ক্রমে ক্রমে, বিশেষত পিতৃ-অধিকার প্রতিষ্ঠার পরে, উত্তরাধিকারে পরিণত হলো, প্রথমে এটিকে সহ্য করা হতো, পরে এটি দাবি হয়ে উঠল এবং সর্বশেষে জোর করে দখল করা হলো; বংশানুক্রমিক রাজত্ব ও আভিজাত্যের ভিত্তি স্থাপিত হলো। এইভাবে গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির মধ্যে জনগণের মধ্যে তাদের যে শিকড় ছিল সেখান থেকে গোত্র-প্রথার বিভিন্ন সংস্থার মূলোচ্ছেদ করা হলো এবং সমগ্র গোত্র-প্রথা পরিণত হলো তার বিপরীতে : উপজাতিগুলির নিজেদের কাজকর্ম স্বাধীনভাবে পরিচালনার সংগঠন থেকে এটি হয়ে উঠল প্রতিবেশীদের লুণ্ঠন ও পীড়নের সংগঠন; এবং সেই সঙ্গে এর বিভিন্ন সংস্থাগুলি জনগণের অভিপ্রায়ের হাতিয়ার থেকে হয়ে উঠল স্বীয় জনগণের উপরেই শাসন ও পীড়নের স্বতন্ত্র সংস্থা। এটি হতে পারত না যদি ধন-লালসা গোত্রের সভ্যদের ধনী ও দরিদ্রে বিভক্ত না করত; যদি 'গোত্রের মধ্যে সম্পত্তিভেদের ফলে গোত্র-সভ্যদের স্বার্থের ঐক্য না পরিণত হতো তার বিরোধ' (মার্কস) এবং যদি না দাসপ্রথার বিকাশ ইতিমধ্যেই জীবিকার জন্য পরিশ্রম করাকে দাসোচিত এবং লুণ্ঠনের চেয়ে অনেক বেশি অসম্মানজনক বলে চিহ্নিত না করত।

* * *

এখন আমরা সভ্যতার দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছি। শ্রমবিভাগের আরও উন্নতি দিয়ে এই পর্বের সূচনা হয়। নিম্নতন স্তরে মানুষ নিজের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন পূরণের জন্য উৎপাদন করত; বিনিময় সীমাবদ্ধ ছিল সেইসব আপতিক ক্ষেত্রে যেখানে আকস্মিকভাবে কোনো কিছু উদ্বৃত্ত হতো। বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তরে পশুপালক জাতিগুলির মধ্যে আমরা

দেখি যে, গবাদি পশুগুলির মধ্যে এমন একধরনের সম্পত্তি পাওয়া গেছে যাতে পশুযূথ যথেষ্ট বড় হলে নিয়মিতভাবে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ হয়ে উদ্বৃত্ত থাকে; পশুপালক জাতিগুলি এবং পশুসম্পদহীন অনুন্নত উপজাতিগুলির মধ্যে একটি শ্রমবিভাগও আমরা দেখি; এতে পাশাপাশি দুটি বিভিন্ন স্তরের উৎপাদন চলে এবং তাই নিয়মিত বিনিময়ের মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়। বর্বরতার উচ্চতন স্তরে আরও একটি শ্রমবিভাগ এল, কৃষি ও হস্তশিল্পের শ্রমবিভাগ এবং এর ফলে ক্রমাগত বর্ধমান পরিমাণে পণ্য উৎপন্ন হতে থাকল বিশেষ করে বিনিময়ের জন্য এবং এতে করে বিভিন্ন উৎপাদকের মধ্যে বিনিময় এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাল যাতে এটি হয়ে দাঁড়াল সমাজজীবনের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। সভ্যতা এইসব পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শ্রমবিভাগকে শক্তিশালী করল ও তাকে বাড়িয়ে তুলল, বিশেষতঃ গ্রাম ও নগরের বৈপরিত্য বাড়িয়ে (হয় নগর গ্রামের উপর অর্থনৈতিক আধিপত্য খাটাত, যেমন প্রাচীন যুগে, অথবা গ্রাম নগরের উপর আধিপত্য করত, যেমন মধ্যযুগে) এবং তৃতীয় একটি শ্রমবিভাগ যোগ করল, যেটি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ : সভ্যতা এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করল যারা উৎপাদনে কোনও অংশ নিত না, শুধু পণ্যের বিনিময়ে ব্যাপৃত থাকত – বণিকশ্রেণী। পূর্বে শ্রেণী সৃষ্টির সমস্ত প্রবণতা একান্তই উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। উৎপাদনে নিযুক্ত লোকেরা এতে পরিচালক ও কর্মীতে অথবা বৃহৎ হারে উৎপাদক ও ছোট হারে উৎপাদকে বিভক্ত হয়। এই প্রথম এমন একটি শ্রেণী দেখা দিল যারা উৎপাদনে কোন অংশ না নিয়েও গোটা উৎপাদন পরিচালনার ভার দখল করল এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমস্ত উৎপাদকদের স্বীয় শাসনের অধীনে আনল; এই শ্রেণী দুই দল উৎপাদকদের প্রত্যেকের পক্ষে অপরিহার্য মধ্যবর্তী হয়ে উঠল এবং উভয়কেই শোষণ করতে থাকল। বিনিময় করবার কষ্ট ঝুঁকি থেকে উৎপাদকদের বাঁচাবার, তাদের পণ্যের দূর দূরান্তের বাজার খুঁজে দেবার এবং এইভাবে সমাজের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শ্রেণী হয়ে ওঠার অজুহাতে দেখা দিল পরগাছাদের এক শ্রেণী, খাঁটি সামাজিক পরাশ্রিত এক শ্রেণী যারা নিজেদের আসলে অতি তুচ্ছ কাজের পুরস্কার হিসাবে দেশের ও বিদেশের উৎপাদনের সার অংশটুকু দখল করত; দ্রুত জমিয়ে তুলত প্রভূত ধনসম্পত্তি এবং সেই অনুপাতে সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি; এবং শুধু এই কারণেই সভ্যতার যুগে তাদের ভাগ্যে নতুন নতুন সম্মান এবং উৎপাদনের উপর ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি দেখা দিতে বাধ্য, যতদিন না পর্যন্ত তারা নিজেরাই অবশেষে গড়ছে তাদের এক স্বকীয় সৃষ্টি – পর্যায়িক বাণিজ্য সংকট।

বিকাশের যে স্তরের কথা আমরা আলোচনা করছি, তখন তরুণ বণিকশ্রেণীর ধারণাও ছিল না ভবিষ্যতে কী বৃহৎ ব্যাপার আছে তাদের ভাগ্যে। কিন্তু এই শ্রেণী অবয়ব নিল, নিজেদের অপরিহার্য করে তুলল এবং এইটাই যথেষ্ট। তারই সঙ্গে কিন্তু ধাতুর মুদ্রা, টাঁকশালে তৈরি মুদ্রার প্রচলন হলো এবং এর ফলে যারা উৎপাদন করে না, তাদের হাতে এমন একটি হাতিয়ার এল যার সাহায্যে তারা উৎপাদক এবং তার উৎপাদনের উপর আধিপত্য করতে পারল। সমস্ত পণ্যের সেরা পণ্য, যার মধ্যে অন্য সব পণ্যই লুকানো আছে, তার আবিষ্কার হলো; আবিষ্কৃত হলো সেই যাদু যা ইচ্ছা মাত্র বাঞ্ছনীয় বা বাঞ্ছিত যেকোনো বস্তুতেই পরিণত হতে পারে। যার হাতে এই জিনিস আছে, সেই

উৎপাদনের জগতে আধিপত্য করে, এবং কার হাতে এই অর্থ সবচেয়ে বেশি? বণিকের। তার হাতেই মুদ্রা-পূজা নিরাপদ। সে এইটি বেশ করে বুঝিয়ে দিতে চাইল যে, সমস্ত পণ্য এবং সুতরাং সকল পণ্য-উৎপাদক অর্থের সামনে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে বাধ্য। সে কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করল যে, অন্য সবরকমের ধনসম্পদ হচ্ছে সম্পদের এই মূর্তিমান রূপের কাছে ছায়া মাত্র। অর্থের ক্ষমতা তার এই প্রথম যৌবনে যতখানি স্থূল ও হিংস্রভাবে প্রকট হয়, তেমন আর কখনও হয়নি। অর্থের বিনিময়ে পণ্যবিক্রয়ের পরে এল আর্থিক ঋণ দেওয়া এবং তার আনুষঙ্গিক সুদ ও মহাজনি। এবং আর কোথাও পরবর্তীকালের আইনবিধি দেনাদারকে সুদখোর মহাজনের পায়ের তলায় এত নির্মম ও অসহায়ভাবে ফেলে দেয়নি যেমন প্রাচীন এথেন্স ও রোমে দিয়েছিল – এই দু-জায়গায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধারণ আইন হিসাবেই এই বিধান দেখা দেয় এবং তার পিছনে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা ছাড়া আর কোনো চাপ ছিল না।

পণ্য ও ক্রীতদাসের সম্পদ ছাড়াও, মুদ্রা সম্পদ ছাড়াও জমিরূপী সম্পদ দেখা দিল। যে খণ্ড খণ্ড জমি গোত্র বা উপজাতি আদিতে বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ করেছিল, সেগুলির উপর ব্যক্তির স্বত্ব এত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, এই খণ্ড খণ্ড জমি হলো তাদের বংশগত সম্পত্তি। ঠিক এই সময়টির আগে মানুষ সবচেয়ে বেশি যা চেষ্টা করে এসেছে তা হচ্ছে তাদের এই খণ্ড খণ্ড জমিগুলির উপর গোত্র-গোষ্ঠীর দাবি থেকে মুক্তি, যে দাবিটি তাদের একটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা এই বন্ধন থেকে মুক্তি পেল, কিন্তু তার অল্পকাল পরে তাদের নতুন সম্পত্তি থেকেও মুক্তি পেল। জমির উপর পূর্ণ ও স্বাধীন মালিকানা মানে শুধুই অবাধ ও অবিচ্ছিন্ন ভোগদখলের নয়, পরন্তু ঐ জমি হস্তান্তরের সম্ভাবনাও থাকছে। যতদিন জমি গোত্রের সম্পত্তি ছিল, ততদিন এ সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু যখন জমির নতুন মালিক গোত্র ও উপজাতির সার্বভৌম স্বত্বের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলল, তখনই যে বন্ধন তাকে অচ্ছেদ্যভাবে জমির সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল তাও ছিঁড়ে গেল। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থেরও যুগপৎ আবিষ্কার হয়েছিল, সেই অর্থই এই জিনিসের তাৎপর্য স্পষ্ট করে দিল। জমি এখন একটি পণ্য হয়ে উঠতে পারল যা বিক্রয় করা ও বন্ধক দেওয়া চলে। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা দিতে না দিতে বন্ধক দেওয়া আবিষ্কার হয় (এথেন্সের দৃষ্টান্ত দেখুন)। একপতিপত্নীত্বের পিছু পিছু যেমন হেটায়ারিজম ও ব্যভিচারবৃত্তি এসেছে, তেমনি জমির মালিকানার সঙ্গে এখন থেকে বন্ধকী প্রথা সেঁটে বসল। জমির স্বাধীন, পূর্ণ ও হস্তান্তরযোগ্য মালিকানার জন্য চিৎকার করেছিলে তাই পেলে – 'তুমি এই চেয়েছিলে জর্জেস্ ডান্ডিন্'![৬৭]

বাণিজ্যের প্রসার, অর্থ, আর্থিক তেজারতি প্রথা, ভূসম্পত্তি এবং বন্ধকী প্রথার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে চলল মুষ্টিমেয় একটি শ্রেণীর হাতে ধনসম্পত্তির দ্রুত সঞ্চয় ও কেন্দ্রীকরণ এবং অপরদিকে এল জনগণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও ক্রমবর্ধমান সংখ্যার নিঃস্বতা। অর্থশালী এই নতুন অভিজাতরা যেখানে শুরু থেকেই উপজাতির পুরাতন অভিজাতদের সঙ্গে অভিন্ন ছিল না সেখানেই তারা এই শেষোক্তদের চিরকালের জন্য পেছনে হঠিয়ে

৬৭. এই উক্তিটি মলিয়ার রচিত 'জর্জেস্ ডান্ডিন্' কমেডি থেকে নেওয়া হয়েছে। –সম্পাঃ

দিয়েছে (এথেন্সে, রোমে, জার্মানদের মধ্যে)। এবং ধন অনুযায়ী স্বাধীন নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগের সঙ্গেই বিশেষতঃ গ্রীসে ক্রীতদাসের সংখ্যা[৬৮] বিরাটভাবে বাড়ল, এদেরই বাধ্যতামূলক পরিশ্রমের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছিল সমগ্র সমাজের উপরিকাঠামো।

এখন দেখা যাক এই সমাজবিপ্লবের ফলে গোত্র-প্রথায় কী হলো। এই প্রথার সাহায্য ছাড়াই যে নতুন উপাদানগুলি দেখা দিয়েছিল, তাদের সামনে এ প্রথা অক্ষম হয়ে পড়ে। এ প্রথা নির্ভর করত এই শর্তের উপর যে, গোত্র অথবা উপজাতির লোকেরা একই ভূখণ্ডে একত্র বসবাস করবে এবং তারাই হবে সেখানকার একমাত্র অধিবাসী। এই অবস্থা বহুকাল আগে চলে যায়। গোত্র উপজাতি সর্বত্রই একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছিল; স্বাধীন নাগরিকদের মধ্যে সর্বত্রই বাস করত ক্রীতদাস, পরাশ্রিত এবং বিদেশীরা। বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তরের একেবারে শেষ দিকেই যে স্থানভিত্তিক বসত গড়ে উঠেছিল বারবার তা ব্যাহত হয় গতিশীলতা বা বাসভূমির পরিবর্তনে, যা ঘটত ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা বদল ও জমি হস্তান্তরের কারণে। গোত্র-সংগঠনের লোকেরা নিজেদের সাধারণ ব্যাপারে আর একত্রে বসতেও পারত না; কেবল অপেক্ষাকৃত নগণ্য বিষয়গুলি যথা ধর্মোৎসব এখনও পালিত হতো, তাও যেমন তেমনভাবে। গোত্রের বিভিন্ন সংস্থা যে সব প্রয়োজন ও স্বার্থ দেখবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল এবং দেখবার যোগ্যও ছিল, এখন জীবিকা অর্জনের অবস্থায় বিপ্লব আসায় এবং তজ্জনিত সমাজের কাঠামোয় পরিবর্তন হওয়ায় নতুন সব প্রয়োজন ও স্বার্থ দেখা দিল। এইসব নতুন প্রয়োজন ও স্বার্থ পুরাতন গোত্র-প্রথার কাছে শুধু অজানাই নয়, পরন্তু এরা সর্বতোভাবে তার বিরোধী। শ্রমবিভাগের ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন দলের হস্তশিল্পীদের স্বার্থ এবং গ্রামের বিপরীতে নগরগুলির বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের জন্য নতুন নতুন সংস্থা দরকার হলো; কিন্তু এই প্রতিটি দলের মধ্যেই ছিল ভিন্ন ভিন্ন গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির লোক, এমনকি তাদের মধ্যে বিদেশীও থাকত। এইজন্য নতুন সংস্থাগুলি অপরিহার্যভাবে গড়ে ওঠে গোত্র-সংবিধানের বাইরেই, তার সঙ্গে সমান্তরালে, আবার এর বিরুদ্ধেও। অপরপক্ষে, একই গোত্র ও উপজাতির মধ্যে ধনী ও দরিদ্র, মহাজন ও দেনাদার থাকায় প্রত্যেকটি গোত্র-সংগঠনের মধ্যে এই স্বার্থের বিরোধ প্রকট হয় এবং চরমে ওঠে। এদিকে সেখানে এসেছিল নতুন বাসিন্দারা, যারা গোত্র-সংগঠনের বাইরের লোক এবং রোমের মতো ক্ষেত্রে তারা দেশের একটি বিশিষ্ট শক্তি হতে পারত, তাছাড়া সংখ্যায় তারা এত বেশি ছিল যে, রক্তসম্পর্কযুক্ত গোত্র ও উপজাতির মধ্যে তাদের ক্রমে ক্রমে মিশে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। এদের কাছে গোত্র-সংগঠনগুলি ছিল এক রুদ্ধদ্বার সুবিধাভোগী সংস্থা; সূচনায় যা ছিল স্বভাবসিদ্ধ গণতন্ত্র তাই এখন একটি ঘৃণিত আভিজাত্যে পরিণত হলো। সর্বশেষে, গোত্র-প্রথা এমন একটি সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যেখানে কোনো আভ্যন্তরীণ বিরোধ ছিল না, এবং এই প্রথা কেবলমাত্র এইরূপ সমাজেরই উপযোগী ছিল। [illegible]

---

৬৮. এথেন্সে ক্রীতদাসের সংখ্যা এই পুস্তকে ১১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। [illegible] ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল ৪,৬০,০০০ এর মতো, [illegible] নাগরিকদের সংখ্যার দশগুণ। (এঙ্গেলসের টীকা) [illegible] পুস্তকে ৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

ছাড়া এর আর কোনো জবরদস্তি শক্তি ছিল না। কিন্তু এখন এমন একটি সমাজ দেখা দিল যেখানে জীবনযাত্রার সমস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে সমাজদেহকে বিভক্ত হতে হলো স্বাধীন নাগরিক এবং ক্রীতদাসে, ধনী শোষক এবং শোষিত দরিদ্রে; এই সমাজ শুধু এই বিরোধগুলির সমাধানে অক্ষমই ছিল না, পরন্তু এগুলোকে বাড়াতে বাড়াতে চরম পর্যায়ে ঠেলে নিয়েও যাবে। এমন একটি সমাজ টিকে থাকতে পারে কেবল হয় এইসব শ্রেণীগুলির মধ্যে নিরন্তর প্রকাশ্য সংগ্রামের পরিস্থিতিতে অথবা তৃতীয় একটি শক্তির শাসনাধীনে, যে শক্তি ব্যাহতঃ পরস্পর সংগ্রামশীল শ্রেণীগুলির উর্ধ্বে থেকে তাদের প্রকাশ্য সংগ্রাম দমন করবে এবং বড়জোর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, তথাকথিত আইনসম্মত রূপে একটা শ্রেণী-সংগ্রাম চলতে দেবে। গোত্র-প্রথার উপযোগিতা ফুরিয়ে গিয়েছিল। শ্রমবিভাগ এবং তার পরিণাম – সমাজের শ্রেণী-বিভাগ একে ধ্বংস করল। এর জায়গায় এল রাষ্ট্র।

* * *

উপরে আমরা গোত্র-প্রথায় ধ্বংসস্তূপের উপরে যে তিনটি মূল ধরনের রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, পৃথকভাবে তার আলোচনা করেছি। এথেন্সেই সবচেয়ে বিশুদ্ধ, সবচেয়ে চিরায়ত রূপটি দেখা যায় : এখানে গোত্রভিত্তিক সমাজের মধ্যেই যে শ্রেণী-বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল তার থেকেই সরাসরিভাবে ও প্রধানতঃ রাষ্ট্রের উদ্ভব হলো। রোমে গোত্রভিত্তিক সমাজ হয়ে উঠল একটি রুদ্ধদ্বার আভিজাত্য, যার চারদিকে ছিল বিরাট সংখ্যক প্লেব, যারা এই সমাজের বাইরে এবং যাদের কোনো অধিকার ছিল না, কিন্তু শুধুমাত্র কর্তব্য ছিল। প্লেবদের জয়লাভের ফলে পুরাতন গোত্র-প্রথা ভেঙে পড়ল এবং তার ধ্বংসস্তূপের উপর রাষ্ট্র গড়ে উঠল, তাতে গোত্রের আভিজাত্য এবং প্লেব উভয়েই অচিরে সম্পূর্ণভাবে মিলে গেল। সর্বশেষে, রোমক সাম্রাজ্যের জার্মান বিজেতাদের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ বিদেশী ভূখণ্ড জয়ের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হলো, এ ভূখণ্ডগুলিকে শাসন করার কোনো উপায় গোত্র-প্রথার ছিল না। যেহেতু এই জয়লাভের জন্য পুরাতন জনসংখ্যার সঙ্গে তেমন কোনো গুরুতর সংগ্রাম করতে হয়নি অথবা এতে উন্নততর কোনো শ্রমবিভাগ প্রয়োজন হয়নি এবং যেহেতু বিজিত ও বিজেতারা অর্থনৈতিক বিকাশের প্রায় একই স্তরে ছিল এবং তার ফলে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিও আগেকার মতোই থাকল, সেইজন্য বহু শতাব্দী ধরে গোত্র-প্রথা এখানে বেঁচে থাকতে পেয়েছিল একটা পরিবর্তিত আঞ্চলিক রূপে, মার্ক ব্যবস্থায়, এমনকি পরবর্তীকালের অভিজাত ও প্যাট্রিশিয়ান পরিবারগুলির মধ্যে এবং এমনকি কৃষক পরিবারগুলির মধ্যে যেমন, দিতমার্শেনে, কিছুকালের জন্য দুর্বলভাবে এর পুনরুজ্জীবনও হয়।[৬৯]

অতএব রাষ্ট্র কোনক্রমেই সমাজের উপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটি শক্তি নয়; যেমন একে বলা যায় না 'নৈতিক ধারণার বাস্তবরূপ' অথবা 'যুক্তির প্রতিমূর্তি ও বাস্তবতা' যেমনটি হেগেল দাবি করেছেন। পরন্তু এটি বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে

৬৯. গোত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম যে ঐতিহাসিকের অন্ততঃ কিছুটা কাছাকাছি ধারণা ছিল তিনি হচ্ছেন নিয়েবুর; এবং সেটা দিতমার্শেনের গোত্র-গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কল্যাণে– অবশ্য তাঁর ভ্রান্তিগুলির জন্যও তিনি সে পরিচয়ের কাছে দায়ী। (এঙ্গেলসের টীকা)

সমাজ থেকেই উদ্ভূত; সমাজ যে নিজের ভিতরকার সমাধানহীন বিরোধগুলির মধ্যে একেবারে জড়িয়ে পড়েছে, এমন অনপনেয় দ্বন্দ্বে সে বিভক্ত যার নিরাকরণ করতে সে অক্ষম, এটি তারই স্বীকৃতি। কিন্তু যাতে এইসব বিরোধ, বিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থসম্বলিত শ্রেণীগুলি নিজেদের এবং সমাজকেও নিষ্ফল সংগ্রামের মধ্যে ধ্বংস করে না ফলে তাই দরকার হলো এমন একটি শক্তি যা আপাতদৃষ্টিতে সমাজের ঊর্ধ্বে থেকে এই সংগ্রামকে সংযত করবে, একে 'শৃঙ্খলার' চৌহদ্দির মধ্যে রাখবে। এবং এই যে শক্তি সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়ে তার ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ক্রমাগত সমাজ থেকে পৃথক হতে থাকে, এই শক্তি হলো রাষ্ট্র।

পুরাতন গোত্র-সংগঠনের বিপরীতে রাষ্ট্র, প্রথমত, প্রজাদের আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভাগ করে। আমরা আগে দেখেছি যে, রক্তসম্পর্কের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং সংহত পুরাতন রক্তভিত্তিক সমামেল অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল প্রধানতঃ এই জন্যে যে, তারা ধরে নিত যে, তাদের সভ্যেরা একটি বিশেষ ভূখণ্ডের সঙ্গে বাঁধা, যে বন্ধন বহুদিন আগেই লুপ্ত হয়ে যায়। ভূখণ্ড রইল, কিন্তু জনগণ সচল হয়ে উঠল। তাই আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভাগ থেকেই শুরু করা হলো এবং নাগরিকরা যেখানেই বসবাস করুক না কেন, তাদের সামাজিক অধিকার ও কর্তব্য, গোত্র অথবা উপজাতি নির্বিশেষে, সেখানেই পালন করতে পারল। এইভাবে আঞ্চলিক ভিত্তিতে নাগরিকদের সংগঠনই সমস্ত রাষ্ট্রের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এইজন্যই এটি আমাদের কাছে স্বাভাবিক মনে হয়; কিন্তু আমরা দেখেছি যে, কত দীর্ঘ ও তিক্ত সংগ্রামের পরে এথেন্স ও রোমে এই জিনিসটা পুরাতন গোত্রভিত্তিক সংগঠনের জায়গা নিতে পেরেছিল।

দ্বিতীয়ত, একটি পাবলিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা যা আর সশস্ত্র বাহিনী রূপে সংগঠিত জাতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মিলছে না। এই বিশেষ পাবলিক ক্ষমতা প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ সমগ্র জনসংখ্যাকে নিয়ে একটি স্বয়ংচালিত অস্ত্রসজ্জিত সংগঠন শ্রেণী-বিভাগের সময় থেকে আর সম্ভব ছিল না। জনসংখ্যার মধ্যে ক্রীতদাসরাও ছিল; এথেন্সের ৯০,০০০ নাগরিক ৩,৬৫,০০০ ক্রীতদাসের বিরুদ্ধে ছিল একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী। এথেনীয় গণতন্ত্রের গণফৌজ ছিল ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে অভিজাতদের এক পাবলিক ক্ষমতা যা দাসদের সংযত রাখত, কিন্তু নাগরিকদের সংযত রাখার জন্য একটি পুলিস বাহিনীরও প্রয়োজন ছিল, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই থাকে এই পাবলিক ক্ষমতা; এতে শুধুমাত্র অস্ত্রধারী লোক থাকে না, আরও থাকে নানা বৈষয়িক লেজুড়, জেলখানা ও বিভিন্ন রকমের বাধ্যতার প্রতিষ্ঠানসমূহ,– এইসবের কিছুই গোত্রভিত্তিক সমাজে ছিল না। যেসব সমাজে শ্রেণী-বিরোধ তখনো অপরিণত, সেখানে এবং একটেরে কোনো কোনো এলাকায়, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময়ে ও কোনো কোনো জায়গায়, এই পাবলিক ক্ষমতা অতি নগণ্য প্রায় অস্তিত্বহীন হতে পারে। যতই রাষ্ট্রের মধ্যে শ্রেণী-বিরোধ তীব্রতর হতে থাকে এবং সংলগ্ন পাশাপাশি রাষ্ট্রগুলির আয়তন ও জনসংখ্যা বাড়তে থাকে, ততই এর শক্তি বাড়ে। আধুনিক বর্তমানের ইউরোপের দিকে তাকালেই তা দেখা যায়, যেখানে শ্রেণী-বিরোধ এবং দেশজয়ের প্রতিযোগিতা পাবলিক ক্ষমতাকে এত বাড়িয়ে তুলেছে যে তা যেন গোটা সমাজ

সমগ্র সমাজ, এমনকি রাষ্ট্রকেও গ্রাস করবে।

এই পাবলিক ক্ষমতা বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দরকার নাগরিকদের কাছ থেকে চাঁদা – ট্যাক্স। গোত্র-সমাজে এইসব ব্যাপার একেবারে অজানা; কিন্তু আজকের দিনে আমরা এর অস্তিত্ব হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে শুধু ট্যাক্সে আর কুলায় না; রাষ্ট্র তখন ভবিষ্যৎ হুণ্ডি দেয়, ঋণ করে, রাষ্ট্রীয় ঋণ। পুরাতন ইউরোপও এই সম্পর্কে অনেক কিছু সাক্ষ্য দিতে পারে।

পাবলিক ক্ষমতা ও ট্যাক্স ধার্য করবার অধিকারের বলে এখন রাজপুরুষেরা সমাজের সংস্থা হিসাবে সমাজের ঊর্ধ্বে ওঠে। গোত্র-প্রথার বিভিন্ন সংস্থা যে স্বাধীন ও স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্রদ্ধা পেত, এরা তা যদি বা পেত তবুও তাতে আর সন্তুষ্ট থাকত না; তারা এমন একটি ক্ষমতার বাহন যা ক্রমেই সমাজের কাছে বিজাতীয় হতে থাকে এবং তাই তাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য বিশেষ বিশেষ আইনের সাহায্য নিতে হয়, যেগুলির জোরে তারা বিশেষ পবিত্রতা ও অলঙ্ঘনীয়তা ভোগ করে। সভ্য রাষ্ট্রের সবচেয়ে আনাড়ি পুলিস কর্মচারীরও 'কর্তৃত্ব' হচ্ছে গোত্র-সংগঠনের সমস্ত সংস্থার চেয়ে বেশি; কিন্তু সভ্যতার যুগে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাসম্পন্ন রাজা এবং শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক অথবা সেনাপতিও বেশ ঈর্ষা করবেন। তুচ্ছাতিতুচ্ছ এক গোত্র-প্রধানকে যিনি কোনো পীড়ন না করে অবিসংবাদিত শ্রদ্ধা পেতেন। শেষের জন সমাজের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত অথচ অন্যজন সমাজের বাইরে ও তার ঊর্ধ্বে কিছু একটার প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করতে বাধ্য।

যেহেতু রাষ্ট্রের আবির্ভাব শ্রেণী-বিরোধকে সংযত করবার প্রয়োজন থেকে, সেই সঙ্গে তার উদ্ভব হয় শ্রেণী-বিরোধের মধ্যেই, সেজন্য রাষ্ট্র হলো সাধারণত সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর রাষ্ট্র, এই শ্রেণীর রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণী হয়ে ওঠে এবং তার ফলে নিপীড়িত শ্রেণীর দমন এবং তার শোষণে নতুন হাতিয়ার লাভ করে। এইভাবে প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র ছিল সর্বোপরি ক্রীতদাসের দমনের জন্য দাস মালিকদের রাষ্ট্র, যেমন সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল ভূমিদাস কৃষকদের বশে রাখার জন্য অভিজাতদের সংস্থা এবং আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হচ্ছে পুঁজি কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণের হাতিয়ার। ব্যতিক্রম হিসাবে অবশ্য এমন কোনো কোনো সময় দেখা দেয় যখন যুধ্যমান শ্রেণীগুলির শক্তি প্রায় একটা সমান সমান হয়ে পড়ে যে, রাষ্ট্রীয় শক্তি বাহ্যত মধ্যস্থ হিসাবে সাময়িকভাবে উভয় থেকেই কিছুটা স্বতন্ত্রতা লাভ করে। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকের নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ছিল এইরূপ, এই রাজতন্ত্র আভিজাত্য ও বার্গারশ্রেণীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতো। এই ছিল প্রথম ও আরো বেশি দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের যুগে বোনাপার্টতন্ত্র যা বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতকে এবং প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াকে খেলাতো। এই ধরনের কেরামতির শেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিসমার্কী জাতির নতুন জার্মান সাম্রাজ্য যেখানে শাসক ও শাসিত উভয়ের সমান হাস্যকর : এখানে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে ভারসাম্য রক্ষা হয় এবং প্রাশিয়ার নিঃস্ব হয়ে পড়া মফস্বল যুঙ্কারদের স্বার্থে সমান প্রতারিত হয় উভয়েই।

ইতিহাসের ক্ষেত্রে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দেখা যায় যে, নাগরিকদের অধিকার স্থির হয়

ধনসম্পত্তির অনুপাতে এবং এইভাবে প্রত্যক্ষভাবে এই তথ্য প্রকাশ পায় যে, রাষ্ট্র হচ্ছে বিত্তহীন শ্রেণীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিত্তশালী শ্রেণীর একটি সংগঠন। সম্পত্তির ভিত্তিতে এথেনীয় ও রোমকদের বর্গবিভাগের ক্ষেত্রেও তাই ছিল। মধ্য যুগের সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তাই, সেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতার বণ্টন ছিল মালিকানাধীন জমির পরিমাণ অনুসারে। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রের ভোটাধিকার যোগ্যতার মধ্যেও এই জিনিসটি দেখা যায়। অথচ সম্পত্তিভেদের এই রাজনৈতিক স্বীকৃতি মোটেই অবশ্য মূলকথা নয়। বরং এতে রাষ্ট্র বিকাশের একটা নিম্নস্তরই ফুটে ওঠে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রূপ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, আমাদের সমাজের আধুনিক অবস্থায় যে রূপটি ক্রমেই অপরিহার্য হয়ে উঠছে এবং যে রাষ্ট্র রূপের মধ্যেই শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর চূড়ান্ত সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত লড়া চলতে পারে – সেই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পত্তিভেদের কোনো কথা নেই। ধন এখানে জোর খাটায় পরোক্ষভাবে কিন্তু আরো নিশ্চিতভাবে : একদিকে সরকারী কর্মচারীদের সরাসরিভাবে হাত করে (যার বিশুদ্ধ দৃষ্টান্ত হচ্ছে আমেরিকা), অপরদিকে সরকার ও ফাটকাবাজারের সঙ্গে সহযোগিতা করে, যা রাষ্ট্রীয় ঋণ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এবং যতবেশি পরিমাণে ফাটকাবাজারকে কেন্দ্র করে যৌথ কোম্পানিগুলি নিজেদের হাতে যানবাহন ছাড়াও উৎপাদনেরই বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রীভূত করে, ততই এটি সহজসাধ্য হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সম্প্রতিকালের ফরাসী প্রজাতন্ত্র হচ্ছে এর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত; এবং ভালোমানুষ সুইজারল্যান্ডেরও এই ক্ষেত্রে কিছু কৃতিত্ব আছে। কিন্তু সরকার ও ফাটকাবাজারের সঙ্গে এই সৌহার্দ্যের জন্য গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে যে অপরিহার্য নয় তার প্রমাণ হচ্ছে ইংল্যান্ড ছাড়া নতুন জার্মান সাম্রাজ্য, যেখানে বলা শক্ত, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ফলে কে বেশি বড় হলো, বিসমার্ক না রাইখরোদার। এবং সর্বশেষে বিত্তশালি শ্রেণী শাসন করে সরাসরি সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে। যতদিন পর্যন্ত শোষিত শ্রেণী, অর্থাৎ আমাদের ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েত নিজের মুক্তির জন্য পরিণত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এ শ্রেণীর বৃহৎ সংখ্যাধিকেরা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকেই একমাত্র সম্ভবপর ব্যবস্থা বলেই মেনে নেবে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে পুঁজিপতিশ্রেণীর লেজুড়, এর চরম বামপন্থী অংশ হয়ে থাকবে। কিন্তু যে পরিমাণে এই শ্রেণী নিজের মুক্তির জন্য পরিণত হতে থাকে, সেই পরিমাণেই এরা নিজেদের পার্টিতে সংঘবদ্ধ হয় এবং পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন না করে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। সর্বজনীন ভোটাধিকার হলো শ্রমিকশ্রেণীর পরিপক্কতার মাপকাঠি। বর্তমান রাষ্ট্রে এর থেকে আর বেশি কিছু তা হতে পারে না ও কদাচ হবে না, কিন্তু এইটাই যথেষ্ট। যেদিন সর্বজনীন ভোটাধিকারের থার্মোমিটারে শ্রমিকদের মধ্যে স্ফুটনাঙ্ক দেখা যাবে সেদিন পুঁজিপতিদের মতো শ্রমিকশ্রেণীরও জানা থাকবে কী করতে হবে।

অতএব অনন্তকাল থেকে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই। এমন সব সমাজ ছিল যারা রাষ্ট্র ছাড়াই চলত, যাদের রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কোনো ধারণাই ছিল না। অর্থনৈতিক বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে যখন অনিবার্যভাবে সমাজে শ্রেণী-বিভাগ এল, তখন এই বিভাগের জন্যই রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। এখন আমরা দ্রুত পায়ে উৎপাদনের

বিকাশের এমন একটি স্তরে পৌঁছাচ্ছি যখন এইসব বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব আর শুধু যে অবশ্য প্রয়োজনীয় থাকবে না তাই নয়, পরন্তু উৎপাদনের প্রত্যক্ষ বন্ধন হয়েই উঠবে। আগেকার স্তরে যেমন অনিবার্যভাবে তাদের উদ্ভব হয়েছিল তেমনি এখন তাদের পতনও অনিবার্য। তাদের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেরও পতন হবে। উৎপাদকদের স্বাধীন ও সমান সম্মিলনের ভিত্তিতে যে সমাজ উৎপাদনকে সংগঠিত করবে, সে সমাজ সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে পাঠিয়ে দেবে তার যোগ্যস্থানে : পুরাতত্ত্বের যাদুঘরে, চরকা ও ব্রোঞ্জের কুড়ুলের পাশে।

* * *

অতএব পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, সভ্যতা হচ্ছে সমাজের অগ্রগতির সেই স্তর যেখানে শ্রমবিভাগ ও তার ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময় এবং পণ্য-উৎপাদন যা এ দুটিকে একত্র মেলায়, – এইসবের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়ে তদানীন্তন সমগ্র সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে।

পূর্ববর্তী সকল স্তরে সমাজের উৎপাদন ছিল মূলতঃ সমষ্টিগত এবং সেইমত ভোগ দখলও হতো সাম্যতান্ত্রিক ছোট বড় গোষ্ঠীর মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রত্যক্ষভাবে বণ্টন করে। এই সমষ্টিগত উৎপাদন অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে চলত, কিন্তু সেই সঙ্গে উৎপাদকরা তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং উৎপন্ন বস্তুর মালিক ছিল। তারা জানতো উৎপন্ন দ্রব্য কোথায় গেল, তারা নিজেরাই ভোগ করতো, ঐ জিনিস তাদের হাতছাড়া হতো না; এবং যতদিন উৎপাদন এই ভিত্তিতে চলে, ততদিন তা উৎপাদকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো বিজাতীয় ভৌতিক শক্তিও দাঁড় করাতে পারে না, যা নিয়মিত এবং অনিবার্য হয়ে উঠেছে সভ্যতার যুগে।

কিন্তু ধীরে ধীরে উৎপাদনের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমবিভাগ ঢুকে পড়লো। এতে উৎপাদন ও দখলির সমষ্টিগত প্রকৃতি ক্ষুণ্ন হলো, এতে ব্যক্তিগত দখলই প্রাধান্য লাভ করল এবং এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়ের উদ্ভব হলো, – কেমন করে হলো সেটা আমরা আগে দেখেছি। ক্রমশ পণ্য উৎপাদনই হয়ে পড়ে প্রধান রূপ।

পণ্য-উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে, যখন নিজেদের ভোগের জন্য নয়, পরন্তু বিনিময়ের জন্য উৎপাদন হতে থাকল, তখন উৎপন্ন দ্রব্য আবশ্যিকভাবেই এক হাত থেকে হস্তান্তরে যেত। বিনিময়ের মাধ্যমে উৎপাদক তার তৈরি জিনিস হাতছাড়া করে এবং তারপর ঐ জিনিসের কী হলো তার কোনো খবর রাখে না। যখনই অর্থ ও তার সঙ্গে বণিক এসে উৎপাদকদের মধ্যে মধ্যস্থের ভূমিকা নেয়, তখন থেকে বিনিময়ের প্রক্রিয়া অধিকতর জটিল হয় এবং উৎপন্ন জিনিসের শেষ ভাগ্য হয় আরও অনিশ্চিত। বণিকরা সংখ্যায় অনেক এবং তাদের কেউ জানে না অপরে কী করছে। পণ্য এখন শুধু হাত থেকে হাতেই ফেরে না, অধিকন্তু এক বাজার থেকে অন্য বাজারে যায়। উৎপাদকরা তাদের জীবনযাত্রার মোট উৎপাদনের উপর আধিপত্য হারিয়ে ফেলে এবং বণিকরা সে আধিপত্য পায় না। উৎপন্ন দ্রব্য এবং উৎপাদন হয়ে পড়ে আপতিকতার ক্রীড়নক।

কিন্তু পরস্পর-সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক মেরু হলো আপতিকতা, অপর মেরু হচ্ছে যাকে বলি আবশ্যিকতা। প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেখানে আপতিকতার আধিপত্য মনে হয়, সেখানে বহু আগেই প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই আপতিকতার মধ্যে

অন্তর্নিহিত আবশ্যিকতা ও নিয়মই প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকৃতি সম্পর্কে যা সত্য তা সমাজ সম্পর্কেও সত্য। যতই সামাজিক একটা ক্রিয়া, সামাজিক একটা প্রক্রিয়া ধারা সচেতন মানবীয় নিয়ন্ত্রণের পক্ষে অত্যধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে, মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়, যতই মনে হয় এগুলি নিছক আপতিকতার আওতায় চলে গিয়েছে, ততই তার বিশিষ্ট অন্তর্নির্হিত নিয়মগুলি এই আপতিকতা ভেদ করে প্রাকৃতিক আবশ্যিকতায় আত্মপ্রকাশ করে। পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ের সমস্ত আপতিকতাও নিয়ন্ত্রিত হয় এই ধরনের নিয়মে: ব্যক্তিগত উৎপাদক ও বিনিময়কারীর সামনে এই নিয়মগুলি বিজাতীয় এবং প্রথমটা অজ্ঞাত শক্তির রূপেই দেখা দেয়– এদের প্রকৃতি এখনো খুঁটিনাটি অনুসন্ধান ও অনুধাবন সাপেক্ষে। পণ্য-উৎপাদনের এই অর্থনৈতিক নিয়মগুলি এইরূপের উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরের বিকাশ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়, মোটের উপর কিন্তু সভ্যতার সমস্ত যুগটাই এইসব নিয়মের অধীন। আজ পর্যন্ত উৎপন্ন জিনিসই হচ্ছে উৎপাদকের প্রভু, আজ পর্যন্ত সমাজের সমগ্র উৎপাদন সমষ্টিগতভাবে ভাবা কোনো পরিকল্পনা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় না, তা চলে অন্ধ নিয়মে যা কাজ করে চলে স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিতে এবং শেষ পর্যন্ত পর্যায়িক বাণিজ্য সঙ্কটের ঝঞ্ঝার মধ্যে।

আমরা দেখেছি কী ভাবে মানুষের শ্রমশক্তি উৎপাদনের বিকাশের খুব গোড়ার দিকেই উৎপাদকের জীবনধারণের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদন করতে সক্ষম হয়ে ওঠে এবং মূলতঃ বিকাশের এই স্তরটায় শ্রমবিভাগ এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়ের আবির্ভাব হয়। অতঃপর এই মহা 'সত্য' আবিষ্কারে খুব বেশি দেরি হলো না যে, মানুষও একটি পণ্য হয়ে উঠতে পারে : মানুষকে দাসে পরিণত করে মনুষ্য শক্তির বিনিময় ও ব্যবহার সম্ভব। মানুষ বিনিময় শুরু করতে না করতেই তারা নিজেরাই বিনিময়-বস্তু হয়ে গেল। সক্রিয় হলো নিষ্ক্রিয়; মানুষের চাওয়া না চাওয়ার উপর এটি নির্ভর করেনি।

দাসপ্রথা, যা সভ্যতার যুগে পূর্ণ বিকাশলাভ করে, তার সঙ্গেই সমাজে শোষক ও শোষিতের প্রথম বৃহৎ শ্রেণীভেদ আসে। এই ভেদ সভ্যতার গোটা যুগেই চলতে থাকে। দাসপ্রথাই হচ্ছে শোষণের প্রথম রূপ, যা প্রাচীন জগতের বৈশিষ্ট্য : এর পরে মধ্যযুগে এল ভূমিদাসত্ব এবং আধুনিক যুগে মজুরি-শ্রম। এরাই হচ্ছে সভ্যতার তিনটি বৃহৎ যুগের বৈশিষ্ট্যসূচক পরাধীনতার তিনটি রূপ : প্রথমে প্রকাশ্য ও অধুনা ছদ্মবেশী দাসপ্রথা হচ্ছে এর নিত্য সঙ্গী।

পণ্য-উৎপাদনের যে স্তরে সভ্যতার সূত্রপাত, সে স্তরটির অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হলো : ১। ধাতব মুদ্রা, এবং সেইহেতু আর্থিক মূলধন, সুদ ও তেজারতির প্রবর্তন; ২। উৎপাদকের মধ্যে মধ্যস্থ রূপে বণিকের অভ্যুদয়; ৩। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং বন্ধক-প্রথার উদ্ভব; ৪। উৎপাদনের প্রধান রূপ হিসাবে দাস শ্রমের প্রচলন। সভ্যতার উপযোগী ও সভ্যতার আমলেই সুনির্দিষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠা পরিবার রূপ হলো একপতিপত্নী প্রথা, স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের আধিপত্য, সমাজের অর্থনৈতিক একক হিসাবে ব্যক্তিগত পরিবার। সভ্য সমাজে রাষ্ট্রই সমাজকে একত্র ধরে রাখে এবং প্রত্যেকটি বিশিষ্ট পর্বেই এ রাষ্ট্র হলো একমাত্র শাসকশ্রেণীর রাষ্ট্র এবং সকল ক্ষেত্রেই

এটি হলো মূলতঃ শোষিত, নিপীড়িত শ্রেণীকে দমন করবার যন্ত্র। সভ্যতার অন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একদিকে সমাজের সমগ্র শ্রম বিভাগের ভিত্তি হিসাবে শহর ও গ্রামের বৈপরীত্য স্থায়ী করা; অপরদিকে উইলের প্রচলন যা দিয়ে সম্পত্তির মালিক তার বিষয়-আশয় এমনকি মৃত্যুর পরেও নিয়ন্ত্রিত করতে পারত। এই প্রথা পুরাতন গোত্র-প্রথার সরাসরি বিরোধী, এই প্রথা সোলনের আগে পর্যন্ত এথেন্সে অজ্ঞাত ছিল; রোমে এটি একেবারে গোড়ার দিকেই এসে যায়, কিন্তু ঠিক কোন সময়ে[৭০] এটি আসে তা আমরা জানি না। জার্মানদের মধ্যে পুরোহিতরা এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এই উদ্দেশ্যে যাতে ধর্মভীরু সৎ জার্মানরা বিনা বাধায় গির্জার নামে নিজেদের সম্পত্তি দান করতে পারে।

এই সংবিধানকে ভিত্তি করে সভ্যতা যেসব কাজ করেছে, তা কোনদিন পুরাতন গোত্র-সংগঠন মোটেই সামাল দিতে পারত না। কিন্তু এটি করতে গিয়ে মানুষের সবচেয়ে ঘৃণ্য প্রবৃত্তি ও আবেগগুলিকে উদ্দীপিত করতে হয়েছে এবং মানুষের অন্য সব গুণের বদলে এইগুলিকেই বিকশিত করা হয়েছে। নগ্ন লোভই সভ্যতার সূচনার প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত তার চালন শক্তি; ধনদৌলত, আরো আরো বেশি ধনদৌলত, সমাজের নয়, এই নোংরা ব্যক্তির ধনদৌলতই হলো তার একমাত্র চূড়ান্ত লক্ষ্য। যদি এই লক্ষ্য সাধন করবার পথে তার ভাগ্যে বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান বিকাশ এবং পুনঃ পুনঃ চারুকলার পূর্ণতম স্ফুটনের যুগ এসে থাকে তাহলে তার একমাত্র কারণ এই যে, ঐগুলি ছাড়া ধন সঞ্চয়ের আধুনিক বিরাট কৃতিত্ব অসম্ভব হতো।

যেহেতু এক শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর শোষণ হচ্ছে সভ্যতার ভিত্তি সেইজন্য এর সমগ্র বিকাশ চলেছে অবিরাম বিরোধের মধ্যে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি অগ্রসর পদক্ষেপ একই সঙ্গে নিপীড়িত শ্রেণী অর্থাৎ বৃহৎ সংখ্যাধিক মানুষের অবস্থার ক্ষেত্রে পশ্চাদগতি। একজনের পক্ষে যা আশীর্বাদ তাই অপরের পক্ষে অনিবার্যভাবে অভিশাপ; একটি শ্রেণীর প্রত্যেকটি নতুন মুক্তির অর্থই হলো সর্বদা অপর একশ্রেণীর উপর নতুন উৎপীড়ন। এই ব্যাপারের সবচেয়ে চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত হচ্ছে যন্ত্রপাতির প্রচলন যার ফলাফল আজ সুবিদিত। এবং বর্বরদের মধ্যে যেখানে অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না, – তা আমরা দেখেছি, – সেক্ষেত্রে একটি শ্রেণীকে প্রায় সব অধিকার দিয়ে এবং অপর শ্রেণীর ঘাড়ে প্রায় সব কর্তব্য চাপিয়ে সভ্যতার যুগে এদের পার্থক্য ও বিচ্ছেদ নির্বোধ লোকের কাছেও সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

কিন্তু এমনটি হওয়া উচিত নয়। শাসকশ্রেণীর পক্ষে যা ভাল তা সমগ্র সমাজের পক্ষেও ভাল হওয়া উচিত, কারণ শাসকশ্রেণী নিজেদের সঙ্গেই সমাজের এক করে

৭০. লাসাল রচিত 'অর্জিত অধিকার প্রণালী'র (Das System der erworben Rechte) দ্বিতীয় খণ্ডে প্রধানত এই প্রতিপাদ্য ধরা হয়েছে যে, রোমক ইচ্ছাপত্র রোমের মতোই পুরানো, রোমের ইতিহাসে কখনো 'এমন সময় ছিল না যখন ইচ্ছাপত্র ছিল না', প্রাক রোমক যুগে প্রেতাচার থেকেই ইচ্ছাপত্রের উদ্ভব হয়। সাবেকী ধারার গোঁড়া হেগেলবাদী হওয়ায় লাসাল রোমক সামাজিক সম্পর্ক থেকে রোমান আইনের ধারাগুলির উদ্ভব টানেননি, টেনেছেন ইচ্ছার 'কল্পনামূলক প্রত্যয়' থেকে এবং এইভাবে তিনি সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ, উপরে বর্ণিত উক্তিতে পৌঁছেছেন। যে পুস্তকেই ঐ একই কল্পনামূলক ধারণা থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, সম্পত্তির হস্তান্তর রোমকদের উত্তরাধিকারের ব্যবস্থায় নিতান্ত একটি গৌণ ব্যাপার, সে পুস্তকের পক্ষে এটা আশ্চর্য কিছু নয়। লাসাল শুধু যে রোমের আইনজ্ঞদের, বিশেষত আদি যুগের, মোহগুলি বিশ্বাস করেন তাই নয়, তাদেরও ছাড়িয়ে গেছেন। (এঙ্গেলসের টীকা)

দেখে। অতএব সভ্যতা যত অগ্রসর হয় ততই এরা এদের অনিবার্যরূপে সৃষ্ট অন্যায়গুলিকে প্রেমের আবরণ দিয়ে ঢাকতে, বার্নিশ করতে অথবা এগুলির অস্তিত্বই অস্বীকার করতে বাধ্য হয়, – সংক্ষেপে বাধ্য হয় চলতি ভণ্ডামির প্রবর্তন করতে যা সমাজের পূর্ববর্তী স্তরগুলিতে, এমনকি সভ্যতার সূচনাতেও অজ্ঞাত আর ছিল যার চূড়ান্ত হয় নিম্নোক্ত ঘোষণায় : শোষক শ্রেণী নিপীড়িত শ্রেণীতে শোষণ করে নিতান্ত ও শুধুমাত্র শোষিত শ্রেণীরই স্বার্থে; যদি শোষিত শ্রেণী এটি বুঝতে না পারে এবং এমনকি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তাহলে তাতে করে উপকারীর প্রতি অর্থাৎ শোষকদের প্রতি নিতান্ত নীচ কৃতঘ্নতাই প্রকাশ পায়।[৭১]

এবং এখন সমাপ্তি প্রসঙ্গে সভ্যতা সম্পর্কে মর্গানের রায় : 'সভ্যতার উদ্ভবের সময় থেকে সম্পত্তির অতিবৃদ্ধি এত বিপুল, এর রূপগুলি এত বিচিত্র ধরনের, এর ব্যবহার এতই প্রসারশীল এবং মালিকদের স্বার্থে এর পরিচালনা এতখানি বুদ্ধিদীপ্ত যে, জনগণের পক্ষে এটা হয়ে উঠেছে এক অবাধ্য শক্তি। মানবচিত্ত তার নিজ সৃষ্টির সামনে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাহলেও এমন সময় আসবে যখন মানুষের বুদ্ধি এই সম্পত্তির উপর আধিপত্য করবার পর্যায়ে উঠবে এবং রাষ্ট্র যে সম্পত্তি রক্ষা করছে তার সঙ্গে এ রাষ্ট্রের সম্বন্ধ নির্দিষ্ট করবে তথা মালিকদের অধিকারের সীমানাও স্থির করবে। সমাজের স্বার্থ ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে নিশ্চয় বড় এবং তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। শুধুমাত্র সম্পত্তি সন্ধানই মানুষের চরম ভবিতব্য নয়, অবশ্য যদি অতীতের মতো ভবিষ্যতেরও নিয়ম হয় প্রগতি। সভ্যতার সূত্রপাত থেকে যে সময় চলে গিয়েছে তা হচ্ছে মানুষের অতীত অস্তিত্বের একটি ভগ্নাংশমাত্র এবং আগামী যুগেরও একটি ভগ্নাংশমাত্র। সম্পত্তির আহরণ যার একমাত্র লক্ষ্য সেই ঐতিহাসিক পর্বের পতন হিসাবে সমাজের বিলুপ্তি অবধারিত, কারণ এই পর্বের মধ্যেই নিহিত তার নিজ ধ্বংসের বীজ। সরকারের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র, সমাজের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, অধিকার ও সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য এবং সর্বজনীন শিক্ষা পবিত্র করে তুলবে সমাজের পরবর্তী উচ্চতর স্তরটিকে যেদিকে মানুষের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও জ্ঞান অবিচলিত এগোচ্ছে। সেটা হবে উচ্চতর রূপে প্রাচীন গোত্রগুলির স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পুনরুজ্জীবন।' (মর্গান, 'প্রাচীন সমাজ', পৃঃ ৫৫২)

এঙ্গেলস কর্তৃক ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ –জুনে রচিত

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জুরিখে পৃথক রচনা হিসাবে প্রথম প্রকাশিত

চতুর্থ সংস্করণ অনুযায়ী মুদ্রিত জার্মান থেকে ইংরেজী অনুবাদের ভাষান্তর।

৭১ প্রথমে আমি চেয়েছিলাম ফুরিয়েরের রচনায় সভ্যতার যে চমৎকার সমালোচনা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, সেইটিকে মর্গান ও আমার সমালোচনার পাশাপাশি দেব। দুর্ভাগ্যক্রমে এই কাজ করার মতো যথেষ্ট সময় নেই। কেবল এইটুকু মাত্র [illegible] বলে মনে করেন এবং তাকে তিনি বলেন দরিদ্রের বিরুদ্ধে ধনীর লড়াই। তাঁর রচনায় [illegible] উপলব্ধি করেছিলেন যে, পরস্পর বিরোধী স্বার্থের দ্বন্দ্বে [illegible] পৃথক পৃথক পরিবারগুলিই (les familles incoherentes) হচ্ছে অর্থনীতির একক। [illegible]